

জাতীয় আস্তা

বাসন্ত প্রতিবন্ধ

বাসন্ত প্রতিবন্ধ

কালোর কার্ড

# জাতীয় পত্রিকাতে প্রকাশিত প্রবন্ধ মনুভূতির উপর জানন্ত্র এক মৎস্যলন

অন্যান্য পত্রিকা

জাতীয় পত্রিকা

বাসন্ত প্রতিবন্ধ

কালোর কার্ড

বাসন্ত পত্রিকা

বাসন্ত পত্রিকা

বাসন্ত পত্রিকা

কালোর কার্ড

সুপ্রতিক্রিয়া

সুপ্রতিক্রিয়া

সুপ্রতিক্রিয়া

সুপ্রতিক্রিয়া



বাসন্ত পত্রিকা

বাসন্ত পত্রিকা

বাসন্ত পত্রিকা

The Daily Star



বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম

# জাতীয় পত্রিকাতে প্রকাশিত প্রবন্ধ মাঝের অন্য এক সংকলন

# তেরঞ্জনীর ইশান্তিশার



সংকলনে  
মো. নাজমুচ্ছাকিব  
০১৯৯২৫৪৭২০২  
[snazmussakib01@gmail.com](mailto:snazmussakib01@gmail.com)  
[facebook.com/swe.sakib](https://facebook.com/swe.sakib)

# ত্রিভুবন ইশলাম

## প্রষ্ঠপোষক:

মো. জাহানুর ইসলাম

প্রতিষ্ঠাতা, বাংলাদেশ তরঙ্গ কলাম লেখক ফোরাম।

## উপদেষ্টা:

মারজুকা রায়না

সভাপতি, বাংলাদেশ তরঙ্গ কলাম লেখক ফোরাম।

## তত্ত্বাবধায়ক:

আনারুল ইসলাম

সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ তরঙ্গ কলাম লেখক ফোরাম।

## সম্পাদক:

এস.এ.এইচ. ওয়ালি উল্লাহ

সভাপতি, বাংলাদেশ তরঙ্গ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

## নির্বাহী সম্পাদক:

ইসরাফিল আলম রাফিল

সভাপতি, বাংলাদেশ তরঙ্গ কলাম লেখক ফোরাম, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

## সহকারী সম্পাদক:

১. মো. জামিন মির্জা

সদস্য, কেন্দ্রীয় সম্পাদকীয় পর্ষদ।

২. তাসনিম হাসান মজুমদার

সদস্য, কেন্দ্রীয় সম্পাদকীয় পর্ষদ

৩. আবু তালহা আকাশ

সাঃ সম্পাদক, বাংলাদেশ তরঙ্গ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

৪. অনিল মো. মোমিন

সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ তরঙ্গ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

৫. জানালুল ফেরদাউস আর্থি

সদস্য সচিব, বাংলাদেশ তরঙ্গ কলাম লেখক ফোরাম, শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

## প্রচ্ছদ, বর্ণ বিন্যাস ও ডিজাইন:

মো. নাজমুচ্ছাকিব

সদস্য, বাংলাদেশ তরঙ্গ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

## পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে:

বাংলাদেশ তরঙ্গ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

## গ্রন্থস্বত্ত্ব:

বাংলাদেশ তরঙ্গ কলাম লেখক ফোরাম।

## প্রকাশকাল:

জুলাই-২০২২



## পৃষ্ঠিপাত

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা	নাম	ক্রমিক
১	শুভেচ্ছা বকর্ব	৬	৯৪-৯৫	ইমরান হসাইন	৮৮
২	মো. জাহানুর ইসলাম	৮	৯৮	সানজিদা জাহান লোপা	৮৯
৩	মারজুকুর রায়না	৯	১০২-১০৩	আপুজ্জাহ আলম নূর	৫০
৪	মো. আনারুল ইসলাম	১০	১০৪-১০৬	সামিহা খাতুন	৫১
৫	আখতার হোসেন আজাদ	১১-১২		শেহাবি শাখা	
	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা		১০০	দিলরুক ইসলাম জিয়াত	৫২
৬	মো. বিহুল হোসেন	১৩-১৫	১১০	জামাতুল ফেরদৌস অংথি	৫৩
৭	আব্রু তালহা আকশ	১৯		কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়	
৮	অসিফ হোসেন	২১-২২		তানভীর আহমেদ রাসেল	৫৪
৯	অনিল মো. মোস্মিন	২৬-২৮		ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	
১০	মো. নাজমছাকির	৩২-৩৩	২৪-২৫	ইমরান উদ্দিন	৫৫
১১	আশিকুর রহমান	৩৯	১৩৬	আরাফাত হোসাইন	৫৬
			১৪১	মো. জামিন মির্গি	৫৭
১২	খায়রজামান খান সামি	৪২		বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়	
১৩	সুকান্ত দাস	৬০-৬১	২৩	কাব্য সাহা	৫৮
			১২৩	শাহিদা আরবী	৫৯
১৪	এস.এ.এইচ. ওয়ালি উল্লাহ	৬৪-৬৩		গণমাধ্যমকর্মী	
১৫	হুমায়ন আঙ্গুম	৬৭-৬৮	৩৫	ইমরান হসাইন	৬০
১৬	শাহ জাহান	৬৯-৭০		বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়	
১৭	আজহারুল ইসলাম	৭১	১২৯-১৩০	ফারহানা ইয়াসমিন	৬১
১৮	জয়দেব রায়	৭২-৭৩	১৩৪-১৩৫	মুক্তা আক্তার	৬২
১৯	মো. মঙ্গলুল হক খাঁন	৭৫-৭৬	১৩৭-১৩৮	সিফাত	৬৩
			১৪৭	সাদিয়া কারিমুন	৬৪
২০	মো. আব্দুল হাকিম	৭৯-৮০		ঢাকা কলেজ	
২১	রঞ্জল আমিন	৮১	৮৮-৮৫	প্রসেনজিৎ চন্দ্রশীল	৬৫
			১৩৯	মো. আকিব হোসাইন	৬৬
২২	আশিকুর রহমান	৮২		নোবিপ্রবি	
২৩	সুরাইয়া ইয়াসমিন	৮৩-৮৪	১৩১-১৩৩	মো. আবু সুফিয়ান	৬৭
২৪	মাসুম বিল্লাহ	৮৫-৮৬		শাবিপ্রবি	
২৫	মাহমুদ টুম্পা	৯০-৯১	৮৮-৮৯	শাহ মো. আশরাফুল ইসলাম	৬৮
২৬	শ্যামলী তানজিন	৯৬-৯৭	৫১-৫২	হামিদা আবাসী	৬৯
২৭	আবদিম মুনিব	৯৯	৭৪	রাতিক হাসান রাজিব	৭০
			১৪৩	মোমেন আক্তার মুক্তা	৭১
২৮	আবু সোহান	১০৭-১০৮		বশেমুরবিপ্রবি	
২৯	মারুফ হোসেন	১০৯	৬৩	জুবায়েদ মোস্তফা	৭২
৩০	ফারহানা তিতলী	১১১	১১৭-১১৮	আর এস মাহমুদ হাসান	৭৩
৩১	মো. হাবিবুর রহমান	১১২	১২৭	সাদিয়া আফরিন কুমু	৭৪
৩২	রুখসানা খাতুন ইতি	১১৩		জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	
৩৩	খাইরুল ইসলাম	১১৪	৩৮	আজহার মাহমুদ	৭৫
৩৪	মাইম উদ্দীন	১১৫	৮০	মো. মিনিবুল ইসলাম	৭৬
৩৫	হোসেনেয়ারা খাতুন	১১৬	৫৩	রাজু চন্দ্র দাস	৭৭
৩৬	আতিকুর রহমান	১১৯	১০৮	আশরাফুজামান শাওন	৭৮
৩৭	মো. আবু সাঈদ	১২০-১২১	১২৪	লাইজু আক্তার	৭৯
	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়		২৫	জাবেদুর রহমান	৮০
৩৮	সৈয়দ রিফাত	২০	১২৮	ইমরান খাঁন	৮১
৩৯	এম. রনি ইসলাম	২৯-৩১	১৬-১৮	ইসরাত জাহান	৮২
৪০	মুহাম্মদ নাহিদ হোসেন	৪৩	৫০	ফজলে রাবি	৮৩
			১৪৮	তাসনিম হাসান মজুমদার	৮৪
				চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	
৪১	মো. ইসরাফিল আলম রাফি	৫৪-৫৫	৩৪	সবুজ আহমেদ	৮৫
৪২	কবিতা রাণী মৃধা	৫৭	৩৬-৩৭	ধণ রঞ্জিন ত্রিপুরা	৮৫
৪৩	আতিয়া	৫৮	৪৬-৪৭	মো. সাইফুল মিয়া	৮৬
৪৪	রাজিয়া আক্তার	৫৯	৬৬	মোহাম্মদ নেজাম উদ্দীন	৮৮
৪৫	জেবা ফারিয়া	৬২	৭৭-৭৮	মো. মুরাদ হাসান	৮৯
৪৬	রোকাইয়া আক্তার থিতি	৮৮-৮৯	৮৭	আয়েশা সিদ্দিকা	৯০
৪৭	সুরাইয়া	৯২-৯৩	১২২	নাসরিন সুলতানা	৯১

# শিশু বঙ্গো

বাংলাদেশের তারণ্য নির্ভর একটি ফোরাম যারা আগামীর স্বদেশ গড়ার লক্ষ্যে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে সেটি হলো বাংলাদেশে তরণ কলাম লেখক ফোরাম। “তারণ্যের শান্তি কলমে আলোকিত ধরণী” এই মূলমন্ত্র এবং “সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হোক লেখনীর ধারায়” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২০১৮ সালের ২৩ জুলাই আত্মপ্রকাশ করে বাংলাদেশ তরণ কলাম লেখক ফোরাম “। যাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে - তরণদের লেখালেখিতে উন্নুন্ন করা। যাতে করে তরণরা লেখনীর মাধ্যমে নিজেদের চিন্তাশক্তিকে খুব সহজেই বিকশিত করতে পারে এবং তারণ্যের চিন্তাভাবনার জায়গা থেকে ভালো মন্দ উভয় দিকের গঠনমূলক যুক্তি দিয়ে নিজ দেশের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকে। বাংলাদেশ তরণ লেখক কলাম এর সেরা লেখা নিয়ে এই বইটি তৈরি করা হয়েছে যেখানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক সকল ঘটনা নিয়ে তরণদের যুক্তিযুক্ত ভাবনা ও প্রতিকারসমূহ স্থান পেয়েছে। যে লেখাগুলো বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশের পাশাপাশি সমাজের ও দেশের বিভিন্ন দিকের পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া এই বইটিতে অনেক লেখা সংকলিত হওয়ার ফলে একই সাথে অনেক লেখকের লেখা পড়ার সুযোগটি রয়েছে। যাদের সার্বক্ষণিক সহযোগিতায় এই বইটি তৈরি হয়েছে- কেন্দ্রীয় সম্পাদক আনারুল ইসলাম, এস.এ.এইচ.ওয়ালিউল্লাহ, অনিল মো. মোমিন, মো. জামিন মিএঁ, আবু তালহা আকাশ, জামাতুল ফেরদাউস আঁধি, তাসনিম হাসান মজুমদার। আর সম্পাদনা, প্রচ্ছদ, বর্ণন্যাসও অঙ্গসজ্ঞা তৈরি করেছেন মো. নাজমুচ্ছাকিব। আমি তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ করছি তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বইটি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। আর যাদের লেখা দিয়ে বইটি তৈরি হয়েছে তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সর্বোপরি বাংলাদেশ তরণ কলাম লেখক ফোরামের সর্বাঙ্গিন সাফল্য ও কল্যান কর্মনা করাই, আমাদের ফোরামটি দীর্ঘজীবী হোক।

মারজুকা রায়না

কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ তরণ কলাম লেখক ফোরাম।

# সম্পাদ্যন্ত

“সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হোক লেখনীর ধারায়” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২০১৮ সালের ২৩ জুলাই আত্মপ্রকাশ করে তারঞ্জি নির্ভর একটি সংগঠন “বাংলাদেশ তরঙ্গ কলাম লেখক ফোরাম”। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে তরঙ্গদের যুক্তিযুক্ত ভাবনা প্রতিনিয়ত গণমাধ্যমে তুলে ধরা-ই আমাদের এই সংগঠনের কাজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৫ জন সদস্য নিয়ে গড়ে উঠা সংগঠনটির বর্তমানে ১৭ টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় প্রায় ২০০০ জন সদস্য রয়েছেন। প্রতিদিন গড়ে ২৫-৩০ জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় আমাদের তরঙ্গ লেখকদের বিভিন্ন বিষয়ে লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতি মাসে আমাদের সংগঠনের লেখকদের প্রায় ১২০০+ লেখা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে।

লেখালেখির পাশাপাশি তরঙ্গ লেখকদের সুপ্ত প্রতিভাবিকাশের জন্য প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, গান-কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বুক রিভিউ প্রতিযোগিতা, আন্তঃশাখা বিতর্ক প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, পাঠচক্র এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবামূলক সামাজিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন করা হয়ে থাকে। দেশের গণ্যমান্য লেখক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে তরঙ্গ লেখকদের জন্য সাংগঠনিক এবং লেখালেখি বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। যেমন, সদ্য প্রয়াত আব্দুল গাফফার চৌধুরী, অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান, সেলিনা হোসেন, আনিসুল হক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। বিভিন্ন জাতীয় দিবসকে কেন্দ্র করে আয়োজন করা হয় আলোচনা অনুষ্ঠান এবং নানান প্রতিযোগিতা।

লেখকদের লেখালেখির পাশাপাশি নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন ও প্রকাশের সুযোগ দিয়ে দক্ষ নেতৃত্ব গড়ে তোলা হয় সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায়। সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আমাদের রয়েছে একটি অত্যন্ত সুগঠিত গঠনতত্ত্ব।

সর্বোপরি আগামীর বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে যে ধরনের দক্ষ-সূজনশীল তরঙ্গ প্রজন্ম প্রয়োজন, বাংলাদেশ তরঙ্গ কলাম লেখক ফোরাম সে প্রজন্মকে গড়ে তুলতে বন্ধপরিকর।

শুভেচ্ছান্তে,  
মো. আনারুল ইসলাম  
কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক  
বাংলাদেশ তরঙ্গ কলাম লেখক ফোরাম।



# যার হাতে উন্নয়নের জাদুরকাঠি

## মো. জাহানুর ইসলাম

স্বাধীনতার সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষির প্রায় পুরোটাই নির্ভরশীল ছিল ক্ষুদ্র চাষিদের ওপর, যারা খুব কম জমি চাষ করে কোনো রকমে জীবনধারণ করতেন। এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বিগত ৪৭ বছরে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে প্রায় চারগুণ। নতুন নতুন প্রযুক্তি যুক্ত হওয়ায় বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলের অর্থনীতিতে এসেছে ব্যাপক বৈচিত্র্য। হাঁস-মুরগির খামার, গবাদিপশু পালন, চিংড়ি চাষ ছাড়াও খামার কার্যক্রমের বাইরে বিস্তৃত হয়েছে গ্রামীণ অর্থনীতি, যা প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগেও অকল্পনীয় ছিল। আমরা দক্ষিণ এশিয়ায় এক মালদ্বীপ বাদে অন্যান্য সব দেশকে ছাড়িয়ে গেছি। আমাদের দারিদ্র্যের হার কমেছে। স্বেচ্ছ খেতে না পেয়ে এখন আর কেউ মারা যায় না। গ্রামীণ অবকাঠামোয় বিনিয়োগ শিক্ষার প্রসার, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ভাতার মতো কর্মসূচিও দারিদ্র্যের হার কমানোর ভূমিকা রেখেছে। তবে পল্লী এলাকার জীবনমান উন্নয়নে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সক্রিয়তা এবং উৎপাদন সক্ষমতার রূপান্তর ভূমিকা রেখেছে সবচেয়ে বেশি।

আমরা ধান উৎপাদনে স্বনির্ভর হয়েছি, মাছ, মাংস, সবজি, দুধ, ডিম ইত্যাদির উৎপাদন অনেক বেড়েছে, স্যানিটেশন ব্যবস্থা ভালো হয়েছে, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত পাকা রাস্তা হয়েছে, যন্ত্রালিত ভ্যানগাড়ি, নচিমন, করিমন ইত্যাদি ধরনের যানবাহন গ্রামাঞ্চলের মানুষের চলাফেরায় অবিশ্বাস্য রকমের গতি সঞ্চালন করেছে। ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণচাপ্তল্যে সজীব হয়ে উঠেছে সারা দেশ। গ্রাম অঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে শেখ হাসিনা সরকার গ্রামে গ্রামে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করেছেন। চালু করেছেন ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রও।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলেই উদ্যোগো বিপ্লব ঘটেছে যা কেবল বাংলাদেশেই নয়, সারা বিশ্ব জুড়েই এক বিস্ময়। তাঁর শাসনামলেই নতুন প্রজন্মের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো বৈশ্বিক বাজারে স্বাধীনভাবে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা অর্জন করেছে। গত শতকের আশির দশকে যেখানে এই খাত থেকে ২৫ শতাংশ আয় আসত, এখন আয় আসে ৭৫ শতাংশের চেয়েও বেশি। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। তৈরি পোশাক খাতের গতিশীল উৎপাদন, ওষুধ ও জুতা শিল্প, জাহাজ নির্মাণ, ইস্পাত উৎপাদন এবং নির্মাণ খাত বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। বহুতল তুরন নির্মাণ প্রযুক্তি তো ঢাকা আর চট্টগ্রামের চেহারাই বদলে দিয়েছে। নতুন প্রজন্মের বেসরকারি ব্যাংক এখন ব্যাংক অর্থায়নের উৎস হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। শিল্প বিনিয়োগে এখন দীর্ঘমেয়াদী ঝণ দিচ্ছে বেসরকারি ব্যাংকগুলো। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়েছে। টাকার মূল্য স্থিতিশীল হয়েছে। রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে বিপুল পরিমাণে। আর এসব কারণে জনগণের ব্যয়ের সক্ষমতা বেড়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক অঙ্গীরতা ইত্যাদি গুরুতর প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আমাদের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের ওপরে। সম্প্রতি তা আরও বেড়ে ৭ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। এ সবের মূলে রয়েছে শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্ব। তিনি নেতৃত্বে না থাকলে এসবের কোনো কিছুই সন্তুষ্ট হতো না।

বর্তমান প্রজন্মের কাছে শেখ হাসিনা এক সাহসী ও দক্ষ নেতৃত্বের নাম, যার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় ভবিষ্যতের বাংলাদেশ উন্নয়নের ধারায় এগিয়ে চলছে। শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশের সক্ষমতা অর্জন করেছে। তাঁর নেতৃত্বের কারণেই মহাকাশে বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ ডেক্ষপণ করতে পেরেছে। তাঁর নেতৃত্বেই জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন এবং দিনবদলের যাত্রা শুরু হয়েছে। এই অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে হলে আগামী দিনেও শেখ হাসিনার নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখতে হবে। কেননা শেখ হাসিনার হাতেই রয়েছে সকল উন্নয়নের মূলমন্ত্র।

লেখকঃ

প্রতিষ্ঠাতা

বাংলাদেশ তরঙ্গ কলাম লেখক ফোরাম।

প্রকাশ তথ্যঃ

পত্রিকা: দৈনিক ইন্ডিয়ান

তারিখঃ ১৬ জানুয়ারি ২০১৯



# দুর্বল বর্জ্যব্যবস্থাপনার নেতিবাচক প্রভাব

## মারজুকা রায়না

দুর্বল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এখন সবচেয়ে প্রকট ও মারাত্মক সমস্যার মধ্যে অন্যতম। সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাবে পরিবেশ এখন মারাত্মকভাবে হৃষকির সম্মুখীন হচ্ছে। যদি বলি প্রকৃতিকে প্রতিনিয়ত গলা টিপে হত্যা করা হচ্ছে এখন দম আটকে গেছে শ্বাস ফেলতে পারছেন তবে ভুল হবে কি? প্রকৃতি এখন তার সহক্ষণমতা হারিয়ে তার জবাব সময় মতো দিচ্ছে আর তা গোটা জাতি ও দেশ শুধু চেয়ে দেখছে। মানুষকে তার কর্মের ফল ভোগ করতেই হচ্ছে, দেয়ালে পিঠ আটকে গেছে আমাদের। এখনো যদি আমরা সচেতন না হই তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শ্বাস ফেলে বাঁচতে পারবেনা। বর্জ্য এবং বিশেষত শহরাঞ্চলীয় শিল্পবর্জ্য ঠিকমত ব্যবস্থাপনার অভাবে যেসব সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে সেগুলোর মধ্যে - পানিদূষণ, বায়ুদূষণ, ম্যালেরিয়া, শ্বাসকষ্ট, এলার্জি, শিশুমৃত্যু ও বিবিধ পানিবাহিত রোগের বিস্তার প্রধান। তাছাড়া প্রকট দুর্গম্বে মানুষের স্বাভাবিক চলাচল ও শিশুদের মানসিক বিকাশে মারাত্মক ভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। জৈবরাসায়নিক বর্জ্য বা হাসপাতালের বর্জ্য বাংলাদেশের জন্য খুবই বিপদজনক। জৈবরাসায়নিক বর্জ্যের মধ্যে ২০% বর্জ্য অতিমাত্রায় সংক্রামক এবং এগুলো সরাসরি পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালী বা নালায় অবযুক্ত করা হয়। এ ধরনের দুর্বল ব্যবস্থাপনা এলাকাবাসীর স্বাস্থ্যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। অধিকাংশ শিশুমৃত্যুর জন্য এই সংক্রামনই দায়ী। কঠিন বর্জ্যসমূহ নিষ্কাশন নালার পথরোধ করে এবং সড়কে জলাবদ্ধতার সৃষ্টির অন্যতম করাণ এটি এছাড়া পথথাটে আবর্জনার স্তুপ হতে দুর্গম্ব ছড়ায় যা পরিবেশ ও বায়ুদূষণ ঘটায় আর মশার বংশবিস্তার ও প্রাদুর্ভাব এই ময়লার স্তুপ অন্যতম কারণ। যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা

## সেখানে ময়লা আবর্জনা

ফেলার ব্যাপারটা আমাদের বদ অভ্যসে পরিনত হয়েছে। রাস্তার পাশেই ময়লা ফেলার ডাষ্টবিন কিন্তু আমরা সবাই ময়লাগুলি ডাষ্টবিনে না ফেলে এরআশেপাশেই ফেলি এরফলে একদিকে যেমন পরিবেশদূষিত হচ্ছে অন্যদিকে রোগজীবাগুর আক্রমনে স্বাস্থ্য ও হৃৎক্রিয়া মুখে পড়ছে। খালি মাঠে, রাস্তার পাশে, অলিঙ্গিতে সব জায়গাজমি ময়লা আর্বর্জনারিডিপো। মশা, মাছি, কুকুর, কাক এর আস্তানা দুর্গক্ষে রাস্তার পাশ দিয়ে চলাচল করা যাচ্ছেনা নাকে রুমাল চেপেও হাঁটা যাচ্ছেনা। দিনদিন পরিবেশ আরো নাজেহাল হয়ে পড়ছে।

কেন এই অবস্থা? পৌরসভা ভিত্তিক শহরগুলোতে আমাদের দেশে এ ব্যাপারে কোন তাগিদ এবং কাজ করছেনা বল্লেই চলো। একটি পরিবার থেকে প্রতিদিন গড়ে ৩/৪ কেজি সবজির খোসা ও অন্যান্য ময়লা তৈরি হয় কিন্তু পৌরসভা এ ময়লা সংগ্রহ করার কোন ব্যবস্থাই করছেনা যার ফলে ময়লাগুলো পলিথিনে মোড়াই করে আশেপাশে খালি মাঠ, রাস্তার আশপাশ, যেখানে সেখানে ফেলা হচ্ছে ফলে শহরের রাস্তা ও অলিগনি এখন ময়লারডিপো।

সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা যত দ্রুত সম্ভব এ ব্যাপারে উদ্ধৃতি না হলে পরিবেশ দূষণ ও রোগজীবাণুতে নাজেহাল অবস্থার সৃষ্টি হবে। এখনই নাজেহাল হয়ে পড়েছে। বিভাগীয় শহরতো বটেই, জেলাশহর, উপশহর এর রাস্তাঘাট অলিগলি কোথায় নেই ময়লারডিপো? কিন্তু কেন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা তাদের কাজের প্রতি এতটা উদাসীন যে নেই কোন কার্যকরী উদ্যোগ।

সিটি কর্পোরেশন আর পৌরসভা উদ্যয়ী না হলে জনগন কতটা সচেতন হবে সেটা বলার অপেক্ষা রাখেন। উদাহরণ হিসেবে জাপান, চীন, সিঙ্গাপুর এই দেশগুলো যেভাবে ময়লা আবর্জনা নিষ্কাশন করে সে ভাবে যদি আমাদের দেশের সিটি কর্পোরেশন আর পৌরসভা গুলো কার্যক্রম চালায় তবে অনেকটা সুস্থ পরিবেশ আমরা পেতে পারি। সুস্থ পরিবেশ স্বাস্থ্য আর মন দুইটি ই সুস্থ রাখতে পারে শুধু তাই না ইতিবাচক মনমানসিকতা ও গড়ে তোলতে সহায়ক হবে।

কেন আমরা একটু সচেতন নই? এখন দিন বদলে গেছে। উন্নত দেশগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে আমরাও এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদেরও পরিকার পরিচ্ছন্ন থাকা শিখতে হবে। আমরা নিজেরা একটু সচেতন হলে বাসাবাড়ি, আশপাশ থেকে রাস্তা- ঘাট পর্যন্ত সবকিছু পরিকার রাখতে পারি। শুধু নিজের জন্য নিজের পরিবারের জন্যও হলো পে পরিকার পরিচ্ছন্ন থাকাটা খুবই জরুরি করণ পরিকার পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ।

ଲେଖକ:

কেন্দ্ৰীয় সভাপতি

## বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম।

ପ୍ରକାଶ ତଥ୍ୟः

পত্রিকাঃ ইত্তেফাক।

তারিখঃ ২০-০৯-২০২০।

# বিত্ত অর্জনে নীতিহারা

## মো. আনারুল ইসলাম



বিত্ত হতে চিত্ত বড়, গৃহীজনদের অমূল্য বাণী। কিন্তু মানুষ হিসেবে আমরা চিত্তের চেয়ে বিত্ত দিয়েই ধনী-গরিব আলাদা করি। যার আছে, সে চায় আরও হোক। চাহিদার কোন শেষ নেই। আন্তর্জাতিক জরিপে বাংলাদেশে ধনীর সংখ্যা বাড়ছে প্রমাণ হয়েছে। ধনী হওয়ার খেলায় মাঠে নেমেছে বিত্ত পিপাসু একদল খেলোয়াড়। উন্নয়নশীল দেশে ধনীর সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু গরিবের সংখ্যা কমছে না। মানবসেবা-ই পরম ধর্ম। কজন আছে এমন বিত্তবান যারা স্বার্থ ছাড়া কোন গরিবের পাশে দাঁড়ায়? বর্তমানে একজন ধনীলোক গরিবদেরকে সাহায্য করলে জনসাধারণ ধরেই নেয়, লোকটি হয়তো সামনের নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাশী! হ্যাঁ এটাই হচ্ছে। জনসাধারণের দোষ নেই, কারণ এই মৌসুমী মানবসেবার সিস্টেমটি বিত্তবানরাই গড়ে তুলেছে। বন্যার্ট, শীতার্ট, দুর্যোগকবলিত, নদী ভঙ্গনে বিপর্যস্তদের জন্য যে সব বিত্তবানরা দান করেন, তাদের অধিকাংশই মিডিয়া কাভারেজের জন্য আগে হাঁটেন। সব মানবসেবাই যেন প্রচারমূর্খী। কজন বিত্তবান আছেন, প্রচারবিমুখ! অথচ সকলের উচিত বিত্তের নয়, চিত্তের কল্যাণ সাধন। সামাজিক, মানবিক দায়বদ্ধতা বলে একটা কথা আছে। দায় এড়িয়ে চলাই আজকালকার ফ্যাশন। বিত্ত অর্জনে দিশেহারা, নীতিহারা। যেভাবেই হোক বিত্তবান হতে হবে। বৈধ-অবৈধ কোন বাছবিচার নেই। লক্ষ্য একটাই, ধনী হব। বিত্তবান হচ্ছেন কাদের দিয়ে? আপনি গার্মেন্টের মালিক, আপনার অনেক আয়। আয়টা আসে কাদেরকে দিয়ে? ওই যে ঘাম ঝরানো শ্রমে কর্মীরা কাজ করে, সেটার ফল ভোগ করছেন আপনি। ওদের কাজ করা বন্ধ হয়ে গেলে, আপনার কোম্পানি নিলামে উঠবে। অথচ এদের বেতন কত দিচ্ছেন? আপনি ফুড ফ্যাক্টরির মালিক। আপনার অনেক টাকা, টাকায় কেনা অনেক সম্মান আপনার। কিন্তু আপনার টাকার মূল উৎস কে? ক্ষক। তার শ্রমে উৎপাদিত ফসলের নাম মাত্র দাম দিয়ে আপনি হয়ে যাচ্ছেন ফুড ব্র্যান্ড! ক্ষক অল্প পেয়েই সন্তুষ্টির হাসি দিচ্ছে। যখন বন্যায় ক্ষকের স্বপ্ন ভেসে যায়, তখন দু-চার কেজি চাল দিয়েই দায় সারেন! অথচ এই ক্ষকের কষ্টেই উৎপাদিত হয়েছে এই চাল। যে চাল সে ফলায়, সে চাল-ই তার জন্য আপনার দেয়া দান! আর আপনি উপাধি পেলেন দান বীর। ঢাকায় বাস্তুহীন পরিবারের সংখ্যা একেবারেই কম যা মাত্র কয়েকজন বিত্তবান ইচ্ছা করলেই ওদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারেন। আপনার কোন কিছুর অভাব নেই, কিন্তু মূল্যবোধ-মানবতাবোধের অসীম অভাব। মানুষ, সমাজ, দেশ নিয়ে ভাবতে শিখুন। আপনি সমাজের উঁচু শ্রেণী, সিঁড়ি বেয়ে একবার নিচে তাকান। অনুভব করুন আপনার আশপাশের মানুষগুলো কেমন আছে। একটু পাশে দাঁড়ান। ভালবাসা পাবেন, নিঃস্বার্থ ভালবাসা। সমাজটা সুন্দর হবে। মানুষ অনাহারে, অর্ধাহারে থাকবে না, বন্যায়, নদী ভঙ্গনে সব হারিয়ে নিঃস্ব হবে না। যদি আপনি একটু পাশে দাঁড়ান। বিত্তের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তকেও বিস্তৃত করুন। মানবিক হোন, সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ গড়ুন।

লেখকঃ

কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক

বাংলাদেশ তরঙ্গ কলাম লেখক ফোরাম।

প্রকাশ তথ্যঃ

পত্রিকাঃ দৈনিক জনকঞ্চ

তারিখঃ ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮,



# একটি সহমত ভাইয়ের গল্প

## আখতার হোসেন আজাদ

টিংকু মিয়া (ছদ্মনাম) আকেলপুর গ্রামের মেধাবী ও সচেতন ছাত্র। ছোটবেলা থেকেই ঈর্ষনীয় সাফল্যের অধিকারী সে। এছাড়াও পাড়া, গ্রাম বা নিজ বিদ্যালয়ে অন্যায় বা অপসংগতিমূলক কিছু ঘটলেই প্রথম প্রতিবাদ আসতো তার থেকেই। ব্যক্তিত্বোধ, সচেতনতা ও নৈতিকতার দরুণ গ্রামের মানুষের কাছে আদর্শবান ব্যক্তির উদাহরণ টিংকু মিয়া। এসএসসি এবং ইচ্চেসিতে বরাবরের মতো সাফল্যমণ্ডিত ফলাফল করে দেশের একটি নামকরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় সবার প্রিয় টিংকু মিয়া। গ্রামবাসীর প্রত্যাশা তাদের টিংকু মিয়া কেবল গ্রামের আইডল নয়, বরং নৈতিকতা ও ব্যক্তিত্বোধ দিয়ে দেশের অনুকরণীয় ব্যক্তিতে পরিণত হবে। টিংকুর মাধ্যমেই দেশের নানা অসঙ্গতি, অনাচার ও দুর্নীতি দূর হবে। গ্রাম ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বারান্দায় বিচরণ শুরু করলো টিংকু মিয়া। ক্যাম্পাসের পাশে একটি ছাত্রাবাসে থাকা শুরু করে সে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বড় ভাইদের সাথে তার উঠাবসা শুরু হলো।

কিছুদিন পর  
মিয়া অনুভব করে  
পরিবেশ কেমন  
অসঙ্গতিপূর্ণ বিভিন্ন  
নিজের স্বভাবসূলভ  
প্রতিবাদ করলে  
থেকে উপাধি পাচ্ছে  
সহপাঠীদের থেকে  
বুজুরুক ছেলে।  
দেখে সহপাঠীরা  
বিশ্ববিদ্যালয়ের  
বড় ভাইদের  
হতে পারার দরুণ  
উঠতে পারছে না।  
জর্জরিত টিংকু মিয়া  
কৌশল পরিবর্তন  
ধীরে ধীরে সে নিজেকে পরিবর্তন করতে শুরু করলো।



মেধাবী টিংকু  
বিশ্ববিদ্যালয়ের  
যেন ভিন্ন।  
কথা বা কাজে  
বৈশিষ্ট্য দিয়ে  
বড় ভাইদের  
বেয়াদব ছেলে,  
উপাধি পাচ্ছে  
কিছুদিন পরে  
অনেকে ই  
হলে উঠে গেলেও  
চোখের মণি না  
সে এখনো হলে  
আর্থিক কষ্টে  
চিন্তা করলো  
করা লাগবে।

বড় ভাইয়ের সাথে পুনরায় উঠাবসা শুরু করলো। চা খেতে খেতে বড় ভাই যা বলে, টিংকু মিয়া তাতেই ‘হ্যাঁ ভাই, জী ভাই, সহমত ভাই’ জ্ঞাপন করতে শুরু করলো। ক্যাম্পাসের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিয়ে নোংরা-কুরুচিশীল বিভিন্ন ফেসবুক স্টাটাসেও টিংকু সহমত ভাই মন্তব্য করা শুরু করলো। টিংকুর পরিবর্তিত আচরণ সম্মতির আলো ফেললো বড় ভাইয়ের হাদয়ে।

মাস খানেকের ভেতর টিংকু মিয়াকে হলে উঠিয়ে দেন বড় ভাই। টিংকু মনে মনে ভাবলো, ভাইয়ের অনুগত থাকলে তো দেখছি পুরোই লাভ। কিন্তু আমাকে আরেকটু সামনে এগুতে হবে। টিংকু মনোযোগ দিয়ে পড়ালেখার পাশাপাশি প্রথম বর্ষ থেকেই সক্রিয় রাজনীতি শুরু করলো। বন্ধুদের সাথে সে সু-সম্পর্ক স্থাপন করে বেশ কয়েকজনকে নিয়ে নিজের একটি গ্রুপ তৈরি করে ফেললো। এরপর শুরু হয় টিংকুর পথচল্লা।

বড় ভাইয়ের অপচন্দের ব্যক্তিকে হেনহ্যাক করা, বড় ভাইয়ের ইচ্ছায় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের নেতা-কর্মীদের পেটানো, নিজ দলের ভাইয়ের প্রতিপক্ষ গ্রন্থের করতে শুরু করে টিংকু মিয়া। একটি সিংগাড়া ও এক কাপ চায়ের কাছে সততা, নৈতিকতা ও ব্যক্তিত্বোধ বিক্রি করে দিলো টিংকু মিয়া। বড় ভাইয়ের সকল কাজে সে সহমত ভাই থিউরি অবলম্বন করা শুরু করলো। ফলাফল টিংকুর উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট বড় ভাই।

টিংকু এখন চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী। কিছুদিন পরেই টিংকুর রাজনৈতিক দলের কাউন্সিল। চিন্তা করলো আমার তো একাডেমিক ফলাফল ভালো। রাজনীতিতে একটু সামনের দিকে না থাকলে ক্যারিয়ারের পথ সুগম হবে না। রাজনৈতিক ভাইয়ের পক্ষে মিছিলের সামনের সারি থেকে টিংকুর স্লোগানে ক্যাম্পাস প্রকল্পিত হতে থাকলো। টিংকুর বড় ভাই আর ক্যাম্পাসের আরেক বড় ভাই ছিল হেভিওয়েট প্রার্থী। দুর্ভাগ্যক্রমে টিংকুর রাজনৈতিক বড় ভাই কাউন্সিলে কোনো পদে মনোনীত না হওয়ায় টিংকু একটু নড়েচড়ে বসলো। টিংকু পূর্বের ভাইয়ের পক্ষের রাজনীতি পরিবর্তন করে নতুন বড় ভাইয়ের সাথে ঘনিষ্ঠতা শুরু করলো। পূর্ণাঙ্গ কমিটি হলে টিংকু সামনের

দিকের পদে আসীন হলো। টিংকুর বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ। সামনে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজ বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ। টিংকু যথারীতি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কায়দা-কানুন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেল।

শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাবার পরেই টিংকু চিন্তা করলো সাধারণ শিক্ষক থেকে লাভ নেই। আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পদে যেতে হবে। টিংকু স্যার সরকার সমর্থিত শিক্ষকদের একটি প্যানেলে যুক্ত হলেন। সরকার সমর্থিত শিক্ষকদের একাধিক প্যানেল। টিংকু স্যার বেশি প্রভাবশালী প্যানেলটিকেই বেছে নিলো। শিক্ষক নেতাদের সকল কাজে সহমত থিউরি অবলম্বন করা শুরু করলো। ছাত্রীর সাথে অন্তেক ক্রিয়াকলাপে অভিযুক্ত শিক্ষকের সাথে সেলফি তুলে টিংকু স্যার ক্যাপশন দিচ্ছেন, স্যারের মতো নীতিবান ও চরিত্রবার শিক্ষকের তুলনা নেই।

সামনেই শিক্ষক সমিতির নির্বাচন। দুঃখজনক হলেও সত্য টিংকু স্যার সমর্থিত প্যানেল পরাজয় বরণ করে। স্যার দিলেন ডিগবাজি। বিজয়ী প্যানেলের শিক্ষকদের সাথে শুরু হলো মেলামেশা। নিয়মিত ক্লাশে উপস্থিত না থাকলেও বিভিন্ন প্রোগ্রামে মাইক কঁপিয়ে ভাষণ আর পূর্ব-সমর্থিত ও বর্তমান প্রতিপক্ষের শিক্ষক প্যানেলের বিভিন্ন কাটুক্তি ও বিষেদাগার। টিংকু স্যার কয়েক বছর পর শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে প্যানেল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এভাবেই বনে যান শিক্ষক নেতা। সহমত ভাই থিউরি অবলম্বন করে নিজের সোনালী বৈশিষ্ট্য চরিতার্থ করে ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিতে পরিণত হয় সৎ, নিষ্ঠাবান টিংকু মিয়া। শিক্ষকনেতা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

কয়েক বছর পর সরকার পরিবর্তন হলে শুরু হয় তৎকালীন শিক্ষক নেতাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তদন্ত কার্যক্রম। টিংকু স্যার কৌশলে শিক্ষা ছুটি নিয়ে বিদেশ পাঢ়ি দেন। আর ফিরলেন না তিনি প্রিয় মাতৃভূমিতে। কারণ ইতিমধ্যে তিনি দেশের বাইরে আরেকটি স্থায়ী আবাস-স্থল গড়ে তুলেছেন।

লেখকঃ

সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক  
বাংলাদেশ তরঙ্গ কলাম লেখক ফোরাম।

প্রকাশ তথ্যঃ

পত্রিকাঃ ডেল্টা টাইমস।  
তারিখঃ ১৩ এপ্রিল, ২০২১।



# Why Bangladeshi universities fail to meet global ranking criteria

## Md. Billal Hossen

Recently, the US-based company Quacquarelli Symonds (QS) has published a ranking of all universities in the world. The Massachusetts Institute of Technology (MIT) has been named the world's best university in the 2021 rankings, followed by Stanford University.

The organisation ranks universities around the world based on six specific criteria. They are academic peer review (40%), teacher-student ratio (20%), research (20%), graduate reputation or efficiency (10%), international student ratio (5%) and international teacher or performance ratio (5%).

Universities are measured by these criteria and then the final ranking is published. Sadly, no Bangladeshi university has ranked among the top 1,000 universities in the world, except for one. In the 2021 ranking, the position of the University of Dhaka is between 800 and 1,000. But is that really satisfactory? I do not think it is satisfactory at all.

The QS authorities rank the universities in Asia separately. This year, a total of 11 universities from Bangladesh have got a place in the Asia-based ranking. Of them, three are public universities and the remaining eight are private universities.

The University of Dhaka is in the best position among the public and private universities in Bangladesh. But the question is: though there are so many public and private universities in Bangladesh, why is none in the top 100? In fact, the universities in our country are unable to meet the criteria that the QS authorities consider for ranking.

If we take a look at those criteria, the issue will become very clear. For Asian universities, the organisation ranks based on 11 criteria. The first is academic reputation (30%). It basically indicates which university has the best reputation in the eyes of the world's great academics.

As soon as you open a newspapers, you see that in almost every public university in Bangladesh, the issues that need to be taken care of to achieve academic reputation are the most neglected ones. Occasionally, university teachers make headlines by committing plagiarism. Even, there are many teachers whose PhD degrees are fake.

Besides, I always see news of various types of corruption in the academic and administrative works of universities. This way, the academic reputation of a university is tarnished in the eyes of international academics.

The second criterion is the degree of reputation graduates can gain in the workplace (20%). Looking at this criterion makes one feel helpless, as most of the graduates that the universities of our country are producing, are unemployed. They are not getting jobs according to their academic qualifications because they did not acquire proper communication skills and information technology skills while obtaining degrees.

There are also many universities where there is no opportunity for skill development. In most universities, theoretical education is given more importance than life-oriented one. So, graduates are not able to do well in the workplace. That is why the universities of our country lag behind

the most in this criterion.

The third criterion is teacher-student ratio (10%). In our country, a university does not even have the required number of teachers in proportion to the number of students. There are also departments where the whole department is run by only one teacher.

The fourth is international research network (10%). This indicator shows how many foreign universities have research collaboration with our local universities. In Bangladesh, many old universities have some collaborations, but the teacher-student and research exchange activities are very rare, and new universities do not even have such an opportunity.

In most cases, even after signing a memorandum of understanding, these issues are no longer given importance or explored. The biggest reason for this is the changes in the big administrative posts of universities. After such changes take place, those issues are forgotten and lost in the abyss of time. So, if you want to evaluate universities based on this criterion, you can give them very few marks.

The fifth indicator is the number of citations per research paper (10%) and the number of research papers per teacher (5%). It's not as if there is no research in the universities of our country, but whatever is done is being done only to protect the rules. The articles of those who are doing research are rarely published in quality journals.

There are some exceptions. However, the university authorities do not have an account of how many papers come out in an academic year and how many citations they receive. If you visit the websites of our universities, you see that there is inadequate information.

Almost all public university websites (except a few) still look very old. Profiles of the teachers containing detailed information, their research interests, research fields, number of published papers and their links, and Research Gate profile links are not available on the websites. Even the details of the indispensable information about universities and students are not updated on the web.

Yes, it is true that allocation for research in our country is much less than that in other countries. But the question is: is the allocation even used properly?

The next indicator is the number of staff having a PhD degree (5%). The status of this indicator is worst in our country. Bangladesh is a country where it is possible to get an entry-level job with a bachelor's or master's degree only. The number of staff with a PhD degree is very low because many big positions can be obtained here without a PhD. The situation is even worse in new universities.

The remaining indicators are international student-teacher ratio (5%) and student exchange rate at home and abroad (5%). The situation of Bangladeshi universities is fragile in these indicators. Although some public universities have a small number of foreign students, the rate is declining day by day. Needless to point out, there are almost no international teachers in universities.

However, private universities are well ahead in this regard. A few months ago, a private university appointed a foreign professor as its vice-chancellor. Moreover, some private universities are working on regular exchange programmes with foreign universities and emphasising co-educational activities.

This is reflected in this year's ranking. It is understood that in the Asia-based ranking, there are 11 universities from Bangladesh and eight of them are private. Thus, it is visible that private universities are moving forward.

I want to end this piece by sharing a real event. I had the opportunity to talk to a Somali student at my university about the overall situation of our campus. He said, "I like everything here, but I just feel very bad about campus-based political instability and corruption".

Yes, indeed so. These two things are the main obstacles to the development of our universities. As long as the universities are affected by these irregularities and corruption, their rankings will not improve.

If we ensure transparency, accountability, and proper leadership in our universities, it is expected that they will be able to meet the criteria set by the QS. I hope that the appropriate authorities will work to improve the overall quality of universities considering the above issues.

writer:  
Student,  
Islamic University, kushtia.



# Divorce is not auspicious.

## Israt Jahan

Every man's first school is family. The first education is received from the family.

But if the tune of separation is played in that family, then the biggest effect will be on the child in that family. The only goal of an adult is to live happily with a beautiful family, to laugh, play, and go back and forth. But one's life is honeyed and one's life is full of darkness. The word happiness is lost in decorating the house of happiness. The warmth of the happy world gradually cools down. Our arranged family sank in an instant. At one time divorce was an unusual thing because the word divorce was rarely heard then. But now it is becoming abnormal. It seems to have become fashionable. It is seen to be separated from trivial matters, which can be easily solved if you want.

The reasons for divorce can be attributed to drugs, physical infirmity, monogamy, lack of patience, extramarital affairs, lust, indifference towards family, and many more. Just as one hand doesn't clap, so it would not be right to blame a man or a woman for divorce. But what is the main reason for the increase in divorce over time? Why is there so much strife in the marital life of the newlyweds? What is the main source?

The increasing rate of divorce in recent times has raised several questions about marital relationships. This relationship is a legal and social process. At present, it is seen that the number of women is higher in case of divorce. So the question may arise "why?" The role of women is more in arranging a family. But that woman is oppressed. The present age is the modern age. At this age, both parents are employed. They are always busy in their busy lives. Many are reluctant to have children. Some people show reluctance to take responsibility for their children after birth. Where the mother has the biggest role in raising the child, the mother is busy with her work. Then that child became a burden. As a result, the child grows up neglected. At one stage it caused family problems. The result of this problem is divorce. Looking at the 21st century, it can be seen that there is a big gap between the women of that era and the women of the present era. In those days all authority was in the hands of men. He would accept everything from the silence of women. But now women have learned to stand on their own two feet. Learned to keep pace with men. And this kind of living is a sign of improvement on the one hand but on the other hand, it is detrimental. However, men are also responsible for the divorce. They both deal with their confidence as they choose to embark on their play activities. But now the dissatisfaction is centered on the incident. Many times girls have to admit to torture. Moreover, many men are involved in invalid relationships. And these are the reasons for separation.

Whether a working woman is a worker or a high-ranking official, whenever she wants to live like herself, society becomes an obstacle. Involving two people in a relationship called husband or wife does not mean buying one over the other. No man or woman has the right to deny the individual. Every human being has a world of his own and the name of accepting this world easily is 'relationship'. If marriage means 'chain', then there must be a melody to break the shackles. If there is a difference in taste between two people in married life, then there will be a dilemma. Family means equal participation of two. No one will acquire or dominate anyone. Family does not mean that one will run at 100 miles and the other will fall at 40 miles. If the speed is not equal, at least if it does not come close, then some will go ahead and some will go back. The pace of the world stops as it moves forward and backward. People from two different poles can live together if they two accept each other easily and individually. No one in this world is like

anyone else.

Some investigations have revealed that dowry claims of husband or husband's family, physical and mental abuse by both spouses, drug addiction, extramarital affairs, discord in the life of two persons, suspicion, lack of support from husband, disobedience of wife, Facebook, and divorce is happening because of multiple relationships through social media like Twitter and not living according to religious rules. And in the capital, the number of family breakups is increasing at an unusual rate. Most of it is from girls. Wives are spontaneously divorcing their husbands. Many decorated houses of the capital are crumbling due to the arrogance of the husband and wife's extramarital affairs or aristocracy, the happy family is being burnt to ashes. The use of the internet, Facebook, mobile phones, and all kinds of information technology is playing a special role in this regard. Inspiring various Hindi serials, dramas, and various domestic pornography of neighboring countries. Many men and women are losing their moral values due to the easy availability of these things. Moral erosion is also happening. In this, they are getting involved in serious social crimes like extramarital affairs.

Sociologist Professor Mehtab Khanam said that divorce is on the rise for two reasons. First, girls are being educated more than ever. They are much more aware now. She is choosing the path of divorce without enduring torture. Girls are more educated and self-reliant than ever before. They are reluctant to accept social and family ties. There is also the self-conceit of many rich children. In many cases, they are involved in invalid relationships in uninterrupted life. Being addicted to various drugs. Second, mobile companies are losing value and ethics by being attracted to various offers, such as the Internet, websites, Facebook, and pornography. As a result, they do not hesitate to sever strong relationships and morals like marriage.

This is the difference, this is the beauty of man. No one can change someone like that again and the knitting of friendship is not done with disrespect. Compromise is not something that only one person can do. The imperative of necessity is to exist equally between the two. When two people in a different relationship get caught up in a relationship, they both have a responsibility to make themselves acceptable to each other. But in our society, no one wants to take this responsibility. Not being like-minded, but having two people in an acceptable place weaves that relationship into a strong thread. If the place of faith or love does not develop then there is no greater punishment than that relationship. In our society, women lag behind men for practical reasons. And the reason for that backwardness is notability in any way but lack of opportunity. Many women are left behind due to a lack of free opportunity to express themselves. Again, there is no awareness to create one's taste. Getting involved in a relationship before you understand it. But day by day this picture has started to change. Women are now much more aware, learning to recognize themselves. Learning to understand the subject of taste. Even after marriage, the tastes of a man or a woman may change. Age and experience educate a person, make him aware and awaken his sense of life. It is important to make this place very seriously. Differences in taste mean differences in acceptance.

When a husband and wife get divorced, their biggest impact is on their children. Divorce is extremely painful for children. Whatever the reason for the divorce between husband and wife, the child has a negative effect. The children of broken families have to grow up alone. The child's mental and physical health needs to be ensured by overcoming dilemmas, frustrations,

and uncertainties through extreme awareness, expertise and deep love, and emotional support. Otherwise, he may not be able to get out of the adverse effects for the rest of his life, problems will remain in his personality and it will create problems in maintaining relationships with others in later life. Needless to say, things like divorce are usually not easily accomplished, it has some precedents that are not at all pleasant. Witness these unpleasant incidents but the little child. The child has to go through some unpleasant incidents like long-standing marital quarrels, mental disorders, physical abuse, and crying. The little children of the house can see and understand the atmosphere of the house. Even without seeing the parents 'quarrels directly, one can understand their anger, resentment, frustration, and pain by looking at their parents' looks, expressions, and gestures.

We have a misconception that children do not understand anything. Children understand everything and they understand the matter in their way. Many husbands and wives use abusive language in front of their children or witness the incident. All of this has a long-term negative effect on the baby. Never make negative comments about a parent in front of a child. This makes the children feel very helpless and lost. If possible, reassure him that whatever has happened is between us, you are our child, and we love you. Often the issue of parents is strictly avoided in the family where the child is present. Even if the child has any questions about the parents, he cannot say anything out of fear. So if any question comes to his mind, he can ask it easily - maintain such an environment. Being the partner of his emotions, which is bigger than the object, reassures him and helps him to get out of this painful feeling. No matter who the parents are, the child has to stand by them for emotional support. Our awareness, love, and support for such children will give them the courage and morale to break free from the shackles of frustration, uncertainty, anxiety, and loneliness.

It is known that the number of divorces has increased by 99 per month this year as compared to last year. In this case, 70 percent of the divorces are given by women and 30 percent by men. Another statistic found that daily, one divorce application is filed every hour. According to the report of the Bangladesh Bureau of Statistics, at present 10.7 percent of women and 1.5 percent of men per thousand of the population are divorcing. This shows that women are more at risk of separation. The separation rate is 1.3 percent per thousand in rural areas and 0.7 percent in urban areas. According to research data, those who enter into marital relations with minors are more at risk. If a person files for divorce, the arbitral tribunal arranges a meeting within 90 days to resolve the issue. As a result of this meeting, some people remain steadfast in their previous decisions and some reject the application. However, this rate is only 5 percent. Patience and mutual understanding are essential for arranging a family. Divorce is never good. A family needs to have religious education and mutual dignity. Let the family be warm forever, not by divorce but by the virtue of husband and wife. Divorce always has a bad effect on a child's life. Therefore, every family should be aware of the child.



# ভোক্তা অধিকার : আমাদের করনীয়! আবু তালহা আকাশ

ভোক্তা অধিকার বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝি, তা হলো- যিনি কোনো কিছু ভোগ করে থাকে তিনি ভোক্তা; এবং এই ভোগকারীর যে অধিকার তাইই হলো মূলত ভোক্তা অধিকার। ভোক্তা অধিকারের ধারণাটি আমাদের দেশে নব শব্দ হলেও বিশ্বে ভোক্তা অধিকার ও আইনের প্রয়োগ সুন্দীর্ঘ সময় হতে প্রচলিত একটি বিষয়। যার যথাযথ ব্যবহার ও প্রয়োগের দ্বারা ভোক্তার অধিকার বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হচ্ছে। ১৯৬২ সালের ১৫ মার্চ সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি কংগ্রেসে ভোক্তার স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে বক্তৃতা দেন। মূলত ভোক্তা অধিকার বিষয়ে প্রথম ধারণা সেখান থেকেই তৈরি হয়। ১৯৮৫ সালে জাতিসংঘ কেনেডি ধারণার বিস্তার ঘটিয়ে সর্বমোট ৮টি অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। যথা- ১. মৌলিক চাহিদা পূরণের অধিকার, ২. তথ্য পাওয়ার অধিকার, ৩. নিরাপদ পণ্য বা সেবা পাওয়ার অধিকার, ৪. পছন্দের অধিকার, ৫. জানার অধিকার, ৬. অভিযোগ করা ও প্রতিকার পাওয়ার অধিকার, ৭. ভোক্তা অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষা লাভের অধিকার, ৮. সুস্থ পরিবেশের অধিকার।

বাংলাদেশে ২০০৯ সালের ৬ এপ্রিল, 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯' প্রণিত হয়। আইনটি বাংলা ভাষায় রচিত সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত যাতে মোট ৮২টি ধারা, উপধারা ও অনেক উপ-উপধারা রয়েছে। যেখানে ভোক্তার অধিকার ও সেই আইনের সম্পূর্ণ নিয়মনীতি বর্ণনা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এতসব আইন থাকা সত্ত্বেও লজ্জিত হচ্ছে ভোক্তার অধিকার! যেন সাধারণ সকল ভোক্তাই উৎপাদনকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে জিম্মি। প্রথমত আমার মনে হয়, আমরা নিজেদের অধিকার গুলো সম্পর্কে অবগত না থাকার কারণে আমাদের প্রাপ্ত অধিকার হতে বাধ্যত হচ্ছি। ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি আইন ও আইনের পরিপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে আমরা কতজন ভোক্তা অবগত আছি এটা একটা বড় ভাবনার বিষয়। আমরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে না জানার কারণেই পদে পদে বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সময়ে প্রতিনিয়ত নিজেদের অধিকার হারাচ্ছি; হারাচ্ছি নিজেদের প্রত্যাশিত পন্য, তথা আমাদের অধিকার। জাতীয় দৈনিকের এক তথ্যমতে, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সুরক্ষা অধিদপ্তরে (ডিএনসিআরপি) ২০২০-২১ অর্থবছরে জমা পড়েছে ১৪ হাজার ৭৬৪টি অভিযোগ। এর আগের অর্থবছরে অভিযোগের সংখ্যা ছিল ৯ হাজার ১৯৫টি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ডিএনসিআরপি'র কাছে বিভিন্ন বিষয়ে ৭ হাজার ৫১৫টি অভিযোগ এসেছিল। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ডিএনসিআরপি ২০১৩-১৪ অর্থ বছর নিউজের সময় পর্যন্ত মোট অভিযোগ ছিল ৪৭ হাজার ৭৩৮টি। অর্থাৎ, আমরা উক্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে দেখতে পাচ্ছি প্রতি বছর আমাদের অভিযোগের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে ক্রমবর্ধমান! তাই এই ভোক্তা অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সামাজিক যোগাযোগ ও বিভিন্ন গণমাধ্যমে তা প্রচার, বিভিন্ন ক্যাম্পেইন সহ পাঠ্যপুস্তকে আইনটি অন্তর্ভুক্ত করে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সকল নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমেই কেবল এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন সম্ভব। সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে আলোচিত ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান 'ই-ভ্যালির' আইন ভোক্তার অধিকার লজ্জনের একটি মারাত্মক উদাহরণ। গণমাধ্যমের কল্যাণে জানা যায়, ই-ভ্যালির বিরক্তে গত ডিসেম্বর পর্যন্ত এক হাজারের মতো অভিযোগ জমা পড়েছে। এই বিষয়টি আমাদের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্নের কারণ! ভোক্তা যদি মনে করে থাকেন এখানে তার প্রকৃত অধিকার খর্ব হয়েছে সে এর প্রতিকার পেতে দায়িত্বরত মন্ত্রণালয়ে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। এই অভিযোগ দায়েরের সময় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৬০ অনুযায়ী, কোন ব্যক্তিকে কারণ উভয় হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে এই আইনের অধীন অভিযোগ দায়ের করতে হবে। অন্যথায় অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনকি এই অভিযোগ প্রমাণিত হলে যে পরিমাণ আর্থিক জরিমানা করা হবে, তার ২৫ শতাংশ অভিযোগকারী ভোক্তাকে ক্ষতিপূরণ বাবদ দেওয়া হয়। ভোক্তার অধিকার লজ্জন করলে এর শাস্তি হিসেবে এক বছরের জেল বা দুই লাখ টাকা জরিমানা কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন। সর্বোপরি, আমাদের সকলের নিজ নিজ অবস্থান থেকে সচেতনতা এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেই কেবল সমাজের সকল মানুষের সঠিক অধিকার বাস্তবায়ন সম্ভব। আসুন আমরা নিজেরা ভোক্তা অধিকার সম্পর্কে জানি, অন্যকে জানতে আগ্রহী করে তুলি। সমাজের সকল কল্যাণিত দূর্নীতিকে কঠোর হস্তে দমন করে, স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখি।

লেখকঃ

সাধারণ সম্পাদক

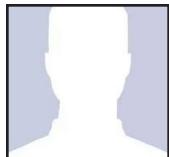
বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

প্রকাশ তথ্যঃ

পত্রিকাঃ দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখঃ ১৪ এপ্রিল ২০২২



# টেকসই উন্নয়নে শ্রমিক নিরাপত্তা সৈয়দ রিফাত

একটি রাষ্ট্রের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি সে রাষ্ট্রের শ্রমিকদের শ্রম। শ্রমিকের ঘামে ঘুরছে দেশ-বিদেশের উন্নয়নের চাকা। বিগত ৫১ বছরে বাংলাদেশের অগ্রসরমান অর্থনীতির অন্যতম অংশীদার এদেশের শ্রমিকরাই। বঙ্গবন্ধুর ডাকে এদেশের কৃষক-শ্রমিক জীবনবাজি রেখে দেশ স্বাধীন করার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারাই নিজেদের শ্রম দিয়ে সচল রেখের অর্থনীতির চাকা। অথচ দুঃখজনকভাবে সেই শ্রমিকদেরই জীবনমানের পরিবর্তন হয়েছে সবচেয়ে কম। সামাজিকভাবে শ্রমিকরা এখনো অবহেলিত। সমাজে মালিক-শ্রমিক বিভাজন এখনো দৃশ্যমান। যাদের প্রতিনিয়ত পরিশ্রমে দেশ এগিয়ে চলেছে সমাজের নানা ক্ষেত্রে তাদের হেয়প্রতিপন্থ করা হয়, করা হয় বৈষম্যমূলক আচরণ। দেশের উন্নয়ন হয়েছে, শিক্ষার হার বেড়েছে তবে শ্রমিকদের প্রতি আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এখনো আসেনি।

অর্থনৈতিক অনিচ্যতা শ্রমিকদের জীবনমানের উন্নয়নের পথে অস্তরায়। অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের সঠিক মজুরি প্রাপ্তি ঘটে না। তাদের মজুরি বৃদ্ধির হার জাতীয় মূল্যস্ফীতির তুলনায় কম। বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের কম পারিশ্রমিকে কাজে নিযুক্ত করার ঘটনা অহরহ ঘটছে। গার্মেন্ট ওয়ার্কার ডায়েরিসের (জিড্রিউডি) সাম্প্রতিক এক জরিপ বলছে, পোশাক শ্রমিকদের ওভারটাইমের আয় চলে যাচ্ছে মূল্যস্ফীতির পেটে। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ৩৪৫ ধারায় শ্রমিকের সঠিক মজুরি এবং মজুরির ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমাধিকারের কথা বলা হলেও, তা প্রয়োগ হয় না বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকনোমি মডেলিংয়ের (সানেম) এক গবেষণা জরিপ থেকে জানা যায়, শ্রম আইন লঙ্ঘন করে শ্রমিকদের দিনে ১০ ঘণ্টার বেশি কাজ করাচ্ছে অধিকাংশ তৈরি পোশাক কারখানা। প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ দক্ষ এবং স্বল্প দক্ষ শ্রমিক প্রবাসে যাচ্ছে এবং নিয়মিত রেমিট্যাঙ্ক পাঠানোর মাধ্যমে দেশের রিজার্ভকে শক্তিশালী করছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় অর্থের সঠিক বিনিয়োগের অভাবে তাদের বেশির ভাগের অর্থই খরচ হয়ে যায় অলাভজনক খাতে। প্রবাসী শ্রমিকদের অর্থের নিরাপদ লগ্নির বিষয়েও বিকার নেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের।

নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষা শ্রমিকের অন্যতম প্রধান অধিকার। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট আট অনুযায়ী, সবার জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি ও স্থিতিশীল অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন আমাদের লক্ষ্য। তবে আমাদের দেশে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তায় সবচেয়ে বেশি উদাসীন। বাংলাদেশ ইনস্টিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) তথ্য মতে, শুধু ২০২১ সালেই বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকের সংখ্যা ১ হাজার ৫৩ এবং নির্যাতিত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৪৭ জনের, যা বিগত বছরের তুলনায় বেড়েছে ৪৪ শতাংশ। বিভিন্ন ধরনের দুরারোগ্য ব্যাধি, শিল্প কারখানাগুলোতে দুর্ঘটনা প্রতিরোধী পর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনার অভাব, প্রতিকূল পরিবেশে শ্রমিকদের কাজ করার পূর্ব ট্রেনিং না থাকা, ভবন ধস, সর্বোপরি নিরাপদ কর্মপরিবেশের অভাব শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতের অন্যতম অস্তরায়। ২০১৩ সালের রানা প্লাজা ট্রাইজেডির পরবর্তী সময়ে আওয়ায়া লীগ সরকারের তৎপরতায় ২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন করে কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো যুগোপযোগী করা হলেও এখনো অনেক কলকারখানাগুলোতেই তা পুরোপুরিভাবে মানা হয় না। শ্রমিকদের জীবনমানের উন্নয়নের পথে অন্যতম বাধা কর্মের অনিচ্যতা। বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণবশত প্রায়ই কলকারখানাগুলোতে ছাঁটাই চলে। ফলে মুহূর্তে বেকার হয়ে পড়েন অনেক শ্রমিক। এছাড়া কর্মরত শ্রমিকদের বিশেষ করে নারী শ্রমিকের কর্মক্ষেত্রে হেনস্থা হওয়ার ঘটনাও প্রতিনিয়ত ঘটছে। শ্রমিকদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তিতে প্রতিষ্ঠিত শ্রম আদালতের দ্বারা হলেও বিচারিক কার্যক্রম অত্যধিক সময়সাপেক্ষ হওয়ায় সমাধানের চেয়ে ভোগান্তি পোহাতে হয় বেশি।

শ্রমিকের কর্মের নিশ্চয়তার সঙ্গে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা জড়িত। আর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে শ্রমিকের জীবনমানের উন্নয়ন। স্বল্পেন্তর থেকে বেরিয়ে এখন উন্নয়নশীল দেশের কাতারে বাংলাদেশ। ২০৩১ সালে আমরা উচ্চমধ্যম আয় এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশে পরিণত হবো। আগামীর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিরাট অংশ জুড়েই প্রয়োজন হবে শ্রমিকদের। তাই শ্রমিকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য এবং কর্মের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে সবার আগে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের তথ্য মতে, বাংলাদেশে বর্তমানে শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি ৮২ লাখ। এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো না গেলে উন্নত দেশের কাতারে নাম ওঠানো অনেকটাই অনিশ্চিত থেকে যাবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। তিনি ছিলেন শ্রমজীবী মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। ১৯৭২ সালে জাতির পিতার উদ্যোগ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। বর্তমান সরকারের তৎপরতায় শ্রমিকদের উন্নয়নে নানামুখী কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে স্বচ্ছ তদারকির প্রয়োজন। শ্রমিক নেতৃত্বের নামে অশ্রমিক শ্রেণির কারণে যেন সরকার ঘোষিত উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যর্থ না হয় সে বিষয়েও সচেতন দৃষ্টি দিতে হবে। শ্রমিকদের প্রাপ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হলে একদিকে যেমন দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমন্বয়শালী হবে, একই সঙ্গে তা ত্বরান্বিত করবে উন্নত বাংলাদেশের সম্ভাবনা।

লেখক:

শিক্ষার্থী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকাশ তথ্যঃ

পত্রিকা : দৈনিক ইন্ডিফাক।

তারিখঃ ২৩ মে, ২০২২।



# আধুনিকতার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

## আসিফ হোসেন

পরিবর্তন পৃথিবীর এক অপরিহার্য সত্য। পরিবর্তন থেকেই জন্ম নিয়েছে আজকের এই অত্যাধুনিক বিশ্ব। দুই যুগ আগের সময়ের সাথে বর্তমানকে তুলনা করলে বিজ্ঞান ও আধুনিকতার চরম বিপ্লবকে উপলক্ষ করা একদমই কষ্টসাধ্য নয়। এসকল পরিবর্তন আমাদের কাজকে সহজ, সাধারণ, কম সময় ক্ষেপণ করছে। সেই সাথে সৃষ্টি করছে অনেক দূরহ সমস্যারও। আধুনিকতার স্পর্শে উন্নত হচ্ছে পুরো দুনিয়া। আবার এটাই কাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমাদের জন্য। একদিকে মানুষের মহামূল্যবান সময় রক্ষা পাচ্ছে। অন্যদিকে, কিছু আবিষ্কার আমাদেরকে ব্যস্ত করেছে মূল্যহীন সব কাজে। জীবন রক্ষাকারী সব খোঁজ আজ প্রাণ হরণকারী আয়োজনে পরিণত হচ্ছে। অভূতপূর্ব আবিষ্কারের দ্বারা তৈরি হচ্ছে আকাশচুম্বী স্থাপনা। আবার এই মাধ্যমে ধূলিসাংহ হয়ে যাচ্ছে স্বপ্নের আঙিনা। প্রতিটি মুদ্রার ভিত্তি দুই পৃষ্ঠের ন্যায় প্রতিটি বিষয়েরও থাকে ভিত্তি চেহারা। বিজ্ঞান ও আধুনিকতার বিশাল বিপ্লবের আড়ালেও বিশ্ব ও মানবজাতি সম্মুখীন হচ্ছে অপূরণীয় সব ক্ষয়-ক্ষতির। বিজ্ঞানের হাত ধরে বহু সমস্যার সমাধান আসছে, সেই সাথে আসছে তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। যা দিন দিন রূপ নিচ্ছে বড় থেকে বৃহস্তরের। বিশেষজ্ঞদের কপালে টানছে চিন্তার রেখা।

ঘোড়ার গাড়িকে সরিয়ে তার স্থান করে নিয়েছে মোটরযান। ডাকবিভাগকে রিটায়ার্ড দিচ্ছে ইমেইল। এখন আর অন্ধকারে রাত্রি অতিবাহিত করার প্রয়োজন নেই। গৌশ্বের মৌসুমে হাত পাখার ব্যবসাও বিলুপ্তপ্রায়। কুড়েঘর গুলোর আর তেমন দেখা মেলে না, গড়ে উঠছে বিশাল স্থাপনা। আকাশের দিকে তাকালেই বিমান, হিলিকপ্টারের অবাধ বিচরণ। এসবতো রোগের প্রতিষেধক। তবে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো কি!

চলছে পৃথিবী আপন গতিতে। আর মানুষ বিশ্বকে উন্নত করছে দূর্বার গতিতে। মানব সভ্যতার পথে যত বাধা, সমস্যা এসেছে

মানুষই তার  
তবে, প্রতিটা  
জন্ম দিচ্ছে আরও<sup>১</sup>  
পদার্থবিজ্ঞানী  
ডিনামাইট তৈরি  
অনাকাঙ্ক্ষ ত  
মানুষের নির্মাণ  
করার উদ্দেশ্যে।  
মহান উদ্দেশ্য  
বর্তমানে মানুষ  
ব্যবহৃত অস্ত্র  
নিলে দেখা  
টি এ ন টি,  
প্রতিটি বিস্ফোরক  
আবিষ্কারের  
বর্তমান অবস্থা  
অনুরূপ। দেশে

সমাধা করেছে।  
সমাধানই যেন  
জটিল কিছু। প্রখ্যাত  
আলফ্রেড নোবেল  
করেছিলেন পাহাড়,  
স্থাপনা ধ্বংস করে  
কার্যকে প্রগতিশীল  
এর পেছনে যতই  
থাকুক না কেন,  
হত্যায় বহুল  
কিন্তু এটিই। খোঁজ  
যাবে, আরডিএক্স,  
এই চ এ ম এ ক্স  
প দা চ খ'র  
ইতিহাস ও  
ডিনামাইটের  
দেশে সহিংসতা ও

আতঙ্ক সৃষ্টিতে সুপরিচিত। পূর্বে একদেশ থেকে অন্য দেশে যেতে পাড়ি দিতে হতো নদী, পাহাড়, সমুদ্র। কয়েক মাসের যাত্রা শেষে ক্লান্ত শরীরের পৌঁছাতো গন্তব্যে। আবার কিছু ক্ষেত্রে মৃত শরীর। এতো ভোগান্তি ও জটিলতার প্রতিষেধক হয়ে আসলো মোটরযান, রেল, নৌযান ও আকাশজান। একইভাবে, আদিকাল ও আধুনিক যুগের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য সৃষ্টি করেছে বিদ্যুৎ। বিজ্ঞানের আজ পর্যন্ত সবচেয়ে মূল্যবান আবিষ্কার হিসাবে বিদ্যুৎকে চিহ্নিত করলে ভুল হবে না। বিদ্যুতের উপস্থিতি ব্যতিত আধুনিক বিজ্ঞানকে কল্পনা করা কোনোভাবে সম্ভব নয়। বিদ্যুতের গুরুত্ব যেমন সীমাহীন, এর ক্ষতিকর দিকগুলো তেমনই অপূরণীয়। এগুলোর প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক হলেও এর বিরূপ প্রভাবকে অগ্রাহ্য করার কোন উপায় নেই।

আজ বিশ্বাসীর জন্য সবচেয়ে বড় দুচ্ছিমার বিষয় হলো বৈশ্বিক উষ্ণতা। যানবহন থেকে নির্গত কালো ধোঁয়ার সিংহভাগই কার্বন মনোআক্সাইড নামক বিষাক্ত গ্যাস। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও শিল্প-কলকারখানাগুলোর ধোঁয়া থেকে বন্ধকণা, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড, সিসাসহ অন্যান্য ক্ষতিকর বহু উৎপাদন বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। এগুলো একদিকে দূষিত করছে বায়ু। অপরদিকে, বাড়িয়ে চলছে পৃথিবীর তাপমাত্রা। যার ফলে, মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। দুবে যাচ্ছে সমুদ্র তীরবর্তী বহু নিচু এলাকা। লবনাক্ত হয়ে পড়ছে লক্ষ লক্ষ হেক্টের ক্ষীণ জমি। সেই সাথে উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে স্বাস্থ্য ঝুঁকিও। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) এর গবেষণার তথ্য মতে, দেশে কালো ধোঁয়ার কারণে প্রতি বছরে মারা যাচ্ছে ৮৫ হাজারের বেশি মানুষ। যার মধ্যে শহরাঞ্চলের লোকজনের সংখ্যা বেশি। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, কালো ধোঁয়ায় থাকা বন্ধকণা ও সালফার ডাই অক্সাইডের প্রভাবে ফুসফুস, কিডনি জাটিলতা ও হৃদরোগের ঝুঁকি রয়েছে। এ ছাড়া, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড ও



সিসার কারণে শাস্যন্ত্রের প্রদাহ, নিউমোনিয়া, ব্রক্ষাইটিস ও শিশুদের বুদ্ধিশূন্তি ব্যাহত হয়। সেই সাথে এসকল গ্যাসের ফলে ‘পৃথিবীর রক্ষাকৰ্চ’ বায়ুমণ্ডলের ওজন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যেটা সূর্য থেকে নির্গত ক্ষতিকর অতিবেগনী তেজস্ক্রিয় রশ্মিকে পৃথিবীতে আসতে বাঁধা দেয়। এই রশ্মির কারণে তুকের ক্যান্সার থেকে শুরু করে চোখের বড় রকমের ক্ষতি হতে পারে। তবে, দুঃখজনকভাবে আমাদের কার্যক্রমে স্তরটিতে ছিদ্র হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, শিল্প-কারখানা ও যানবাহনে ব্যবহার করা হচ্ছে বিপুল পরিমাণে জ্বালানি। এসব জ্বালানির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তেল, গ্যাস ও কয়লা প্রভৃতির খনিজ পদার্থ। অনেকের মাঝে খনিজ পদার্থের পরিমাণ অসীম মনে করার এক ভাস্তু ধারণা পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, খনিজ পদার্থের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। যা প্রতিদিন উত্তোলিত ও নিঃশেষ হচ্ছে। নতুন খনিজ পদার্থ সৃষ্টি হওয়া খুবই জটিল ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। আমাদের ব্যবহার করা খনিজ সম্পদ ভূগর্ভে সৃষ্টি হতে সময় লেগেছে কয়েক হাজার বছর। এসব প্রয়োজনীয় সম্পদের অবাধ ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা আমাদের আগামী প্রজন্মকে ঠেলে দিচ্ছি হৃষ্মকির মুখে। সেই সাথে আমাদের এই সুন্দর ধরণী সম্মুখীন হচ্ছে কিছু অপূরণীয় ক্ষতির।

সাধারণের কাছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত এক প্রযুক্তি। এগুলো শুধু যোগাযোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। যোগাযোগ, বিনোদনের গভীর পেরিয়ে এগুলো পৌঁছে গেছে অপসংস্কৃতি ও অপপ্রচারের দ্বারে। মানুষের প্রয়োজন থেকে আসত্ত্বের রূপ নিচ্ছে। টেলিভিশন, ইউটিউবের মতো প্লাটফর্মও অসুস্থ বিনোদনের জনপ্রিয় মাধ্যম। তরুণ সমাজের মাঝে

ডিভাইস কেন্দ্রীক হওয়ার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে নিছক ভার্চুয়াল জগতে। স্যোশাল মিডিয়া যেমন সচেতন করছে সমাজকে তেমনই সমাজ ও গোষ্ঠী সহজেই গোমড়া হচ্ছে বিভিন্ন গুজবে বিশ্বাস করে। এসকল হজুগে বিশ্বাস প্রায় সময় সহিংসতা ও হানাহানির রূপ ধারণ করে। সম্প্রতি কুমিল্লার মন্দিরে পরিত্র কোরআন শরীফ অবমাননার বিভাস্ত খবর দেশ জড়ে হিন্দু-মুসলিম বিদ্রে ও হামলার বিষয়টি সকলেরই জানা। এছাড়া ইলেকট্রনিক ডিভাইসের অত্যাধিক ব্যবহার বিভিন্ন জটিল রোগের কারণ। এসকল অনিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণে সরকার ও বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীদের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

“কেরে তুই কোন দৈত্যদানো সব যে কেড়ে নিলি। কেরে তুই, কেরে তুই সব সহজ শৈশবকে বদলে দিলি কিছু যাস্ত্রিক বর্জে।” গানের এই পঙ্কজিতি বাস্তব অবস্থার বহিঃপ্রকাশ। গানের দৈত্য দানবটি হলো আধুনিকতা। যেটা কেড়ে নিছে নতুন প্রজন্মের চত্বরে শৈশবকে, তিলে তিলে গিলে থাচ্ছে আমাদের গ্রিত্যকে, মানুষকে পরিণত করছে যত্রে। পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ককে করছে তুচ্ছ, মূল্যহীন। আগের মতো এখন আর খেলার মাঠ নেই। মাঠ খাকলেও খেলোয়াড় নেই। নেই শিশুদের মধ্যে দুরন্তপনা। রাতের লোডশেডিংয়ে দেখা যায় না কানামাছি খেলা। মেয়েদের পুতুল খেলা বা ছেলেদের ডাঙগুলি। কুতুহ, কাবাড়ি, নুনতা খেলা আর কতো কি! যেগুলো শিশুদের দৈনিক কাজের তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। আর এখন এগুলোর নামও বর্তমান প্রজন্মের কাছে অজানা। আধুনিক ডিভাইস, গেইমসের কবলে তাদের চত্বরতা মৃতপ্রায়। সামাজিক ও মানসিক বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত। তাদের মধ্যে প্রবেশ করছে কর্মবিমুখতা। মানুষের আবিষ্কার আজ মানুষকে অমানুষে পরিণত করছে-হাদয়বিহীন এক যত্নে। মাসলোর চাহিদা সোপান তত্ত্বের প্রথম জৈবিক চাহিদার স্তর পূরণ করে ছুটিছি খ্যাতি ও ব্যাংক ব্যালেন্স বৃদ্ধিতে। মানুষের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি নিষ্পাণ কাগজ, যত্নের সাথে। আপনজনদের থেকে ক্রমেই বাড়ছে দুরত্ব। ব্যস্ততার জালে ভুলে যাচ্ছি পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব, কর্তব্য। প্রবীণ বয়সে সঙ্গী তাদের একাকীভু। বাবা মার কাছে সন্তান অমূল্য, তবে সন্তানের কাছে বাবা মা আজ মূল্যহীন এক বোৰামাত্র।

বৈকৃত আধুনিকতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলা যায় পারমাণবিক অস্ত্রকে। এটি বিস্ময়কর এক আবিষ্কার তবে জনহিতকর কোনো কাজেই তার ব্যবহার নেই। আছে শুধু ধ্বংস যোজ্ঞ চালানোর এক বিশাল ক্ষমতা। ছোট আকারের একটি পারমাণবিক বোমা গোটা একটি শহরকে মৃত্যুর বিলীন করে দিতে পারে। শুধুমাত্র আতঙ্ক ও ক্ষমতার মশাল জুলিয়ে রাখতে বেশ কিছু দেশ মেতে উঠেছে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি ও ব্যবহারে। পৃথিবী সাক্ষী হিরোশিমা নাগাসাকির ভয়ংকর ইতিহাসের। পারমাণবিক বিস্ফোরণে বাসা বাড়ি, স্কুল কলেজের মতো প্রাণহীন স্থাপনার সঙ্গে বিলীন হয়ে যায় লাখ লাখ নিষ্পাপ মানুষের প্রাণ। এর পর কোনো পারমাণবিক হামলা না হলেও এর উৎপাদন থেমে থাকে নি। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়ার মতো দেশের দখলে রয়েছে হাজার হাজার পারমাণবিক অস্ত্র। নিজেদের সামর্থ্য প্রতিষ্ঠায় ব্যবহার করতেও তারা পিছ পা হবে না ভবিষ্যতে। পারমাণবিক অস্ত্র মানবজাতির অস্তিত্বের জন্য সবচেয়ে বড় হৃষ্মকি। এর ব্যবহার উৎপাদন ও ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে বিশ্ব মোড়লদের একত্রিত হতে হবে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নাদন বন্ধ করে দেওয়া হোক, এমন কিছু আমি চাই না। এমন কিছু বলছিও না। বরং বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হোক এখন পর্যন্ত ঘটিত বিজ্ঞানের বিজ্ঞপ্তি প্রভাব থেকে বিশ্বকে মুক্ত করার জন্য। উজার করা বনভূমির বিকল্প কিছু আবিষ্কার হোক। ওজনস্তরের ছিদ্র বন্ধ করার পদক্ষেপ নেয়া হোক। নতুন আবিস্কৃত কিছুকে স্বীকৃতি দেবার পূর্বে এর সন্তান্য সকল ক্ষতিকর দিক পূর্বানুমান ও মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। ক্ষতিকর প্রযুক্তি পরিহার করতে হবে। সেই সাথে এগুলো নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণপূর্বক বাজারজাতকরণ করা আবশ্যিক। একইভাবে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে। এভাবেই একদিন বিশ্ব আধুনিকতার অদৃশ্য বেড়াজাল থেকে মুক্তি পাবে।

লেখকঃ

উপ দপ্তর সম্পাদক; বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, শাখা।

প্রকাশ তথ্যঃ

পত্রিকাঃ প্রতিদিনের সংবাদ।

তারিখঃ ২২ নভেম্বর ২০২১।



# মধ্যবিত্তের নিরব আর্তনাদ কারা দেখবে? কাব্য সাহা

**জী**বনভর জাঁতাকলে পিষ্ট মানুষদেরই বলে মধ্যবিত্ত। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের অভিধানের অন্যতম বিষয় ‘হিসাব’ করে বেঁচে থাকা। জীবন কিংবা জীবিকা তাদের চলার পথে নিত্যসঙ্গী অঙ্ক করে তার একটি চিত্র দাঁড় করানো। জীবনের প্রতিটি ধাপে তাদের চলাতে হয় ক্যালকুলেটরের ‘হিসাব’। সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও তাদের বেঁচে থাকার আশা জোগাতে হয়। করোনা মহামারির দোলাচালে তাদের সেই হিসাবি জীবনটাতেও নানা রকমের জটিলতা তৈরি হয়েছে। একরকম অজানা গন্তব্যের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে মধ্যবিত্তদের। করোনার ছোবলে অনেকেই চাকরিচ্যুত হয়েছে। মহামারির ছোবল থেকে বেরিয়ে পুনরায় নিজেদের নতুন ভাবে জীবনযুক্তে বিনিয়োগ করছে মধ্যবিত্তরা। ঠিক সেই সময় দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত উর্ধ্বগতি মধ্যবিত্ত পরিবারে নতুন রকমের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অস্থিতিশীলতা মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্যালকুলেটরের আউটপুট অস্পষ্ট করে দিচ্ছে। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক চাহিদার গুরুত্ব অপরিসীম। আর মৌলিক চাহিদার অন্যতম হলো খাদ্য। সেই খাদ্যের জোগান দিতে মধ্যবিত্ত পরিবার এখন রীতিমতো হিমশিম থাচ্ছে। চাল, ডাল থেকে শুরু করে নানা রকম সবজি, মাছ, মাংসের বাজারে যেনো আগুন লেগেই আছে। শুধু তাই নয় নিত্য ব্যবহার্য প্রায় প্রতিটি পন্যের জন্য যেন নতুন মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

কিন্তু কেনো নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্ৰী দাম আকাশচূম্বী? কেনো বার বার মধ্যবিত্ত মানুষদেরকেই এসব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়? করোনার ছোবল কাটিয়ে কিছু মানুষ বেকারত্ব সমস্যা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন স্বপ্ন দেখছে, নতুন ভাবে পরিবার নিয়ে বেঁচে থাকার পরিকল্পনা সাজিয়েছে কিন্তু দ্রব্যমূল্যের অসঙ্গতি যেন সীমারেখা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আয়ের চেয়ে ব্যয়ের ঘরের অক্টাই এখন মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের খাদ্য তালিকায় ডাল-ভাত কিংবা সবজির ব্যবহার সবচেয়ে বেশি হলেও এখন এগুলোর জন্যও গুনতে হচ্ছে বাড়তি অর্থ। এর সাথে ভোজ্য তেলের দামে ক্রমাগত উর্ধ্বগতি মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস উঠে আসছে।

মধ্যবিত্ত পরিবারের সংসার চলাতে এখন প্রতি ধাপে ধাপে বিপর্যয়ের শিকার হতে হচ্ছে। খাদ্যের জোগান, সন্তানের পড়াশোনার খরচ, চিকিৎসা, বসবাসের অর্থের বাড়তি চাহিদা সবকিছু মিলিয়ে মধ্যবিত্তরা একপ্রকার নিরুপায় হয়ে পড়ছে। এদিকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি না পারে কোথাও এই আক্ষেপ প্রকাশ করতে, না পারে লোকচক্ষুর লজ্জাবোধ কাটিয়ে কারও সাহায্য নিতে। সামাজিক মর্যাদা এবং ব্যক্তিগত সম্মানটাও তাদের আটকে দেয়।

অনেক মধ্যবিত্ত পরিবার দীর্ঘ জীবনের বসবাসের শহর ছেড়ে গ্রামে ফিরছেন কিছুটা কষ্ট লাঘব হবে- এই আশায়। পরিস্থিতি আজ তাদের দাঁড় করিয়েছে কঠিন বাস্তবতার সামনে। কিন্তু সেখানেও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে আয়ের উৎসের চেয়ে ব্যয়ের হিসাবটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা এই মানুষদের জন্য। পাশাপাশি শহরে বসবাসরত অধিকাংশ মানুষদের রাঙ্গার একমাত্র উপায় গ্যাসের চুলার ব্যবহার করা। সেই গ্যাস-সিলিন্ডারের মূল্যের উর্ধ্বগতিতে মধ্যবিত্ত মানুষ উপায়হীন প্রায়।

এরইসাথে মরার উপর খাঁড়ার ঘা হয়েছে বাসের ভাড়া বৃদ্ধি। পাবলিক বাসের ব্যবহার করে থাকেন মধ্যবিত্ত পরিবার কিংবা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষেরাই। বলা যায় পাবলিক বাসগুলো এদের চলাচলের জন্য। উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা ব্যক্তিগত যানবাহনের ব্যবহার করে থাকে। ব্যক্তিগত যানে করে এক জায়গা থেকে অন্য যায়গায় যাতায়াত করে থাকে। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের জন্য কর্মসূল থেকে শুরু করে যেকোনো কাজের জন্যই পাবলিক যানের ব্যবহারই শেষ ভরসা। এখন সেখানেও যুক্ত হয়েছে নতুন প্রতিবন্ধকতা। পাবলিক বাসের ভাড়া বৃদ্ধির কারণে এখানেও তাদের গুনতে হচ্ছে বাড়তি অর্থ।

মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীদের কথা আর বলার অপেক্ষা রাখেন। উর্ধ্বগতির সবকিছুর মধ্যেই যখন সন্তানের পড়াশোনার জোগান দিতে হয়, টিউশন ফিসহ নানা কিছুর অর্থ গুনতে হয় তখন ঐ পরিবারই শুধু ভিতরের হাহাকারটা বুঝতে পারে। পাশাপাশি পড়াশোনার তাগিদে যাদের বাড়ির বাইরে থাকতে হয় সেই ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরাই জানে পরিস্থিতি কতটা শোচনীয়। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির অজুহাতে মেস বা বাসা ভাড়া বাড়াতে শুরু করেছে মালিকপক্ষ। রাঙ্গার উপকরণ, গ্যাস অর্থাৎ খাবারের জন্য গুনতে হচ্ছে বাড়তি অর্থ।

প্রায় প্রতিটি পদে পদে গুনতে হচ্ছে এই বাড়তি অর্থ। মৌলিক চাহিদা পূরণেই একরকম হিমশিম থেতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। যোগাযোগ বা যাতায়াতের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বাড়তি ভোগান্তিতে যোগ হয়েছে স্টুডেন্ট হাফপাশ নেই বলে বাড়ি ভাড়ার পুরো টাকা।

মধ্যবিত্তের একরকম জিম্মি হয়ে পড়ছে বর্তমান এই পরিস্থিতির নিকট। আসলে এই প্রতিবন্ধকতার শেষ কোথায়? মধ্যবিত্তের নিরব এই আর্তনাদ কারা দেখবে? এদের হাহাকারের কথা কারা শুনবে? জীবনভর জাঁতাকলে পিষ্ট হতে হতেই বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে

মধ্যবিত্ত পরিবারের এই মানুষগুলো কিন্তু ক্যালকুলেটরে হিসাব কষতে ক্ষতে জীবনের বাস্তবতার অঙ্ক মিলানোই এখন মধ্যবিত্তদের

বড় চ্যালেঞ্জ।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

প্রকাশ তথ্যঃ

পত্রিকাঃ ইতেফাক।

তারিখঃ ১৪ নভেম্বর ২০২১।



# শিক্ষকের উপর হামলা ; নৈতিক অধঃপতন ইমরান উদ্দিন

শিক্ষক জাতি গড়ার কারিগর। শিক্ষক একজন ছাত্রকে মানুষের মতো করে গড়ে তুলে। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। সেই ভবিষ্যতকে গড়ে তুলে শিক্ষক। মা-বাবা সন্তান জন্ম দিয়েছে। সন্তানদের প্রতিপালন করে। আদর-যত্ন, ভালোবাসার পরিশে আঁকড়ে রাখে সবসময়। মা-বাবারা সন্তানদের জন্য সবকিছুই করেন। একজন শিশু প্রাথমিকভাবে যা কিছু শিখে সেগুলো মা-বাবার কাছে থেকেই শিখে। বলা যায়- শিশুদের মা-বাবাই শিক্ষার প্রথম সোপান। কিন্তু তারা পরিপূর্ণ শিক্ষা দিতে পারেনা। পরিপূর্ণ শিক্ষার জন্য যেতে হয় মাদরাসায় বা স্কুলে। প্রতিষ্ঠান থেকে সন্তানরা শিক্ষালাভ করে। এ ক্ষেত্রে মা-বাবারা যদি প্রথম জন্মদাতা হয়, শিক্ষকরা হলো দ্বিতীয় জন্মদাতা। মা-বাবারা পৃথিবীর আলো দেখিয়েছেন। শিক্ষকরা পৃথিবীর সবকিছু শিখার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাই মা-বাবার মতো শিক্ষকরা সম্মান পাওয়ার হকদার। তাদের সর্বাবস্থায় সম্মান করতে হবে। এটা পারিবারিকভাবে একজন ছাত্রকে শিক্ষা দিয়া উচিত।

বাংলাদেশে কয়েককিসিমের শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে- কওমি -আলিয়া, স্কুল -কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক, মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক থেকে স্নাতক এভাবে শিখা শেষ করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে গিয়ে শিক্ষার পাশাপাশি একজন আদর-আখলাক, মানবিকবোধও নৈতিকতাবোধ শিখার কথা। এখানে শিখার কথা কাকে সম্মান করতে হবে, কাকে মেহ করতে হবে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন কেন?

বাস্তবতায় একটা সময় শিক্ষক আর ছাত্রের মধ্যে একটা আত্মার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এটা এখন কম দেখা যাচ্ছে। দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। কারণ হিসেবে আমার মনে হয়, একজন শিক্ষার্থী আদর-আখলাক শিখে তার ধর্মীয় রীতি-নীতি থেকে। ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে। প্রযুক্তির যুগে ছাত্র-ছাত্রী ধর্মীয় শিক্ষা থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে। অভিভাবকরাও তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে

কম নয়। ফলে তারা আদর-শিক্ষকরা বেত নিয়ে যেতেন অস্বভাবিক আচরণ সামলাতে করতো এই বেত। যদিও কিছু করেছেন। তবে সেটা নগ্নন্য।

যেদিন থেকে বেত কেড়ে নেয়া আস্তে ছাত্রদের হাতে বেত হয়েছে। একজন শিক্ষকের একেবারে আশ্চর্যজনক ব্যাপার স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। সুবিধা ভোগ করত না দেয়ায় প্রতি চূড়ান্ত পরীক্ষায় এই কারণ, আমি চুরি করবো, কাজ দাঢ়িয়ে থাকা। এ হচ্ছে দিন আগে সাভার আশুলিয়ায়

আখলাক শিখছেন। আগে ক্লাসে। ছাত্রদের যেকোনো যথেষ্ট শক্তি হিসেবে আকাজ শিক্ষক এটাকে অপব্যবহারও শিক্ষকদের হাত থেকে হয়েছে। সেদিন থেকে আস্তে তুলে নেয়ার প্রবণতা তৈরি গায়ে হাত তুলা একসময় ছিলো। কিন্তু এখন এটা ছাত্র পরীক্ষার হলে অনেতিক শিক্ষকের গায়ে হাত তুলছে। নিউজ নিয়মিত দেখতে হয়। আপনি বলার কে? আপনার বর্তমান অবস্থা। গত কয়েক



হাজী ইউনুস আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজের মাঠে উৎপল কুমার সরকারের ওপর অতর্কিত হামলা চালায় দশম শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার ভোরে উৎপল মারা যান। কেন মারছে এটা দেখলে দেখবেন- ওই ছাত্র আশুলিয়ায় নিজ স্কুলের ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করতো। একইসঙ্গে তার চলাফেরা ছিল উচ্ছ্বেষণ। এসব কারণে ওই স্কুলের শিক্ষক উৎপল কুমার সরকার ছাত্রকে শাসন করেছিলেন। এতে ক্ষুর হয়ে শিক্ষককে ক্রিকেট খেলার স্টাম্প দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে ওই ছাত্র। এই যে- উৎপল কুমারের উপর হামলার মূল কারণ, ছাত্রের উচ্ছ্বেষণ ও অনেতিক কাজে বাঁধা দেয়া। এরকম ঘটনা শুধু একটা না। বর্তমানে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে এরকমন কিছু গ্যাং তৈরি হয়েছে। যাদের কিছুই বলা যায় না। তাদের কোন কাজে বাধা দিলেই হামলা। অথবা ছাত্রদের হাতে নানানরকম হেনস্তার শিকার হতে হয়।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার এই রূপ দিন দিন তয়ঃকর ধারণ করতেছে। অভিভাবকদের উচিত নৈতিককার শিক্ষা দেয়া। ছেলের বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক থাকা। অনেক চরিত্রহীন লম্পট বন্ধুদের সাথে মিশে খারাপ কাজ করতে পারে। বন্ধুর নৈতিক অধঃপতন আরেকজনের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করে। কারণ, যাদের কাছে মিশে তারা যদি অনেতিক কাজে লিপ্ত হয় সেই প্রভাব ভালোদের মাঝেও পড়ে।

আর শিক্ষককে হতে হবে নৈতিকতাবান। শিক্ষক হতে হবে আদর্শের কারিগর। যাকে অনুসরণ করা যায়। শিক্ষককে হতে হবে ছাত্রদের মাঝে সব দিক দিয়ে আদর্শের মূর্ত্পথিক। যার চারিত্রিক আকর্ষণ ছাত্রদের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করবে। তবেই একজন

ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবো পাশাপাশি শুদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা বিদ্যমান থাকবে। একজন আদর্শবান শিক্ষক গড়ে তুলতে পারেন একটা আদর্শবান জাতি। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের যেমন আদর্শবান হওয়া জরুরি তেমনি তারচেয়ে বেশী আদর্শবান হওয়া জরুরি শিক্ষকদের। শিক্ষকের প্রতিটি কথা ও কাজ ছাত্রদের কাছে দলীল হয়ে যায়।

বর্তমান যে ধারা অব্যাহত রয়েছে তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা ছাড়া এই সমস্যা উত্তরণ সম্ভব নয়। তারচেয়ে বেশী দরকার পারিবারিক শিক্ষা। শিশু থেকে যদি নৈতিক শিক্ষা লাভ না করে তাহলে বড় হয়ে মূর্খতায় পরিণত হয়। প্রথম নৈতিক শিক্ষা পায় পরিবার থেকে। তাই এ অধঃপতনের দায় পরিবারেরও কম নয়। ছাত্রো নৈতিক শিক্ষা পেলেই সম্মান করতে শিখবে। আদব-আখলাক শিখবে। তবে- শিক্ষক, মা-বাবা, সমাজের সবাইকে সম্মান করবে। ছেটদের স্নেহ করবে। বড়দের সম্মান করবে। এজন্য ধর্মীয় শিক্ষা বাদ না দিয়ে আরো যোগ করা উচিত। প্রতিটি ধর্মের মানুষের উচিত ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ করে তা বাস্তব জীবনে বাস্তবায়ন করা। হ্যারত আলী রাঃ এর বলেছেন - “ যে ব্যক্তি আমাকে একটা অক্ষর শিখিয়েছে, সে আমাকে দাস বানিয়েছে” অর্থাৎ - আমরা যার কাছ থেকেই শিখি না কেন! তিনি আমার শিক্ষক। তাকে সম্মান করা সকল ছাত্রের কর্তব্য। এতেই শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী উভয় নিরাপদ থাকবে। দিল্লির বাদশাহ আলমগীর শুধুমাত্র পুত্র শিক্ষকের পায়ে ঢালছে কিন্তু নিজের হাতে ধূয়ে না দেয়ার কারণে তিনি মনে করেছে আমার ছেলে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেনি। যদি করতো তাইলে নিজ হাতেই শিক্ষকের পা ধূয়ে দিতো। বাদশাহ আলমগীর কত মর্যাদায় দিলেন শিক্ষকদেরকে। এটা পারিবারিকভাবে সন্তানদের শিক্ষা দেয়া উচিত। শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যে সাপে নেউলে সম্পর্ক চাইনা। আর চাইনা জাতিগড়ার কারিগরদের উপর হামলা হোকা আর চাইনা জাতিগড়ার কারিগরের এরকম অস্বাভাবিক মৃত্যু হোক। শিক্ষক এবং ছাত্রের সুসম্পর্ক গড়ে উঠুক। এবং গড়ে উঠুক একটি আদর্শ জাতি।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশ তথ্যঃ  
পত্রিকাঃ দৈনিক মানবকল্প  
তারিখঃ ০৬ জুলাই ২০২২।



# বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তি চাই

## অনিল মো. মোমিন

দেশে উচ্চশিক্ষার মান নিয়ে গড়পরতা কথাবার্তা মাঝে মাঝে আলোচনায় আসলেও এ নিয়ে মূলত বাড় উঠে কিউএস র্যাঙ্কিং প্রকাশের পরপরই। বরাবরের মতো এবারের পরিসংখ্যানের পরেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার মান নিয়ে চলছে জোর আলোচনা। তবে এই আলোচনা-সমালোচনা অবশ্য গুটিকয়েক শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষাবিদ আর মিডিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ইউজিসির কারো আছে এসব র্যাঙ্কিংর খবর পৌঁছায় কি না সেটাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। তো এবারের কিউএস র্যাঙ্কিংয়ে সেরা ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় বাংলাদেশের একটি নেই। দেশের ৫২ টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাবি ও বুয়েট র্যাঙ্কিংয়ে ৮০১ থেকে ১০০০ এর মধ্যে রয়েছে। তাও টানা পাঁচ বছর ধরে। অন্যদিকে কিউএস র্যাঙ্কিংয়ে ৫০০ এর মধ্য প্রতিবেশী ভারতের ৯টি ও পাকিস্তানের ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ১৬০টি সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। যা আনুপ্রাতিক হারে ভারত পাকিস্তানের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি। তবুও কেউ র্যাঙ্কিং এ আসতে পারেনি, উন্নতিও করতে পারেনি। এরপরেও নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন হচ্ছে। শিক্ষার মান নিশ্চিত করে না করে এতো বেশি বিশ্ববিদ্যালয় কেনো গড়তে হবে তার হবে তার উত্তর সংশ্লিষ্টরা ভালো জানেন। তবে সম্প্রতি আমরা গণমাধ্যম থেকে জেনেছি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি একটি প্রকল্প প্রস্তাব করা হচ্ছে। ৫০ একর জমির উপর ওই বিশ্ববিদ্যালয়টি নির্মাণে সর্বোচ্চ ১ হাজার কোটি টাকার বেশি লাগবে না বলে মন্তব্য করেছেন স্বয়ং ইউজিসির নেতৃত্বানীয় একজন। ওই ডিপিপি কমানোর জন্য বলা হলেও সংশ্লিষ্টরা কাটাঁট করে সেটা আবার ১০ হাজার কোটির ঘরেই রেখেছেন। বেশি বেশি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে আগ্রহের বড় কারণ হ্যাতো এটি একটি। এতো এতো বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ র্যাঙ্কিং নেই এই পাজল( **Puzzle** ) বোার আগে জানতে হবে এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণাটি আসলে কেমন।

এক কথায় এদেশের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সরকার এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় ধারণাটি আসলে কেমন তা স্পট নয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক ধারণার সাথে যে মিল নেই তা সুস্পষ্ট। একটি বিষয়ের তাত্ত্বিক ধারণার পাশাপাশি প্রায়োগিক দিকটি অধিক লক্ষণীয়। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায়োগিক দিকটি কী তা লক্ষ করলে প্রকৃত অবস্থা জানা যাবে। প্রায়োগিক দিকটি বুৰাতে কয়েকজন শিক্ষার্থীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কৃত্ত নামের ছেলেটি দেশের একটি শৈর্ষস্থানীয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে গতবার। ছেলেটির ক্লাস শুরু হয়নি তখনো। নিজের বিভাগের সিলেবাস বা পড়াশোনা নিয়ে কোন পরিকার ধারণাও নেই। এর মধ্যে একদিন এক বড় ভাইয়ের কাছে এসে জানতে চায় বিসিএসের জন্য সে কী কী পড়বে, কোন কোন বই কিনবে। আরেক শিক্ষার্থী রূপস্তী। ভর্তি পরীক্ষায় শীর্ষে অবস্থান করেও তুলনামূলক একটি সাধারণ বিষয়ে ভর্তি হয়েছে। এর কারণ জিজেস করলে সে জানিয়েছিলো প্রথম বর্ষ থেকেই চাকুরীর পড়াশোনা শুরুতে চায়। ভালো বিষয়ে ভর্তি হলে পড়ালেখার চাপে চাকুরীর পড়া পড়তে পারবে না। অন্যদিকে অভি স্বুরে রাজনৈতিক দলের নেতাদের পেছনে। তাদের পিছু না থাকলে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে না। নেতা হবে সে। আর ক্লাস টিপার ছাত্র তোহিদ মনে করে কোর্সের বাইরে সভা-সেমিনার, শিল্প-সাহিত্য পড়া ও বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনে জড়ানো মানে সময়ের অপচয়। দুদ্ধনামের এই চারত্রিগুলো বাস্তব এবং এরা সকল ক্যাম্পাসে বর্তমান অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করেন। অর্থ প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাল্স পেতে এক প্রকার যুদ্ধে অবতীর্ণ হোন। এসবের জন্যেই কী? এরা কি জানে বিশ্ববিদ্যালয় আসলে কী জিনিস!

শিক্ষকরাই ‘বিশ্ববিদ্যালয় ধারণা’ কতটুকু রাখেন? শিক্ষকতার নৈতিক দায়িত্ব পালনের চেয়ে তাঁরা বেশি যুক্ত থাকেন রাজনীতিতে, নীল-সাদা দলে, শাপলা-কমলা ফোরামে। এরপর নানান মিটিং-সেটিং শেষ করে যান ক্লাসে। এ যেন খড়কালীন কাজ! কেউ কেউ আবার যথাসময়ে ক্লাস না নিয়ে ঘটার পর ঘন্টা শিক্ষার্থীদের বসিয়েও রাখেন। কখনো কখনো ক্লাস না নিয়ে ছেড়ে দেন। কারো কারো ক্লাসগুলোও যেন মনমরা। আবার কোন শিক্ষক শীট দেখে দেখে বাংলা তরজমা করেন। গংবাঁধা কিছু আলোচনা আর শীট ধরিয়ে দেন। লেকচারের মান দেখেই বুঝা যায় এই ক্লাসের জন্য স্টাডি করে আসেননি। কখনো কোনো শিক্ষক রাজনৈতিক কর্মসূচিতেও যেতে বলেন। আবার ভিসিরা ক্যাম্পাসে না এসে অফিস করেন ঢাকায় বসে। আছে ভিসিরের এমন নানান কেলেক্ষারি। কেউ আবার দিনের ক্লাস নেন শেষ রাতে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রশাসকেরা কখনো ছাত্রকে থাপড়িয়ে সোজা করে দিতে চান। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের সমাধান পেতে যেতে হবে ‘লাঞ্ছের পর।’ এসব ঘটনা কি কোনোটা বিশ্ববিদ্যালয় ধারণার সাথে যায়? এককথায় উত্তর, ‘যায় না।’

ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরের লাল নেহেরু বলেছিলেন, “একটি দেশ ভালো হয় যদি সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভালো হয়।” বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব কতটা তা একথা থেকে স্পট। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কী সে সম্পর্কে সবার একটি তাত্ত্বিক ধারণা থাকা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে রবিন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “যেখানে বিদ্যা উৎপন্ন হয়।” এর মানে উৎপাদিত বিদ্যা বিতরণই বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কাজ নয়। নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি করাও এর কাজ। যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এম. ওয়াহিদ বিখ্যাত বিটিশ ধর্মতাত্ত্বিক কার্ডিন্যাল জন হেনরি নিউম্যানকে উদ্বৃত্ত করে লিখেছেন “বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটি পরিবেশ, যেখানে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে নরনারী এক জায়গায় এসে জড়ে হবেন, এক জায়গায় থাকবেন, তাদের মধ্যে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির ভাবের দেয়া-নেয়া হবে। এখানে মনের সঙ্গে মনের দ্বন্দ্বে, জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের সংঘর্ষে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি হবে, পুরনো জ্ঞানের চুলচেরা বিশ্লেষণ হবে, হবে পরিমার্জন-পরিবর্ধন ও পরিবর্তন।” তিনি এই লেখায় আরো উল্লেখ করেন, ‘জার্মান দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ উইলহেলম ভন হামবল্ট (১৭৬৭-১৮৩৫) ১৮১০ সালে একটি মেমোরেন্ডামে লিখেছিলেন, ১. শিক্ষণ-গবেষণা, ২. শিক্ষার স্বাধীনতা

ও ৩. স্বশাসন—এ তিনের সমন্বয়ে গড়ে উঠতে পারে একটি পূর্ণপ্র বিশ্ববিদ্যালয়।' অপরাপর বক্তব্য থেকে বলতে পারি বিশ্ববিদ্যালয় হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে উচ্চশিক্ষা প্রদান করাসহ বিভিন্ন ধরনের গবেষণামূলক কাজকর্ম করা হয়ে থাকে। আধুনিক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এর ধারণাটি বিস্তৃত এবং ব্যাপক। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, কলা, সামাজিক-বিজ্ঞানের বিস্তৃত বিষয়াদি সবই বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি। নতুন নতুন জ্ঞান উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নেতৃত্ব দিচ্ছে। এভাবে সমাজ, অঞ্চল ও দেশের ক্ষুদ্র পরিসর হেতু বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠে বিশ্বকেন্দ্রিক। এই তাত্ত্বিক ধারণার সাথে প্রায়োগিক দিক বিবেচনা করলে দেখি আমাদের দেশে যেন বিশ্ববিদ্যালয় বন্দী হয়ে আছে কোন এক অদ্য জালে। স্পষ্ট করে বললে বিশ্ববিদ্যালয় বন্দী হয়ে আছে রাজনীতির ফাঁদে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো 'বিশ্ববিদ্যালয়' হিসেবে বিকশিত হতে প্রধান অন্তরায় রাজনৈতিক অপসংকৃতি। বিশ্বজুড়ে খ্যাতিসম্পন্ন এদেশের রাজনীতি (!) ক্যান্সারের মতো ছড়িয়ে পড়েছে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে। অপরাজনীতির থাবায় ছন্নবিচ্ছন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও তার শিক্ষা। তাই আমরা দেখি রাজনীতির ছোবলে প্রাণ দিতে হয় শিক্ষার্থীদের। এক শিক্ষার্থী হয়ে যায় আরেক শিক্ষার্থীর চিরপ্রতিদৰ্শী। পড়াশোনার পরিবর্তে হাতে তুলে নেয় লাঠিসোটা আর অস্ত্র। এসব দেখার বা নিয়ন্ত্রণ থাকে না বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবকদের। কারণ এখানে খুব কমই ভিসি-শিক্ষক নিয়োগ হয়। এখানে ভিসি-শিক্ষক নিয়োগের ছদ্মবেশে দলীয় কর্মী নিয়োগ হয়। দলীয় মতাদর্শের শিক্ষক-শিক্ষার্থী যাই করুক, বলুক নির্বিকার থাকে আর ভিসি মতাদর্শের হলে নির্বিচারে শাস্তিপ্রদান করে। উপাচার্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণার সাথে যায় এমন কাজে কমই সম্পৃক্ত থাকে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি নির্ভর করে ভিসিদের গুণ-মান-দক্ষতার ওপর। কিন্তু রাজনীতিদুষ্ট এবং ত্রুটিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় উপাচার্য নিয়োগ হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় তার সৌন্দর্য হাঁরায়। ভিসিরা তখন দলের প্রতিনিধিত্ব করার মাধ্যমে বেছাচারিতার বৈধতা নিয়ে নেয়। যার ফলে দেখতে পাই কেউ মানবিকতার অজুহাতে দিয়ে অযোগ্যদের নিয়োগ দেয়। কোন ভিসি আবার দিনের ক্লাস নেন গভীর রাতে। কোন ভিসিকে আবার আন্দোলন করেও ক্যাম্পাসে আনা যায় না। কোন ভিসি আবার শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার মান নিয়ে না ভেবে চা সমুচ্চ নিয়ে গর্ব করেন। কেউ আবার শিক্ষার্থীদের ফকির মিসকিন বলে দুর্ব্যবহার করে। কোন ভিসিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ কী জিজেস করলে বহিক্ষার করে দেন। আরেক ভিসি পুকুর চুরি করে আবার শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে করেন মামলা। আবার শিক্ষক-শিক্ষার্থী সর্বোত্তমানের মাধ্যমেও কোনো ভিসিদের পদত্যাগ করানো যায় না। শিক্ষার্থীদের আমরণ অনশনেও টনক নড়ে না কারো। এমনকি শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক দাবি দাওয়ার আন্দোলনে শিক্ষার্থী প্রতি বিরোধীদলীয় ব্যবহার করা হয়।

সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যখন এই হাল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা সেখানে আরো করুণ। হাতেগোনা কয়েকটি ছাড়া এদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সার্বিক অবস্থা আরো বেহুল। এগুলো যেন উচ্চশিক্ষা বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এখানে পড়ালেখার নামে দেদারসে চলছে সনদ বিক্রি। অধিকাংশতে নেই গবেষণা, নেই ল্যাবরেটরি। লাইব্রেরী, পর্যাপ্ত ক্লাসরুম এমনকি পরিবহন ব্যবস্থাও নেই। আছে শুধু নানান ফাঁদে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ঢাকা আদায়ের চোখ ধাঁধানো কলাকোশল। আর এসব অর্থের পুরুর চুরি চলে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মোট আয়ের হিসাব দিলেও ব্যয়ের নির্দিষ্ট কোন হিসাব দেয়না ইউজিসির কাছে। এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, উপাচার্য শূন্য ২০ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। উপ-উপাচার্য নেই ৭৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের। বোর্ড অব ট্রাস্টিজের (বিওটি) সদস্যরা নিজেদের মতো করেই পরিচালনা করছেন এসব বিশ্ববিদ্যালয়। বোধ করি অর্থলোপাটের সুযোগ নিশ্চিতে ভিসি, প্রেভিসি নিয়োগ দিয়ে কর্তৃক কর্মাতে চায় না।

এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আরেকটি সীমাবদ্ধতা হলো এখানে মুক্ত চিন্তার স্বাধীনতা নেই। নেই বাক স্বাধীনতা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যেন কিম জং-উনের ভূমিকায় অবর্তীর্ণ আর শিক্ষার্থীরা প্রজা। তাই ইচ্ছে মতো নিয়ন্ত্রণ করেন বাক স্বাধীনতা। ফলে কেউ বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা উপাচার্যকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনা করলে আইনি পদক্ষেপ প্রহণের বিজ্ঞপ্তি দেয় এক বিশ্ববিদ্যালয়। 'বিভাগের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হতে পারে' এমন কিছু 'সামাজিক মাধ্যমে' না লেখার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয় আরেক বিশ্ববিদ্যালয়। ফেসবুকে মত প্রকাশ করায় এক ছাত্রীকে বহিক্ষার করে অন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আবার ফেসবুকে স্ট্যাটাসের জন্য নির্মমভাবে হত্যার শিকার হয় আবরারো। আপত্তিকর স্ট্যাটাসের অভিযোগে শিক্ষক-কর্মতারা-শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করে অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও ব্যক্তি স্বাধীনতায় আছে হস্তক্ষেপ। আর তাই আছে সাম্বন্ধ আইন। আছে বিবাহিতরা হলে না থাকতে পারার অভ্যন্তর নিয়ম।

কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, শিক্ষাব্যবস্থার দৈনন্দিনা, রাজনৈতিক আগ্রাসন, চিন্তা ও বাক স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে উচ্চ শিক্ষায় যে বার্তা দিচ্ছে তার খেসারত আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। বিশ্ববিদ্যালয় 'বিস্তৃত পাঠশালা'র চেয়ে বিসিএস ক্যাডার তৈরির কারখানায় পরিণত হয়েছে বেশি। এই মোহমায়া ধরতে তাই শিক্ষার্থীরা বিকিয়ে দিচ্ছে বাক স্বাধীনতা। ফলে অন্যান্য অবিচারে তারা রা করছে না। মুখে কুলুপ এঁটে সব দেখে যায় আর গুরুরে কাঁদে। অন্যদিকে নিজেকে সংক্ষার বা জ্ঞান অবেষণের পরিবর্তে ওরা এখন অমুক তমুকের নামে মিছিল-স্লোগান আর অভিনন্দনের জোয়ার বইতে মশগুল। আর তাই দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে খুনি হয়ে যায় গ্রামের স্বপ্নচারী সন্তানবানায় তরঙ্গ। হয় ধর্ষণের সেপ্টেম্বরিয়ান। কাটে মানুষের পায়ের রগ। যতই সময় যায় ততই নতুন নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি বা জ্ঞান চর্চায় আগ্রাহী শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমছে। তাই এখন ভালো ছাত্র মানে শীট মুখুষ্ট করা হাই সিজিপিএধারী, ভালো ছাত্র মানে কে কতগুলো চাকুরীর বই শেষ করেছে। এরূপ প্রতিযোগিতায় স্জনশীলতার অভাবে কর্মসংস্থান হচ্ছে না সৃষ্টিশীল ফার্মে। সুযোগ ও দক্ষতার অভাবে তৈরি হচ্ছে না কাঞ্জিত মানের উদ্যোগ্তা। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠছে উচ্চ সনদধারী বেকারদের কর্মসূল, নতুন বেকার তৈরির কারখানা। আর তাতে হতাশার আঁতুঁঘর হয়ে উঠেছে এসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাই আমরা দেখি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার মিছিল। প্রতিদিনই পাই এক এক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী আত্মহত্যার খবর। যদি চিন্তার স্বাধীনতা থাকতো, স্বাধীন মত প্রকাশ করতে পারতো, গবেষণার পর্যাপ্ত সুযোগ থাকতো তবে হয়তো অন্য রকম

হতে পারত এই দৃশ্য। শিক্ষার্থীদের দায়িবন্ধতার বোধ বাঢ়তো। সেসবের অনুপস্থিতি শিক্ষার্থীদের ঠেলে দিয়েছে অনুৎপাদনশীল কাজে। আর এতে করে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিযোগিতা পিছিয়ে থাকছি আমরা।

কিউএস র্যাক্সিংয়ের ভিত্তি হচ্ছে আটটি সূচক। সূচকগুলো হলো একাডেমিক খ্যাতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত, শিক্ষকপ্রতি গবেষণা-উদ্বৃত্তি, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী অনুপাত, আন্তর্জাতিক শিক্ষক অনুপাত, চাকরির বাজারে সুনাম, আন্তর্জাতিক গবেষণা নেটওয়ার্ক ও কর্মসংস্থান। এসব সূচকের আলোকে চিন্তা করলে দেখি আমাদের দেশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই নেই। একাডেমিক খ্যাতি নির্ধারিত হয় মূলত শিক্ষা ও গবেষণার মান নিয়ে। আর এ দুটোর কি অবস্থা তা আমরা সবাই জানি। বিশ্বব্যাপী উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর গড় অনুপাতের নূন্যতম মানদণ্ড ধরা হয় ১:২০। অর্থাৎ প্রতি ২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন করে শিক্ষক থাকতে হবে। অর্থাত গনমাধ্যমের তথ্য অনুসারে আমাদের সরকারি-বেসরকারি ৫৮টি বিশ্ববিদ্যালয়েই এই মানদণ্ড নেই। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাতে আন্তর্জাতিক মান নেই স্বয়ং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েরও। এক প্রতিবেদনে দেখা যায় রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৫৪। বেসরকারি ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৫০।

এদেশে রাজনীতি, স্বজনপ্রীতি বা টাকার বিনিময় প্রভাবে নিয়ে যোগ্যতার সর্বনিম্ন শর্তাবলীতে কিংবা শীট মুখ্যস্ত করে উচ্চ সিজিপি এ ধারণকারী শিক্ষার্থীরাই অধিকাংশ শিক্ষক নিয়ে পায়। এতে এসব শিক্ষকদের একদিকে শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়বন্ধতা থাকে কম অপরদিকে উচ্চতর ডিগ্রী গ্রহণেও থাকে আলসেমি। অনেকের গবেষণা উদ্দেশ্য থাকে আবার বেতন ক্ষেত্র বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা। ফলে আমরা দেখতে পাই সেসব গবেষণায় থাকে প্লেগারিজম। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী নেই বললেই চলে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুসংখ্যক আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী থাকলেও বাকি অনেক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হ্যাতো জানেই না যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী না থাকলে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা ছান হ্য। যদি র্যাক্সিংয়ে না থাকে, না থাকে যদি মানসম্মত শিক্ষা তাহলে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী আসবেই বা কিভাবে! আর আন্তর্জাতিক শিক্ষকও নেই। আন্তর্জাতিক শিক্ষক নিয়োগের কোন আগ্রহও নেই এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর। অন্যদিকে ইউজিসির বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০ এ আমরা দেখতে পাই ৩৫টি বিশ্ববিদ্যালয় ২০২০ সালে গবেষণা খাতে এক টাকাও ব্যয় করেনি। এক লাখ থেকে দশ লাখ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করেছে ৪৪টি বিশ্ববিদ্যালয়। একাধিক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে যারা বছরজুড়ে দু-চারটি প্রকাশনা ব্যক্তিত অন্য কোনো গবেষণা করেনি। আবার গবেষণায় খরচ করেও কোন প্রকাশনা বের করতে পারেনি ইবি, বেরোবি ও রাবিপ্রবি। সোয়া কোটির বেশি ব্যয় করে হাবিপ্রবির প্রকাশনা ছিলো ১টি। নোবিপ্রবি, যবিপ্রবি এবং ববি দুটি করে প্রকাশনা প্রকাশ করেছে। আর কর্মক্ষেত্রের দিকে নজর দিলে দেখা যায় দেশ সেরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স-মাস্টার্স শেষ করেও চাকরি হচ্ছেন। এমনকি চাকরির কোন নিশ্চয়তাও নেই। ৫ বছরের একাডেমিক পড়াশুনার ৫ ভাগও চাকরি পরীক্ষায় কাজে আসেন। শিক্ষার সাথে নেই কর্মক্ষেত্রের মিল।

এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তার স্বকীয়তায় বাঁচিয়ে রাখতে সরকার, রাজনীতি ও ইউজিসির সম্মিলিত সদিচ্ছার প্রয়োজন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন একজন রাজনীতিমুক্ত জ্ঞানতাপস, গবেষণাপ্রেমী, শিক্ষার্থী বান্ধব এবং নির্লোভী দক্ষ ভিসি। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে যেকোনো উপায়ে এটা করতে হবে। সার্ট কমিটির মাধ্যমেও এমন গুনাবলীসম্পন্ন মেধাবী ও যোগ্যদের খুঁজে নিয়ে দেয়া যায়। এমন ভিসি প্রয়োজন যিনি হবেন ভিশনারি। তিনি মোহে পড়ে পদ আঁকড়ে ধরে রাখবেন না। হবেন আত্মর্যাদাবান। বছর দুয়েক আগের ঘটনা। এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বসন্ত উৎসব পালিত হচ্ছিল। সেখানে বেশ কয়েকজন তরঙ্গ-তরণীর পিঠে ও বুকে আঁকা ছিল কিছু অশ্লীল শব্দ। বিশ্বয়টি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে শুরু হয় প্রবল সমালোচনা। পরে জানা যায় ওই তরঙ্গ-তরণীদের কেউই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নয়। তবুও এমন ঘটনার দায় নেন উপাচার্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি পরিপন্থী ঘটনার নেতৃত্বে নিয়ে তিনি পরদিনই পদত্যাগ করেন। উপাচার্যের পদত্যাগের কথা গল্পের মতো শুনালেও গল্প না। ঘটনাটি কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটেছিল। ভিসি সব্যসাচী বসু রায়চৌধুরী কোন আন্দোলন বা সমালোচনার কারণে সরে যাননি। শুধু নেতৃত্বে অনুভূতি থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। উনার মতো ভিসিরাই পারবেন এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তি নিশ্চিত করতে। অন্যথায় এভাবে চলতে থাকলে ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তি চাই’ বাক্যের মর্মার্থ বোঝার মতো শিক্ষার্থীও পাওয়া যাবে না।

লেখক:

সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক; বাংলাদেশ তরঙ্গ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

প্রকাশ তথ্যঃ

পত্রিকা: দৈনিক মানবজগীন।

তারিখ: ২৬ জুন ২০২২।



# বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও বাস্তবতা

## এম. রনি ইসলাম

পররাষ্ট্রনীতি বা কূটনৈতিক সম্পর্ক একটি রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ নীতির উপরই নির্ভর করে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সার্বভৌমত্ব তথা অঙ্গত্ব। কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনেই স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে গঠন করা হয় সরকার, যাকে প্রবাসী সরকার বলে অভিহিত করা হয়। এ প্রবাসী সরকারকেই অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সামাল দিতে হয়েছিল তৎকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতি। ঠিক তখন থেকেই সূচিত হয়েছিল বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি বা কূটনৈতিক সম্পর্ক। আর এ পররাষ্ট্রনীতি ছিল অত্যন্ত উদার।

এ পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্যে ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতকে সন্ত্রিশিত করা, বিশেষ পরাশক্তিগুলোকে বাংলাদেশের দাবির ঘোষিতকাবোধনো, সর্বপরিবিশ্বজনমত গঠন। কাজটি মাঝ্যুদ্ধের সময় খুব সহজ ছিল না। বিশেষ করে চীন-মার্কিন অঙ্গের পাকিস্তানপন্থী ভূমিকার কারণে। এর ভেতরই প্রবাসী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোস্তাক গংদের মার্কিন চক্রের সঙ্গে আঁতাত পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। শেষ পর্যন্ত প্রবাসী সরকারের পররাষ্ট্রনীতি সফল হয়। যার প্রমাণ স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে সরকারের দায়িত্ব নেন। শুরু হয় নতুন পথচলা, পুনর্গঠিত হয়।

সকলের সঙ্গে  
সঙ্গে বৈরিতা  
পররাষ্ট্রনীতিসহ  
ব স্বৃত সূল ভ  
কা র গে  
নি ব শ্ব  
প রি চি ত  
প া শা প া শি  
বিশ্বনেতাদের  
পররাষ্ট্রনীতিতে  
ছুটি বিষয়  
জন্য অত্যন্ত  
যার একটি  
আদায় ও  
অর্থনৈতিক



পররাষ্ট্রনীতি।  
বন্ধুত্ব, কারও  
নয়। এ উদার  
বিভিন্ন  
আচরণের  
বঙ্গ ব স্বৃ  
পরিমতলে  
হওয়ার  
হয়ে ওঠেন  
একজন।

ছিল তাঁর  
চ্যালেঞ্জ।  
ছিল স্বীকৃতি  
অন্যটি  
উন্নয়ন।

তৎকালীন অবস্থা এতটাই জটিল ছিল যে, বাংলাদেশের অঙ্গত্বের জন্য বিদেশি সাহায্য এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিহার্য। তাই, এ সময়ের কূটনীতিকে ‘স্বীকৃতি আদায়ের কূটনীতি’ বলা হয়। এ কূটনীতির সফলতা ছিল ঈশ্বরীয়। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ১১৬ টি রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। তখনই বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভে সক্ষম হয়। স্বীকৃতি জরুরি ছিল এজন্য যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় শুধু ভারত এবং ভূটানের স্বীকৃতি পাওয়া গিয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ব্রিটেনসহ মুসলিম দেশগুলোর স্বীকৃতি, স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের টিকে থাকার প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বীকৃতি ২৪ জানুয়ারি, ১৯৭২ এ প্রদত্ত হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা নীরব ছিল। সমাজতান্ত্রিক বিশেষ সাড়া মিলছিল ধীরে ধীরে। বিশেষ বৃহত্তম মুসলিম দেশ পাকিস্তান ভেঙে বেড়িয়ে আসায় মুসলিম দেশগুলো বাংলাদেশের প্রতি বিমুখ ছিল। অর্থনৈতিকভাবে যুদ্ধ বিশ্বস্ত বাংলাদেশের জন্য বিদেশি সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সাহায্য অর্জন সহজ ছিল না। যুদ্ধ বিশ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনের প্রয়োজনে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি আদায়ের কূটনীতির পাশাপাশি অর্থনৈতিক কূটনীতির পথও ধরতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদসহ অনেকে পুঁজিবাদী দেশগুলোর সাহায্য বা তাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক আদান-প্রদানে অনাগ্রহী ছিলেন। পুঁজি বিকাশে আকাঙ্ক্ষী, মধ্যবিত্ত প্রভাবিত দেশে তখন এ চিন্তা ছিল স্বিরোধী। ফলে বঙ্গবন্ধুকে তাঁর অবস্থান পরিস্কার করতে হয় পুঁজিবাদ বিকাশের পক্ষে। তাজউদ্দীন আহমেদ হারান তাঁর অর্থমন্ত্রীর পদ। বাংলাদেশ বাধ্য হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব এবং পুঁজিবাদী বিশেষ ভেতর একটা ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে। শুধু সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব বাংলাদেশের পুরো চাহিদা মেটানোর জন্য ছিল অপরাগ। তা সত্ত্বেও এ পক্ষ ত্যাগ সন্তুষ্ট ছিল না। অন্যদিকে পুঁজিবাদীরা ভারত-সোভিয়েত অঙ্গে বাংলাদেশের অবস্থানকে ভালো চোখে দেখেন। তাই অর্থনৈতিকভাবে বিদেশ নির্ভরতা কমানোর প্রয়াসও বিশেষ সফলতা পায়নি। ফলে অনিবার্যভাবে ১৯৭৪ সালে দ্রুতিক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়। বঙ্গবন্ধু সরকারের ভারত-সোভিয়েত অঙ্গের অধিকতর নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়টি পশ্চিমারা ভালভাবে নেয়নি। অন্যদিকে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে পশ্চিমাদের নিকটবর্তী হওয়ার প্রয়াসও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম দেশগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতেও চেষ্টা চলছিল ভালোভাবে। ওআইসি সম্মেলনে যোগদান, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের সঙ্গে আলোচনা, ‘৭৪ সালে ভূট্টার সঙ্গে বৈঠক প্রভৃতি এ প্রয়াসেরই অংশ। এখানেই লুকিয়ে ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রকৃত সংকট। অতঃপর ‘৭৫ এ নির্মম হত্যাকাণ্ডে বাংলাদেশকে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশকে যেমন ঘোর অঙ্গকারের দিকে ঠেলে

দেওয়া হয়, তেমনই পররাষ্ট্রনীতিতেও চরম ভাট্টা দেখা যায়।

ক্ষমতার পট পরিবর্তনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে বাংলাদেশের শাসনভাব হস্তগত হয়। খন্দকার মোশতাককে জনগণ গ্রহণ করেন। এরপর আসীন হন জেনারেল জিয়াউর রহমান। ভাট্টা পড়া পররাষ্ট্রনীতিতে গতির সঞ্চার হয়। জাপানকে হারিয়ে বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়। বিদেশি সাহায্য, ঝাঁঁ, বিনিয়োগ সম্মতজনকভাবে পাওয়া সম্ভব হয়। তবে জিয়া সরকারের পররাষ্ট্রনীতি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বঙ্গবন্ধু সরকারের পররাষ্ট্র নীতি থেকে ভিন্ন হলেও অর্থনৈতিক কূটনীতির মূলসূর ছিল এক ও অভিন্ন। অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই বঙ্গবন্ধু পশ্চিমের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন, আর এক্ষেত্রে জিয়াউর রহমান ছিলেন পুরোপুরি সফল। বেশ ভালোভাবেই চলছিলো! কিন্তু আবারও সামরিক হ্যাকান্ড, ক্ষমতার পালাবদল। বিচারপতি আবুস সাত্তার ক্ষমতায় আসীন হলেও তা বেশিদিন টিকেন। ক্ষমতা গ্রহণ করে সামরিক শাসক হসেইন মুহম্মদ এরশাদ। এরশাদের শাসনামলের প্রকৃত অর্থে নিজস্ব কোন পররাষ্ট্র নীতি ছিল না। জিয়া সরকারের নীতিকেই তিনি অনুসরণ করেন। তবে এক্ষেত্রে তাঁর সফলতা ছিল। সেই সময়ই তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতিত্ব করেন। ঢাকায় ওআইসি সম্মেলন আয়োজন করেন। ১৯৮৫ সালের সার্ক সম্মেলনও আয়োজন করে বাংলাদেশ। তরুণ বৈশ্বিক ভাবমূর্তিতে বাংলাদেশের ইতিবাচক কোন দিক ছিল না। ‘৯০ এ স্বৈরশাসনের অবসান ও ৯১ এর নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ নতুন করে বৈশ্বিক ভাবমূর্তি সংগঠিত করার সুযোগ পায়।

‘৯১ সালে নির্বাচিত হয়ে বিএনপি খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে। খালেদা জিয়া সরকার গঠনের পর জিয়া অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির দিকে ঝুঁকে যান। তবে খালেদা জিয়ার সরকারের সঙ্গে জিয়া সরকারের পররাষ্ট্রনীতির একটি মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়, আর তা হলো ভারতের সঙ্গে সৌহার্দ্যের নীতি গুরুত্বের সঙ্গে অনুসরণ করেন। কিন্তু নীতির সফলতা প্রশ়াত্তীত নয়। প্রধান বিরোধী বিষয় নিষ্পত্তিতে তারা বিশেষ সফলতা লাভ করতে পারেনি। যদিও অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি হয়েছিল। মুসলিম দেশ ও পশ্চিমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার চেষ্টা তখনও অব্যাহত ছিল। কারণটি মুখ্যত অর্থনৈতিক। বেগম জিয়ার সরকার তাঁর শাসনামলের দু'টি স্পষ্ট চ্যালেঞ্জের সামনে পড়েছিলেন। একটি ফারাক্কা, অপরটি মায়ানমার সংক্রান্ত। ফারাক্কা বিষয়ে জাতিসংঘ পর্যন্ত দেন-দরবার করেও সম্পর্কের বরফ গলাতে পারেনি। আর রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে মায়ানমারের সাথে যুদ্ধাবস্থার উভ্যে হয়েছিল। বেশ কাঠখড় পোড়ানোর পর মায়ানমারের সাথে চুক্তি হয় এবং রোহিঙ্গাদের ফেরত নিয়ে পুনর্বাসন শুরু করার কথা বলেও তা ছিল কচ্ছপের গতির মতো। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সামরিক শাসনামলের নষ্ট হওয়া ভাবমূর্তি অনেকটা পুনরুদ্ধার হলেও স্মরণীয় কোন সাফল্য যোগ হয়নি।

‘৯৬ সালে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত হয় সরকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পূর্বের পররাষ্ট্রনীতি পুরোটা বাতিল করেননি। তাঁর সরকার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষাসহ বিভিন্ন নীতির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলে। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উৎস্থত হয়। কারও মতে, বঙ্গবন্ধুর সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর পিতার পররাষ্ট্রনীতি গুলোকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের সাথে সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর সময়কার মতো সংকট সৃষ্টি হয়নি। এককেন্দ্রিক বিশ্বে অনেকটা সফলভাবে ‘৯৬ এর সরকার পাশ্চাত্য যেঁষা নীতি অনুসরণ করেছে। ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সমস্যাগুলোর অনেকটাই সুরাহা হয় তখন। ফারাক্কা সমাধানে ৩০ বছর মেয়াদি পানি চুক্তি হয়। যদিও চুক্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে সমালোচনা ছিল, তথাপি এটি নিশ্চয়ই বড় অগ্রগতি। ‘৯৭ সালে বিতর্কিত ২৫ সাল মেয়াদি ‘□□□□ □□□□-□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□’ বা ‘ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তি’র মেয়াদ শেষ হলে তখন ভারতের সঙ্গে ঐ চুক্তি নবায়ন করার উদ্যোগ নেয়নি, বিষয়টি সময়েচিত ও নদিত হলেও ব্যর্থতাও ছিল। তবে কমনওয়েলথ মহাসচিব পদে বাংলাদেশের প্রার্থীর ভরাডুবি প্রচুর সমালোচনার খোরাক জুগিয়েছিল। অর্থনৈতিক পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করলেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন চোখে পড়ার মতো ছিল না তখন। বলা যায় ক্ষেত্রটি গতানুগতিক ধারায় চলেছে কেবল।

২০০১ এর নির্বাচনে আবারও বিএনপি ক্ষমতায় আসে। বাংলাদেশের বৃহৎ শ্রমবাজার মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করতে চেষ্টা করে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসী শ্রমিকদের অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে বিএনপি সরকার প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় গঠন করে এবং বিদেশে বাংলাদেশের দ্রুতাবাস সমূহ যাতে প্রবাসীদের কল্যাণে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করে, তার নিশ্চয়তা বিধানের প্রচেষ্টাও নেয়া হয়। কিন্তু ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা, ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট ৬৩ জেলায় একযোগে বোমা বিস্ফোরণ, বাঙালির সংস্কৃতি ১লা বৈশাখে রমনার বটমূলে বোমা হামলা, কুখ্যাত জেএমবি নেতা বাংলা ভাই এর উত্থান এবং ১০ ট্রাক অন্তর উন্দারের ঘটনায় বাংলাদেশকে একটি জঙ্গি রাষ্ট্র মনে করে বিদেশি রাষ্ট্রগুলো। বিএনপি সরকারের আমলে বড় ধরনের বিনিয়োগের সুযোগ এসেছিল। ভারতের বহুজাতিক কোম্পানি টাটা, জিন্দাল, এসআর, মিত্রাল, যুক্তরাজ্যের কিংডম, যুক্তরাষ্ট্রের ইষ্ট ইণ্ডিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, চীনের কয়েকটি কোম্পানি এবং সৌদি যুবরাজ প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতা আর সরকারের সিদ্ধান্তহীনতায় তা বাস্তবায়িত হয়নি। সুতরাং কিছু সফলতা থাকলেও রাজনৈতিক অস্থিরতায় ভাট্টা পড়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং বিনিয়োগ হারায় বাংলাদেশ।

এক-এগারোর রেশ কাটিয়ে ২০০৮ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে ২য় বারের মতো ক্ষমতায় আসে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার। চেষ্টা চলে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে। কিন্তু ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের উপর পাওয়া শুক্রমুক্ত সুবিধা(জিএসটি) ২০১৩ সালে বারাক ওবামার এক আদেশে স্থগিত হয়ে যায়। বাংলাদেশের বৃহৎ শ্রমবাজার হলো মধ্যপ্রাচ্য। এ রাষ্ট্রগুলো মুসলিম। যুদ্ধাপরাধের দায়ে ইসলামি দল তথা জামায়াত ইসলামের শীর্ষ নেতাদের সাজা হওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে সম্পর্কের শীতলতা তৈরি হয়। যার প্রমাণ বিগত কয়েকবছরে মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমিক রণ্ধনি হ্রাসের পরিসংখ্যান।

২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সহিংসতা ও রাজনৈতিক অঙ্গুলোও ছিল চরমে। পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন দেশের উদেগ জানা যায় দৈনিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে। বিদেশি বিনিয়োগ আবারও কমে যায়। এই হ্রাসকৃত বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ চার দশমিক পাঁচ শতাংশ। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল সবচেয়ে ভালো। যদিও কিছু কিছু বিষয়ে জনগণের অসন্তোষ ছিল। ভারত আমাদের পাশে না থাকলে স্বাধীনতা যুদ্ধ যেভাবে শেষ হয়েছে, হয়তো সেভাবে শেষ হতো না কিন্তু তার পরিবর্তে যদি বাংলাদেশকে নিজেদের বাজারের জায়গা করে নেয় তাহল তা আমাদের জন্য সত্যিই হতাশাজনক।

‘৯৬ সালে দুই দেশের মধ্যে গঙ্গার পানি ভাগভাগির একটা চুক্তি হয়, যাতে বাংলাদেশের শুকিয়ে যাওয়া পদ্মা তার প্রয়োজনীয় পানি প্রবাহ ফিরে পাবে বলে আশা করা হয়েছিল। ২৩ বছর পেরিয়ে গেলেও বাস্তবে শীর্ণ পদ্মা আর আগের মত প্রমত্তা ফিরে পায়নি। সরকারি লোকজনই মাপ-জোখ করে বলেন, ‘চুক্তি অনুযায়ী পানি পায়নি বাংলাদেশা’

পানি নিয়ে বাংলাদেশের অপর এক দুশ্চিন্তার নাম তিস্তা, ভারতের জলপাইগুড়িতে ব্যারাজ বানিয়ে অপরিমিতভাবে পানি প্রত্যাহার করে নেয়ায় কমে গেছে বাংলাদেশের তিস্তার পানি প্রবাহ বর্ষাকালে এই অঞ্চলের মানুষের প্রধান দুঃখ উজান থেকে ছেড়ে দেয়া তিস্তার পানি, আবার শুকনা মৌসুমেও তাদের দুঃখের নাম একটিই-তিস্তা, তবে সেটি পানিহীন তিস্তা। বেশ কয়েকবার এই বিষয়টি নিয়ে ভারত সরকারের সাথে বাংলাদেশের আলোচনা হয়েছে, কিন্তু সবাই জানে পশ্চিমবঙ্গের মূখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনীহায় এখনো তিস্তার পানি বন্টন নিয়ে কোন চুক্তি করা সম্ভব হয়নি। দুই দেশের মধ্যে স্থল ও সমুদ্রসীমা নির্ধারণ এবং ছিটমহল বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে ভারতকে পাশে পায়নি বাংলাদেশ। বাংলাদেশের গলার কাঁটা এই রোহিঙ্গা সংকট এই সংকট সমাধানে বড় লোক প্রতিবেশি ভারতের কোনো আন্তরিক উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না, বরং আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশ যেমন আশা করেছিল তেমন জোরালো কোন ভূমিকাই রাখেনি ভারত। উল্টো, চলতি বছরের শুরুর দিকে ভারত তাদের দেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে ঠেলে দিয়ে সংকট আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে।

এছাড়াও সীমান্তে বেসামরিক নাগরিক হত্যার ঘটনা বাংলাদেশের জন্য একটি উদ্দেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত ১০ বছরে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বিএসএফের হাতে মোট ২৯৪ জন বাংলাদেশি নিহত হয়েছে। কূটনৈতিক সম্পর্কে হৃদ্যতাপূর্ণ মনে করা হলেও ভারতের আচরণে তা মনে হয়নি। বেকার সমস্যার বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ লাখ ভারতীয় নাগরিক চাকরি করছে বলে বিভিন্ন মাধ্যমে জানা যায়। আরও জানা যায়, ২০১৭ সালে ভারতীয়রা বাংলাদেশ থেকে ১০ বিলিয়ন ডলার নিয়ে গেছে। প্রথম যে রেমিটেন্সের উৎস সংযুক্ত আরব আমিরাত স্টোও বাংলাদেশ থেকে নেয়া রেমিটেন্সের তুলনায় ২০ শতাংশ বেশি। এসব আমাদের জন্য দুঃখজনক। বাংলাদেশের জনমানুষের মনে একটু একটু করে ভারতের কর্তৃত্বাদি, সুবিধাবাদি বড় ভাই সুলভ যে ইমেজ গড়ে উঠেছে তার পরিবর্তন করতে হলে প্রয়োজন সমূলত পররাষ্ট্রনীতি। ভারতের একক সিদ্ধান্তের ফলে প্রত্যক্ষভাবে গণমানুষ যেসব সমস্যা ভোগ করছে তা দূর করতে হবে হিসাব নিকাশ হতে হবে ন্যায্যতার ভিত্তিতে, সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে, আন্তরিকতার সঙ্গে স্বাধীনতা যুক্তে সহায়তার অজুহাতে যেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ভারতের কাছে ফেলনায় পরিণত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে বাংলাদেশ সরকারকে।

রাজনৈতিক নানা চড়াই-উত্তরাই সত্ত্বেও বিগত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ এগিয়েছে অনেক, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই রয়েছে উল্লেখযোগ্য সফলতা। কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে প্রায় সকল রাষ্ট্রের সাথে। নিজস্ব সক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বৈদেশিক রীতিনীতি হতে হবে সুষম। অসম পররাষ্ট্রনীতি শুধু স্বাধীন দেশের জন্যই যে মন্দ তা নয়, বরং তা জনমনেও তৈরি করে তীব্র অসন্তোষ।

সুতরাং দারিদ্র্য পীড়িত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যেমন কূটনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি ও সুন্দর হওয়া প্রয়োজন, তেমনই একটি রাষ্ট্রের স্বকীয়তা ও নাগরিকদের সুবিধা বিবেচনায় স্বীয় সম্পত্তি, অধিকার ও অস্তিত্ব রক্ষায় তারচেয়েও বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

প্রকাশ তথ্যঃ  
পত্রিকাঃ দৈনিক খোলাকাগজ  
তারিখঃ ২৭ অক্টোবর ২০২১।



# আজকে আমার মন ভালো নেই

## মো. নাজমুচ্ছকিব

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটা কথা ঘুরতেছে আর সেটা হচ্ছে আজকে আমার মন ভালো নেই। আমাদের দেশে একটা প্রচলন হয়েছে আর তা হচ্ছে সামান্য বিষয় পেলেও সেটা নিয়ে ট্রল করা। সেই স্বাভাবিকতা থেকেও এই ট্রল চলে আসলেও এখানে আমাদের ভাবার বিষয় রয়েছে। আমরা হয়তো মজা করে পোষ্ট দিচ্ছি আমার মন ভালো নেই কিন্তু বাস্তবেই কি আমার মন ভালো আছে?

একটা গবেষণা বলছে, বাংলাদেশের ১৮ - ৩০ বছর বয়সী যুবক ও যুবতি কোন না কোন ভাবে ডিপ্রেশনে আক্রান্ত। কারোর এই মাত্রা সহের ভিতরে। আর কারোর সহের বাহিরে। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিউটের এক হিসাব বলছে, সবশেষ ২০১৮ সালে তাদের যে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে সে অনুযায়ী, বাংলাদেশে ১৮.৫ শতাংশ প্রাঞ্চবয়স্ক এবং প্রায় ১৩ শতাংশ শিশু-কিশোরদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে। কিন্তু এদের মধ্যে ৯২ শতাংশ মানুষই কোন ধরনের সেবা বা পরামর্শ নেন না। বাকি মাত্র ৮ শতাংশ মানুষ মূল ধারার চিকিৎসা নিচ্ছেন। আর সেখানে শুধু মানসিক রোগের চিকিৎসক নন বরং অন্যান্য চিকিৎসকও রয়েছেন। আর যারা চিকিৎসা নিতে যান তারাও সমস্যা দেখা দেয়ার প্রথম দিকে নয় বরং একেবারে শেষ মুহূর্তে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ব্রিটিশ গণ

বাংলাতে আমরা  
উল্লেখ দেখতে  
বলা হয়েছে,  
সন্তানের মা  
বরাবরই প্রচণ্ড  
আর চাপা  
তবে হঠাত  
সালে একবার  
করে বসেন  
ও তা র ব্রিজে  
ঝাঁপ দেবো  
নাসরুন্নাহার  
ঘটনার আগে  
মানুষ জন ও



মাধ্যম বিবিসি  
একটা ঘটনার  
পায় যেখানে  
বর্তমানে এক  
নাসরুন নাহার।  
আত্মনির্ভরশীল  
স্বভাবের মানুষ।  
করেই ২০১৭  
আত্মহত্যার চেষ্টা  
তিনি। ‘আমি  
দাঁড়িয়েছিলাম  
বলে’  
বলেন, এই  
তার কাছের  
বুরাতে পারেননি

যে, তিনি বিষণ্ণতার মতো মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। “কাছের মানুষ এমনকি আমার বেষ্ট ফ্রেন্ডোও জানতো না” জানালার কাঁচ ভেঙে সেটি দিয়ে হাতের রগ কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। তিনি বলেন, “যেদিন সুইসাইড অ্যাটেম্প্ট করি তার আগের দিনও আমি কাজিনদের সাথে ট্যুর দিয়ে আসি।” নাসরুন নাহার বলেন, একেবারে শেষ স্তরে পৌঁছানোর পর যখন তিনি আত্মহত্যা প্রবণ হয়ে উঠেন তখন তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়। এরকম ঘটনা আমাদের দেশে প্রতিনিয়ত ঘটতেই আছে। তাহলে যদি আমাদের মন ভালোই থাকবে তাহলে এমন কেন হবে?

গবেষকদের মতে, সামাজিক ভাবে হেনস্ট্রা অপমানিত হওয়ার ভয়েই অধিকাংশ মানুষ মানসিক সমস্যা গুলো লুকিয়ে রাখেন। তারা এসকল বিষয় প্রকাশ করতে চান না। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিউটের সহযোগী অধ্যাপক হেলাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, তিনি ধরনের কারণে মানুষ মানসিক সমস্যার চিকিৎসা নিতে যায় না। এর মধ্যে প্রথম কারণ হিসেবে, সমাজের প্রচলিত স্থিগমাকে দায়ী করেন। মানসিক সমস্যা নিয়ে সমাজে এক ধরনের কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে বলে মনে করেন তিনি। মানুষ এটাকে প্রকাশ করতে চায় না, লুকিয়ে রাখতে চায়। মানুষ মনে করে যে, মানসিক সমস্যা রয়েছে এটা প্রকাশিত হলে তারা সমাজের চোখে হেয় হয়ে যাবেন। “এ নিয়ে এক ধরনের স্থিগমা তাদের মধ্যে কাজ করে।” দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, মানসিক স্বাস্থ্য সেবার অপ্রতুলতা রয়েছে। মেডিকেল কলেজ কিংবা টারশিয়ারি পর্যায় ছাড়া আর কোথাও এই সেবা পাওয়া যায় না। বিশেষায়িত হাসপাতাল রয়েছে মাত্র দুটি। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিউটের হিসাবে দেশে ১৮ কোটি মানুষের জন্য এই মুহূর্তে ২৭০ জন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছে। আর কাউন্সেলিংয়ের জন্য সাইকোলজিস্ট রয়েছেন মাত্র ২৫০ জন। যেটা অপ্রতুল। এক বছরে সাত থেকে ১০ জনের বেশি মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ প্রস্তুত হচ্ছে না। যার কারণে অনেকেই এই সেবা নেয়ার সুযোগ পাচ্ছে না বলে মনে করেন। তৃতীয় কারণ মানুষের সাধারণ অসচেতনতাকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, “অনেক সময় মানুষ বোবেই না যে, তার আচরণগত সমস্যাটি মানসিক কারণে হয়েছে।” বিপুল পরিমাণ মানুষ মানসিক স্বাস্থ্য সেবার বাইরে থাকায় পরিস্থিতি আরো খারাপ হচ্ছে এবং তারা এক পর্যায়ে সমাজের বোর্ডায় পরিগত হচ্ছে।

মানসিক ভারসাম্যতা হারানোর জন্য আমাদের দেশে আত্মহত্যা প্রবণতা বেড়ে গিয়েছে। আসলে আমাদের দেশে শারীরিক অসুস্থতাকে যতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় মানসিক সমস্যাকে তার চার ভাগের এক ভাগ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। আমার জানা মতে খুব কম বাবা মা আছেন যারা তার সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখছেন বা তার চাওয়া পাওয়া মনের কথা গুলো শুনছেন। বরং অধিকাংশ

বাবা মা নিজেদের সিদ্ধান্ত জোর করে সন্তানদের উপর চাপিয়ে দিয়ে থাকেন। এইভাবে মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হতে একদিন সে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। এই মানসিক নির্যাতন বক্ষের জন্য বাংলাদেশ সরকার আইন তৈরি করেছেন কিন্তু সেই আইনের বাস্তবিক ব্যবহার কর্তৃকু আছে সেটাও ভেবে দেখার বিষয় ছিল। কাগজে-কলমে এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে আমরা একবিংশ শতাব্দীর বাসিন্দা। কিন্তু মানসিকতা দেখলে মনে হয়, অদিম যুগের মানুষও আমাদের অনেকের চেয়ে সব্য ছিল। একটি ছেলে আর একটি মেয়ের মধ্যকার সম্পর্ক কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেলে আমরা প্রায়ই দেখি, ছেলেটি মেয়েটিকে হমকি দিচ্ছে, ভয়ভীতি দেখাচ্ছে, হয়রানি করছে। কিন্তু কেন করে এমন আচরণ? এই হমকি, হয়রানির পর একজন কি সত্যি আরেকজনের কাছে ফিরে যেতে পারে? সম্পর্কও কি সত্যি আগের মতো হয়ে যায়? সেটা হয় না। যা হয় তা হলো, পরিবেশ নোরা হয়, কাদ-ছাড়ান্তি হয়। একপর্যায়ে হয়তো কোনো এক পক্ষ আত্মহত্যা করে, নয়তো আইনের মাধ্যমে শাস্তির আওতায় আসে। ২০১০ সালের পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইনে মানসিক নির্যাতনের সংজ্ঞা দেওয়া আছে। এতে পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে- এমন কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে পরিবারের অন্য কোনো নারী বা শিশু সদস্য শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন অথবা আর্থিক ক্ষতির শিকার হলে একে পারিবারিক সহিংসতা বোঝানো হয়েছে। মৌখিক নির্যাতন, অপমান, অবজ্ঞা, ভয় দেখানো বা এমন কোনো উক্তি করা, যার মাধ্যমে সংক্ষুর ব্যক্তি মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাকে মানসিক সহিংসতা অর্থে বোঝানো হয়েছে। এছাড়া হয়রানি, ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, অর্থাৎ স্বাভাবিক চলাচল, যোগাযোগ বা ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা মতামত প্রকাশে বাধা দেওয়া, চাকরি করতে বাধা দেওয়া, বাইরের মানুষের সামনে কথা শোনানো, পুরুষতাত্ত্বিক আচরণ দিয়ে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা, সন্দেহ করা এগুলোও নির্যাতনের আওতাভুক্ত। এ আইনে সংক্ষুর ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, স্থাবর বা অঙ্গাবর সম্পত্তির ক্ষতি হলে বা ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে আদালতের কাছে ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করার বিধান রাখা হয়েছে। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ আইনে মানসিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে মামলাও করা যায়; কিন্তু মামলা করার হার মাত্র ৩ শতাংশ। মহামান্য হাইকোর্ট বলছে, গত এক দশক আগে আইনটি তৈরি হলেও অদ্যাবধি পর্যন্ত এ আইনের কোন মামলায় নিম্ন-আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে কেউই আসেনি। ফলে এ মামলার বিষয়ে উচ্চতর আদালতের কোন সিদ্ধান্তই প্রকাশিত হয়নি। মানসিক নির্যাতনের শিকার নারীদের এ আইনটি সম্পর্কে জানার ঘাটতি রয়েছে। পাশাপাশি আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে নির্যাতিত নারীর নিরাপত্তাও দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন আদালত। একজন নারী যখন স্বামী কিংবা শুশুর-শাঙ্গড়ির বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করছেন আবার একসাথে এক বাড়িতে থেকে সংসারও করতে চাচ্ছেন- তা রীতিমতো সাংস্কৰিক। সেই সঙ্গে সহিংসতার শিকার নারীর পুনর্বাসন, সামাজিক সহায়তা, পৃষ্ঠপোষকতা সম্পর্কিত বিষয় আইনে সুস্পষ্ট নয়। আবার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেই স্বামী তালাক দিয়ে দিচ্ছে। এ আইনে মামলার ক্ষেত্রে কোনভাবেই তালাক প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না। একজন নারী যখন পিতা-মাতা কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়ে এ আইনের অধীন আদালতে মামলা করছেন, তখন মাননীয় আদালত অভিযোগটি মোটেই সহজভাবে নিছেন না। স্বামী কিংবা শুশুরবাড়ির লোকজন কর্তৃক নির্যাতিত নারীর মালামাল, সোনা-দানা ব্যবহার্য আসবাপত্র আটকে রাখলে এ আইনের অধীন মামলা করে তা উদ্ধার করা যাবে। ১৫(১) এর উপধারা ৭-এ মালামাল উদ্ধারের কথা বলা থাকলেও জন্মকৃত মালামাল প্রাথমিক অবস্থায় কোথায় রাখা হবে- সে বিষয়ে আইনে কিছুই বলা হয়নি। ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বলে থাকেন মালামাল রাখার জায়গা নেই। অনুরূপভাবে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত থানা পুলিশ বলে থাকেন তাদের মালখানায় জায়গা নেই। এ আইনটি ফৌজদারি আদালতের এখতিয়ার হলেও এটি দেওয়ানী প্রকৃতির আইন। আইনে বলা হয়েছে- নির্যাতিতের অভিযোগ প্রাণ্তির পর মাননীয় আদালত ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে শুনানির ব্যবস্থা করবেন এবং ৩ (তিনি) দিনের মধ্যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সমন জারির বিশেষ ব্যবস্থা করবেন। সেই সাথে ভিকটিমকে সুরক্ষা প্রদানের আদেশ বিষয়ে শোকজ করবেন। এ আইনের ১৪ ধারা অনুযায়ী, বিজ্ঞ আদালত চাইলে সাথে সাথে ভিকটিমকে সুরক্ষার আদেশ বা ভিকটিমকে নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আবার এ আইনের ১৫ ধারায় বলা হয়েছে, প্রয়োজনে আদালত ভিকটিমকে নিরাপদে থাকতে প্রতিপক্ষকে ভিকটিমের আবাসস্থলে যেতে নিষেধাজ্ঞা পর্যন্ত দিতে পারেন। সেইসাথে ১৬ ধারা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসার খরচ পর্যন্ত দিতে প্রতিপক্ষকে আদেশ দিতে পারেন।

আমাদের মানসিক সমস্যা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। নিজেকে মানসিক ভাবে ফিট করে তুলতে হবে। আর কোন সমস্যা হলে সেটা শেয়ার করতে হবে। তবেই সেটার সমাধান পাওয়া যাবে। আসলেই আমরা যদিও ফেসবুকে পোষ্ট করে মজা নিচ্ছি কিন্তু বাস্তবেই আমাদের কারোর মন ভালো নেই। তাই পরিশেষে আবার বলব, ভাইয়া! আজকে আমার মন ভালো নেই।

লেখকঃ কবি ও কলামিস্ট

প্রকাশ তথ্যঃ

পত্রিকাঃ দৈনিক বাংলাদেশের খবর।

তারিখঃ ২৮ জুন ২০২২।



# স্বাস্থ্য ও যোগ্যতায় পিছিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের শিশুরা

## সবুজ আহমেদ

আজকের শিশুরাই আগামি দিনে জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ, দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তারাই একদিন বড় হয়ে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেবে, তারাই জন্ম দেবে এক একটা গৌরবময়, ঐতিহ্যপূর্ণ সোনালী অধ্যায়। আর এই সন্তানাময় আগামির প্রজন্মের বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত আনন্দঘন পরিবেশ, যেখানে প্রত্যেক শিশুরা পাবে নিজেকে তৈরি করার যথেষ্ট সুযোগ ও অনুকূল আবহাওয়া। তবে বর্তমান সময়ের আমাদের সমাজে চলমান পারিপার্শ্বিক দূরাবস্থা, অসুস্থ সংস্কৃতি, আর পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাবে প্রতিনিয়তই শিশু, স্বাস্থ্য ও মেধায় পিছিয়ে যাচ্ছে আমাদের শিশুরা। ছাট-বড় বিভিন্ন পারিবারিক কিংবা সামাজিক জটিলতায় একটু একটু করে অস্তিত্ব হয়ে যাচ্ছে আমাদের আশার আলো, নানান জটিলতায় বাধাগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের শিশুদের পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশ। প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা আর উপযুক্ত পরিবেশের সুষ্ঠ ব্যবহার করে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শিশুরা শিশু, স্বাস্থ্য, মেধা এবং যোগ্যতায় এগিয়ে যাচ্ছে তরতর করে। বিপরীতে অপসংস্কৃতি, প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা আর সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবে শিশু, স্বাস্থ্য ও মেধায় দিনের পর দিন পিছিয়েই যাচ্ছে আমাদের দেশের শিশুরা।

উপযুক্ত পরিচর্যা এবং সঠিক পরিবেশের অভাবে ক্ষণে ক্ষণেই পথভ্রষ্ট হচ্ছে আমাদের সন্তানেরা। অপূর্ণ মানসিক বিকাশের কুপ্রভাবে আমাদের শিশুরা প্রায়শই জড়িয়ে যাচ্ছে অগ্রহণযোগ্য ভয়ঙ্কর অপরাধে, ক্রমেই বেড়ে চলেছে তাদের অসহিষ্ণুতা। খেলাধুলার বয়সে প্রয়োজনীয় মাঠ সংকট আর শৈশব-কৈশোরের স্বত্বাবজাত খেলাধুলায় মেতে উঠতে না পারার দুর্ভোগে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে আমাদের কোমলমতি শিশু-কিশোররা। ফলাফলে, প্রতিনিয়তই তাদের সঙ্গী হচ্ছে, হতাশা, বিষন্নতা ও অবসাদ। আমাদের দেশের শহরগুলোতে শিশুদের জন্য খেলার মাঠ ও খোলা জায়গার যথেষ্ট অভাব রয়েছে, যেটুকু আছে তাও কারো না কারো দখলে, দূষণে কিংবা কখনও আবার সেটা থাকে পরিত্যক্ত। মনোবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও নগরবিদরা বলছেন, খেলাধুলা ও নির্মল বিনোদন ছাড়া কোনোভাবেই শিশুদের সুস্থ মানসিক বিকাশ সম্ভব নয়।

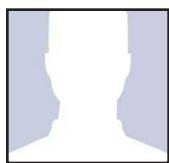
খেলাধুলা, সুস্বাস্থ্য এবং যথোপযুক্ত পরিবেশের অভাবে আমাদের শিশুরা আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ৫-১০ বছর বয়সী প্রতিটি শিশুর জন্য দিনে অন্তত ১ ঘণ্টা ধরের বাহিরে খেলাধুলা করার পরামর্শ দিয়েছে। আর্থ পড়াশোনার চাপ, কোচিংয়ের পড়া, স্মার্টফোনের প্রতি মাত্রাত্তিরিক্ত আসক্তির মত বিচ্ছিন্ন কারণে দেশের প্রতিটি শিশুই খেলাধুলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। চাপ্টল্যকর এক তথ্যে ওঠে এসেছে যে; খেলার মাঠে গিয়ে খেলার সুযোগ পায় ঢাকা শহরের মাত্র ২ শতাংশ শিশু। যার ফলে সেখানকার ২০ শতাংশ কিশোর এবং ২৯ শতাংশ কিশোরীর মধ্যে প্রায়শই দেখা মিলে হতাশার লক্ষণ। দেশীয় সংস্কৃতি এবং নানা কুসংস্কারে খেলাধুলার সুযোগ থেকে সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত হচ্ছে মেয়েশিশুরা। সারাদিনের একটানা ক্লাস, সন্ধার কোচিং আর রাতে বাসায় এসে পড়িয়ে যাওয়া শিক্ষকের পড়া প্রস্তুত করার পছাড়সম চাঁপে আমাদের শিশু-কিশোরেরা মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। ফলে হতাশা, বিষণ্ণতা গ্রাস করে নিজে তাদের নাবালক মস্তিষ্ক। দীর্ঘ দিনের এই একধূয়েমি রুটিনে একটু একটু করে তাদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে অসহিষ্ণু মনোভাব।

শিশুর মন হলো মুক্ত বিহঙ্গের মতো, কোনো কিছুতেই বাঁধ মানতে চায় না। তারা নীড় বাঁধতে চায় সুদূর ঐ নীল আকাশে, দীপ্ত প্রত্যয়ে এগিয়ে যেতে চায় নতুন সন্তুষ্ণার দিকে। শিশুদের শেখার ধরন অনুযায়ী তাদেরকে সুশিক্ষা প্রদান করা গেলে এই শিশুরাই একদিন পরমাণু বিজ্ঞানী, বিচক্ষণ চিকিৎসক, কালজয়ী বিশেষজ্ঞ হবে। ভৌতিকীয় মুক্ত পরিবেশের মাঝেই শিশুরা শিখতে চায়। কঠোর শাসন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিকূল পরিবেশ শিশুদের শিক্ষা জীবনকে ঠেলে দেয় অনিশ্চয়তার পথে। মনের আনন্দই শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তির মূল উৎস। আর এই আনন্দঘন ও শিশুবন্ধব পরিবেশ ছাড়া শিশুর সুষ্ঠ প্রতিভার বিকাশ ঘটানো সত্যিই অসম্ভব।

প্রতিটি শিশুই অত্যন্ত স্বজনশীল। স্বজনশীলতা হলো নিজের মতো করে নতুন কিছু করা, সবার চেয়ে আলাদা কিছু করা। শিশুদের ভেতর এই স্বজনশীলতা স্বাভাবিকভাবেই সুপ্তাবস্থায় থাকে। তাদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করে দেওয়ার মাধ্যমে শিশুর ভেতর এই লুকানো প্রতিভাকে বের করে আনা প্রতিটি অভিভাবকেরই একান্ত দায়িত্ব। আমাদের অসচেতনতা, অনপোযুক্ত পরিবেশ ও আনন্দহীন শিক্ষার ব্যাপক নেতৃত্বাচক প্রভাব রয়েছে আমাদের শিশুদের জীবনে। সুশিক্ষা প্রদান করার মাধ্যমে আমাদেরকে শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ এবং আদর্শ নাগরিক হিসেবে ভবিষ্যৎ সময়ের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। আমাদের দায়িত্বশীল আচরণেই সাফল্যের আলোকে উদ্ভাসিত হতে পারে হাজারও শিশুর জীবন। শিশুদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ প্রস্তুত করা দেওয়া গেলে আজকের এক একটা শিশু আগামী দিনে জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদে পরিণত হবে।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকাশ তথ্যঃ  
পত্রিকাঃ দৈনিক মানবকর্তৃ।  
তারিখঃ ০২ আগস্ট ২০২২।



# গণহত্যায় নিহত পরিবারকে যথাযোগ্য মূল্যায়ন করা হোক ইমরান হোসাইন

২৩ বছরের শাসন-শোষণের যাতাকলে নিষ্পেষিত বাঙালিরা ৭০ এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর ৬ দফার নৌকাকে নিরক্ষুণভাবে বিজয়ী করে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যখন সরকার গঠনের প্রস্তুতি নিছিল, পর্দার অন্তরালে তখন ষড়যন্ত্রে মাতোয়ারা ছিল ইয়াহিয়া-ভুট্টো ও পাঞ্জাবি শাসক গোষ্ঠী।

ষড়যন্ত্রের জবাব দিতে-  
১৯৭১ সালের ৭ মার্চ  
(তৎকালীন রেসকোর্স  
তার ঐতিহাসিক ভাষনে  
স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের  
এই ভাষণের পরেই গোটা  
আমার ঠিকানা- পদ্মা মেঘনা  
বাংলাদেশ স্বাধীন করা,”  
“তোমার দেশ আমার দেশ,  
স্নোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে।  
সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠী  
বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালির  
প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।



জাতিকে নির্দেশনা দিলেন বঙ্গবন্ধু, ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ময়দান।) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘোষণা দিলেন ‘এবারের সংগ্রাম সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম’- পূর্ব বাংলায় বীর বাঙালি “তোমার যমুনা,” “বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, পিণ্ডি না ঢাকা-ঢাকা ঢাকা,” বাংলাদেশ বাংলাদেশ” স্লোগানে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়ার ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার পথ ধরে স্বাধীন রাষ্ট্র ভূমি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে

বাঙালির উত্তাল রূপকে, গণতন্ত্রের দাবিকে পাকিস্তানের সামরিক জাত্তা অস্ত্রের মোকাবেলা স্তব করতে উদ্যত হয়। এই ষড়যন্ত্রকারীরা বাঙালিকে চিরতরে শেষ করে দেয়ার পরিকল্পনা নিয়ে ২৫ মার্চ সংগঠিত করে ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম গণহত্যা ! পরিচালনা করে ‘অপারেশন সার্চলাইট’ নামের নিষ্ঠুর গণহত্যা ! ওই গণহত্যায় একরাতেই ঢাকাসহ সারা দেশে শহিদ হন প্রায় ৫০ হাজারের বেশি মানুষ। পুরো বাংলাদেশ পরিগত হয় আতঙ্কের এক জনপদে। পুরো দেশজুড়ে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষন, লুঠনের খেলায় মেতে ওঠে পৃথিবীর জঘন্যতম হত্যালীলায়। এভাবে ৯ মাস ব্যাপী চলে মানব ইতিহাসের ভয়াবহতম নিষ্ঠুর গণহত্যার নির্মতা। সেই নির্মম গণহত্যার বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বীর বাঙালি ১৬ ডিসেম্বর অর্জন করে বিজয়। প্রতিষ্ঠা করে লাল সবুজের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু উদ্যোগ নিয়েছিলেন। নিজ সাক্ষরে পত্র প্রেরণ করেছেন। পূর্ণবাসনের কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। কিন্তু ৭৫ এর ১৫ আগস্টের নির্মমতার পর এসব উদ্যোগ বলতে গেলে বক্ষ হয়ে যায়। আমরা স্বাধীনতার ‘৫০ বছরে সুবর্ণ জয়ন্তী’ উদযাপন করেছি। সুবর্ণ জয়ন্তী’ উদযাপন করতে আয়োজন করেছি নানা কর্মসূচি। কিন্তু স্বাধীনতার ৫০ বছর অতিক্রান্ত হলেও আমরা কি একবারও ওই গণহত্যায় নিহতদের কিংবা তাদের পরিবারের খোঁজ নিয়েছি ? স্বাধীনতার একান্ন বছরে এখনও গণহত্যায় শহিদ পরিবারের সদস্যরা চোখের পানি ফেলেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক শহিদ পরিবার ভূমিহীন, গৃহহীন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আজ তাদের একি অবস্থা। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী অতিক্রান্তের বছরে আমাদের দায় ও দায়িত্ব ১৯৭১ সালের গণহত্যায় যারা নিহত হয়েছে তাদের শহিদের মর্যাদা দেয়া। যারা ভূমিহীন, গৃহহীন পরিবার, তাদের পুর্ণবাসনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ।

আজ বঙ্গবন্ধুর কন্যা দেশ পরিচালনা করছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানীত করছেন। উদ্যোগ নিচেন মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য। আজকের দিনে বঙ্গবন্ধুর কন্যার নিকট একজন নাগরিক হিসেবে দাবি, ৭১ সালের গণহত্যায় নিহত পরিবারগুলোকে যথাযোগ্য মূল্যায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করুণ।

লেখকঃ

গণমাধ্যমিকমী, সিরাজগঞ্জ।

প্রকাশ তথ্যঃ

পত্রিকাঃ দৈনিক ভোরের কাগজ।

তারিখঃ ০২ জুন ২০২২।



# ଭୂମକିର ମୁଖେ ପାହାଡ଼େର ଜୀବବୈଚିତ୍ର୍ୟ

## ଧନ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପୁରା

ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବଶେ ଉତ୍କିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଆଗୁବୀକ୍ଷଣିକ ଜୀବ ସମୁହେର ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କେର ଭିନ୍ନିତେ ଯେ ବାନ୍ଧତତ୍ତ୍ଵ ଗଡ଼େ ଓଠେ, ସେଇ ବାନ୍ଧତତ୍ତ୍ଵେ ଅଗନିତ ନାନା ଧରନେର ଜୀବ ପ୍ରଜାତିର ସମାହାର ବା ସମାବେଶକେ ଜୀବବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବଲେ । □□□□ ଓ □□□□-ଏର ମତେ, “କୋନାଏ ଏକଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳେର ସମସ୍ତ ଜିନ, ପ୍ରଜାତି ଓ ବାନ୍ଧତତ୍ତ୍ଵର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଓ ସମଗ୍ରତାକେ ଜୀବବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବଲେ” । ଉତ୍କିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଜୀବାଗୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଜାତିର ମଧ୍ୟେ ଯେମନ ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟାତ୍ମକ ଦେଖା ଯାଏ, ତେମନି ଏକଇ ପ୍ରଜାତିର ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟଦେର ମଧ୍ୟେ ଗଠନଗତ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖା ଯାଏ । ଜୀବମଞ୍ଚଲେର ସମଗ୍ର ଜୀବଦେର ମଧ୍ୟେ ଏହି ବିଭିନ୍ନତାଇ ହଳ ଜୀବବୈଚିତ୍ର୍ୟ । ଏକଟି ସମାଜ ବିନିର୍ମାଣେ ଯେମନ ବିଭିନ୍ନ ପେଶାର ଲାକ୍ଷେର ଦରକାର ହୁଏ, ଯାରା ନିଜ ନିଜ କାଜେର ଦ୍ୱାରା ସମାଜକେ ଟିକିଯେ ରାଖେ । ଠିକ ତେମନି ଏକଟି ବାନ୍ଧତତ୍ତ୍ଵର ସୁନ୍ଦାରୀଭାବେ ଟିକେ ଥାକାର ଜନ୍ୟ ଜୀବବୈଚିତ୍ର୍ୟର ପ୍ରୟାଜେନ ହୁଏ, ଯେଥାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଜାତି ତାଦେର ନିଜସ୍ତ ଭୂମିକା ପାଲନ କରେ । ଜୀବବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବାନ୍ଧତତ୍ତ୍ଵର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ପୃଥିବୀକେ ବାସ୍ୟୋଗ୍ୟ କରେ ତୋଳେ ।

ମାନୁଷ ତଥା ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତର କାହେ ଜୀବବୈଚିତ୍ର୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅପରିସୀମ । ବିଭିନ୍ନ କାରଣେ ଜୀବବୈଚିତ୍ର୍ୟର ପ୍ର୍ୟୋଜନୀୟତା ରଯେଛେ । ପ୍ରଥମତ, ବେଁଚେ ଥାକାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ଜୀବକେ ପ୍ରକୃତିର ଉପର ନିର୍ଭର କରାନ୍ତେ ହୁଏ । ଏକ୍ଷେତ୍ରେ ପ୍ରକୃତିର ଉପର ମାନୁଷେର ନିର୍ଭରଶୀଳତାଓ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ । ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଥାନ, ଓୟୁଧ ପ୍ରଭୃତିର ଜନ୍ୟ ତାକେ ସରାସରି ପ୍ରକୃତିର ଉପର ନିର୍ଭର କରାନ୍ତେ ହୁଏ । ଜୀବବୈଚିତ୍ର୍ୟର ଜନ୍ୟେଇ ମାନୁଷ ତାର ଚାହିଦା ପ୍ରକୃତି ଥେକେ ଯେତାତେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ । ଦ୍ୱିତୀୟତ, ଯେକୋନୋ ଦେଶେର ଜୀବବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସେଇ ଦେଶେର ସମ୍ପଦ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ ପ୍ରକୃତିକେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମ୍ୟ ଓ ସୁନ୍ଦର କରେ

ପ୍ରକୃତିର ଅପରିପ୍ରକାଶିତ ଉପଭାଗେ କରାନ୍ତେ  
ଅସଂଖ୍ୟାତମ ମାନୁଷ  
ସମୁଦ୍ର ସୈକତ,  
ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ  
ଭ୍ରମନ କରାନ୍ତେ ଯାଏ ।  
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର  
ପୃଥିବୀତେ ବେଁଚେ  
ଅଧିକାର ଆହେ ।  
ଦେରା ଜୀବ ହିସେବେ  
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତିଟି  
ଜୀବକେ ଏହି  
ବୁକେ ବାଁଚିଯେ ରାଖା ।  
ପ୍ରତ୍ୟେକ



ତୋଳେ ।  
ସୌ ନ୍ଦୟ  
ପ୍ରତିବହ୍ର  
ପାହାଡ଼,  
ବନାଧ୍ୟଳ,  
ପ୍ରଭୃତିତେ  
ତୃତୀୟତ,  
ଏ ଇହ  
ଥାକାର  
ତାଇ ସୃଷ୍ଟିର  
ମାନୁଷେର  
ପ୍ରଜାତିର  
ପୃଥିବୀର  
ଚତୁର୍ଥତ,  
ଜୀବ

ବାନ୍ଧତତ୍ତ୍ଵକ୍ଷରାବେ ଏକେ ଅପରେ ଉପର ନିର୍ଭରଶୀଳ । ବାନ୍ଧତତ୍ତ୍ଵର ଯେକୋନୋ ଏକଟି ଉତ୍କିଦ ବା ପ୍ରାଣୀର ବିଲୁଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ ମାନେ ଏହି ବାନ୍ଧତତ୍ତ୍ଵର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବର ଧରଙ୍ଗ ଡେକେ ଆନା । ଏକଟି ଜୀବର ବିନାଶ ଅନ୍ୟ କୋନାଏ ଜୀବର ବିପନ୍ନତାର କାରଣ ହେତୁ ପାରେ । ଜୀବବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଟିକେ ଆହେ ବଲେଇ ଆମରା ପୃଥିବୀର ବୁକେ ଏଖନେ ବେଁଚେ ଆହି । ତାଇ ମାନୁଷେର ଏହି ପୃଥିବୀତେ ବେଁଚେ ଥାକାର ପ୍ରଧାନ ଶର୍ତ୍ତ ହୁଏ ଏହି ଜୀବବୈଚିତ୍ର୍ୟକେ ବାଁଚିଯେ ରାଖା । ପଞ୍ଚମତ, ପରିବଶେ ଦୂରଣ ରୋଧ କରାନ୍ତେ ଜୀବମଞ୍ଚଲେର ସାର୍ବିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବଜାୟ ରାଖାର କାରଣେ ଜୀବବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । ପରିବଶେ ଅର୍ଥିଜନେର ସରବରାହ ବଜାୟ ରାଖିତେ, ବୃଷ୍ଟିପାତ ଘଟାତେ ଉତ୍କିଦେର ଭୂମିକା ଅପରିହାର୍ୟ ।

କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଜନକ ହଲେ ଓ ସତ୍ୟ ଯେ, ବାଲାଦେଶେର ଭୂମିକା ନାମେ ଖ୍ୟାତ ପାର୍ବତ୍ୟ ଚଟ୍ଟଗାମେର ଜୀବବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଆଜ ଭାଲୋ ନେଇ । କାଲେର ନିର୍ମଗ୍ରାସେ ହାରିଯେ ଯାଚେ ପାହାଡ଼େର ବହୁ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବବୈଚିତ୍ର୍ୟ । କିନ୍ତୁ ସ୍ଵାର୍ଥାବେଶୀ ମାନୁଷେର ଅବୈଧ ଉପାୟେ ଗାଛପାଳା ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ନିଧନ, ବନ ଉଜାଡ଼, ନିର୍ବିଚାରେ ପାହାଡ଼ ଆଶ୍ରମ ଓ ପାଥର ଉଡ଼ୋଲନ, ଅବାଧେ ପାଥି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଶିକାର, ନଦୀ-ନଦୀ ଓ ଜଳାଶୟ ଭରାଟ ପାହାଡ଼େର ଜୀବବୈଚିତ୍ର୍ୟକେ ଚରମ ଝୁକିତେ ଫେଲେ ଦିଯେଇଛେ । ଏହାଡ଼ା ମାତ୍ରାତିରିକ୍ତ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାରଜନିତ ଦୂରଣ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ରାସାୟନିକ ବ୍ୟବହାରଜନିତ କାରଣେ ଆଜ ନାନା ପ୍ରାଣୀ ବିଲୁଷ୍ଟିର ପଥେ । ସଂରକ୍ଷଣେର ଅଭାବେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣୀକେ ଆମରା ହାରାନ୍ତେ ବସେଇ । ଏକଟା ସମୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଏଲାକା ସୁବିନ୍ଦ୍ରିୟ ଅରଣ୍ୟ ଓ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରକୃତିକ ସମ୍ପଦେ ଭରପୁର ଛିଲ । ଛୋଟ, ବଡ଼ ହରେକ ରକମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତର ଆବାସଥଳ ଛିଲ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ । ଏଥିନ ଆର ଆଗେର ମତୋ ସୁବିନ୍ଦ୍ରିୟ ବନାଞ୍ଚଳ ଦେଖା ଯାଏ ନା । ଚାରିଦିକେ ଶୁଦ୍ଧ ସେଣ୍ଟନଗାଛ ଆର ସେଣ୍ଟନଗାଛ । ସମୟର ବିବରତନେ ଆଜ ପାହାଡ଼େର ସେଇସବ ବିସ୍ତୃତ ଅରଣ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତିକ ବନ ଧରଙ୍ଗ ହେୟ ଯାଚେ । ଆବାସଥଳ ଓ ଖାଦେର ପ୍ରାଚୁର୍ୟତା ହ୍ରାସ ପାଇସିଥାଏ । ଏତେ ବିଲୁଷ୍ଟିର ପଥେ ରଯେଇ ହାଜାରୋ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଯେମନ ହାତି, ହନୁମାନ, ଭାଲୁକ, ମାୟା ହରିଣ, ସାମ୍ବାର, ବାନର, ଗ୍ୟାଲ, ବନ୍ୟ ଶୁକର, ବନ ଛାଗଲସହ ନାମ ନା ଜାନା ବହୁ ପ୍ରଜାତିର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ । ଦିନ ଯତ ଯାଚେ ପାହାଡ଼େର ଜୀବବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଯେନ ତତ ହାରିଯେ ଯାଚେ ।

ଏକଟା ସମୟ ନାନା ଜୀବବୈଚିତ୍ର୍ୟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିଲ ପାର୍ବତ୍ୟ ଏଲାକା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଚାପ, ଅପରିକଲ୍ପିତଭାବେ ସେଣ୍ଟନଗାଛ ଲାଗାନୋ, ବନ ଉଜାଡ଼, ବନଜ ସମ୍ପଦ ପାଚାର ଏବଂ ନିର୍ବିଚାରେ ବୃକ୍ଷ ନିଧନେର ଫେଲେ ଧରଙ୍ଗ ହେୟ ଯାଚେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଦେର ଅଭ୍ୟାସମ । ଏତେ ପାହାଡ଼େ

বন্যপ্রাণীর সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। একই সাথে হ্রাস পাচ্ছে পাহাড়ের উষ্ণমন্ডলীয় মিশ চিরহরিৎ বনাঞ্চলও। ছোটবেলায় যখন গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াতাম তখন পাখপাখালির কলকাকলিতে চারপাশের পরিবেশ মুখরিত হয়ে উঠতো। এখন কিছু প্রজাতির পাখি যেমন শালিক, চড়ুই, বুলবুলি ও দোয়েল ছাড়া অন্যান্য প্রজাতির পাখি খুব একটা দেখা যায় না। হয়তো এসব পাখিগুলোও একসময় হারিয়ে যাবে। ধারণা করা হচ্ছে, বন্যপাখি হারিয়ে যাওয়ার মূল কারণ হলো বন উজাড়, অবাধে পাখি শিকার, মাত্রাতিক্রম কীটনাশকের ব্যবহার এবং খাদ্যের অভাব। খাদ্য ও বাসস্থানের অভাবে কিছু প্রজাতির পাখি ইতোমধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর কিছু প্রজাতির পাখি খাদ্যের সন্ধানে অন্যত্র চলে গেছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবসৃষ্ট কারণে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো হৃষকির মুখে রয়েছে পাহাড়ের জীববৈচিত্র্য। কিছু অসৎ মানুষের স্বার্থান্বেষী মনোভাবের কারণে প্রতিনিয়ত পাহাড়ের পরিবেশ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। দেশের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা তেমন ফলপ্রসূ হচ্ছে না। তাই জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া খুবই জরুরি। প্রথমত, দরকার জনসচেতনতা বৃদ্ধি। ‘জীববৈচিত্র্য কি, কেন রক্ষা করা প্রয়োজন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপায়গুলো কি কি’- এসব বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে হবে। নির্বিচারে গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে এবং প্রচুর পরিমাণে পরিবেশবান্ধব গাছ লাগাতে হবে। নদীর পানি দূষিত করা যাবে না। পাহাড় কাটা এবং অবাধে পাখি শিকার বন্ধ করতে হবে। শুধু কয়েকটি আলোচিত প্রজাতি রক্ষা করলেই জীববৈচিত্র্য রক্ষা হয় না। জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে হলে প্রয়োজন সব প্রকারের জীব প্রজাতির ব্যাপারে সমান গুরুত্ব দেওয়া। পরিবেশ বিজ্ঞানের অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জীববৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানব সমাজের উপকারে আসে। সর্বোপরি, যেহেতু আমরা সবাই পরিবেশের অংশ এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল, তাই প্রকৃতির প্রত্যেকটি জিনিসকে নিজের মনে করে ভালোবাসতে হবে। হারানো প্রকৃতি ও পরিবেশকে পুনরুদ্ধারের জন্য বর্তমান প্রজন্মকে অঙ্গীকার করতে হবে। জীববৈচিত্র্য এবং প্রকৃতি সংরক্ষণের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের জন্য টেকসই একটি ভবিষ্যত। এর জন্য প্রয়োজন সকলের সম্মিলিত ও শক্তিশালী প্রচেষ্টা। তাহলে এমনিতেই রক্ষা পাবে পাহাড়ের জীববৈচিত্র্য। আর আগামীর বিশ্ব হয়ে উঠবে সুন্দর থেকে আরও সুন্দরতর।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকাশ তথ্যঃ  
পত্রিকাঃ দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ।  
তারিখঃ ০৬-০৫-২০২২



# জলাবদ্ধতা ও আমাদের দায়

## আজহার মাহমুদ

বর্ষায় আমাদের কাছে অন্যতম প্রধান একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় জলাবদ্ধতা। বিশেষ করে ঢাকা-চট্টগ্রামে এ সমস্যাটা দিন দিন বেড়েই চলছে। এ সমস্যার সমাধান কোনোকালেই পায়নি এই দুই নগরীর বাসিন্দারা। যদি চট্টগ্রামের কথা বলতে হয় তাহলে বলা যায়, এই নগরের মানুষ এই জলাবদ্ধতাকে সঙ্গী করেই এগিয়ে যাচ্ছে। মেয়র পালটায় তবে এ সমস্যার শেষ খুঁজে পাওয়া যায় না।

তবে আমরা প্রায় সময় এ সমস্যার জন্য মেয়র, প্রশাসন এমনকি সরকারকে দায় দিই। নানা ধরনের কথাবার্তা বলে গরম করি ফেসবুক। কিন্তু আমরা কি একবারও ভেবে দেখেছি এ সমস্যার জন্য আমরা নিজেরাই আসলে সবচে বেশি দায়ী।

বছরের পর বছর এ জলাবদ্ধতার সমস্যায় আমরা আমাদের কারণেই জর্জরিত হই। সামান্য বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। অথচ এমনটা হওয়ার কথা নয়। তবুও হচ্ছে। কারণ আমাদের নালা, খালগুলো পলাথিন, বোতল, আর প্লাস্টিকে ভরা। আমরা আমাদের ময়লা, আবর্জনাগুলো নিজেদের খামখেয়ালিপনায় সেখানেই ফেলে দিই। বাংলাদেশের এক জটিল সমস্যায় পরিণত হয়েছে জলাবদ্ধতা। অথচ মাথাবাথা নেই।

লাইভ, টকশো, গোলটেবিল বৈঠক, সব হয়। সবখানেই করপোরেশনকে দিয়ে যাই। একবারও বলি না। না বলেই আজ নিষ্কাশন ব্যবস্থা না নগরায়ণের ফলে স্বত্ত্ব বৃষ্টিটাও আমাদের মানতে সমস্যার জন্য অসচেতনতা ও

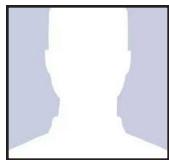


দায়ী। খাল-জলাশয় দখলসহ পলাথিন ও প্লাস্টিক সামগ্ৰী ড্রেন, জলাশয়ে যত্রত্র ফেলে এই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করা হয়। এজন্য নাগরিক অসচেতনতাই দায়ী।

তাই এ ক্ষেত্রে নাগরিক সচেতনতা মুখ্য বিষয় বলে আমি মনে করি। যদি আমরা নাগরিকগণ না শুধরাই, আমরা প্রশাসন থেকে ভালো কিছু আশা করতে পারি না। এবছরও টানা বর্ষণে চট্টগ্রাম মহানগরীর কাতালগঞ্জ, কাপাসগোলা, শুলকবহর, মুরাদপুর, বহদারহাট, ঘোলশহর ২ নম্বর গেট, বাকলিয়া ডিসি রোড, আগ্রাবাদ সিডিএ, হালিশহর, মোগলটুলি, ট্রাঙ্ক রোড, তালতলা, চান্দগাঁও আবাসিক, খতিবের হাট, সিয়াভি কলোনি, ফিরিসিবাজার, আলকরণ, বাকলিয়া আবদুল লতিফ হাটখোলা সড়কে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। প্রতি বছরই একই সমস্যার সম্মুখীন হয় চট্টগ্রামের সিংহভাগ জনগণ। কিন্তু এরপরেও নাগরিকগণ যেমন সচেতন হচ্ছে না তেমনি এই সমস্যার সমাধানে প্রশাসনের কোনো ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা যায় না।

সরকার, প্রশাসনের এই সমস্যা সমাধানে একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। এবং সেই প্রকল্প হতে হবে দৃশ্যমান। কারণ আজকাল বেশির ভাগ প্রকল্প শুরু হলেও শেষ হওয়ার কোনো খবর থাকে না। তাছাড়া দুর্নীতি তো আছেই। পাশাপাশি আমাদের জনসাধারণকেও এ সমস্যা সমাধানে বিরাট ভূমিকা রাখতে হবে। অবশ্য জনগণই পারে এ সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখতে। কারণ এ জলাবদ্ধতা সৃষ্টিতে আমাদেরও বড় একটা ভূমিকা রয়েছে। আমরাই ড্রেন, খালসহ বিভিন্ন স্থান ময়লায় ভরপুর করে রাখি। যার কারণে আমরা নিজেরাই এই জলাবদ্ধতার জালে আটকে যাই। তাই এ সমস্যার সমাধানে সবাইকেই একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। আসুন আমরা সবাই যার যার অবস্থান থেকে জলাবদ্ধতা নিরসনে ভূমিকা রাখি। তা হলে দেখা যাবে যে, জলাবদ্ধতার সীমাহীন দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। মনে রাখবেন জনসচেতনতাই পারে একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ওমরগনি এমইএস বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, চট্টগ্রাম  
প্রকাশ তথ্যঃ  
পত্রিকাঃ দৈনিক ইতেফাক।  
তারিখঃ ২৩ জুন ২০২১।



# অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নতুন দ্বার।

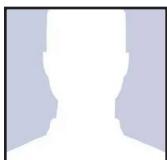
## আশিকুর রহমান

পদ্মা সেতুর উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে আমরা এক সন্তানার নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করলাম। বাংলাদেশ নদীমাত্রক দেশ। নদীমাত্রক দেশ হিসেবে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাহিত্যে বারবার এসেছে বাংলাদেশের এই প্রধানতম নদী পদ্মা। পদ্মা নামটি এসেছে লোটাস ফুল থেকে। পদ্মার উৎপত্তি হিমালয়ের গঙ্গোত্রি পাদদেশের হিমপ্রবাহ থেকে। পদ্মা নাম শুনলেই দেশের মানুষের মনে ভেসে উঠত সেই দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভোগান্তির চিত্র। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের যাতায়াত ব্যবস্থা, ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষি, শিল্পসহ সর্বক্ষেত্রে দুর্ভাগের এক নাম ছিল পদ্মা। এই পদ্মাকে ঘিরেই রচিত হয়েছে কত কবিতা, গান, রচনা। আর আজ পদ্মার বুকে রচিত হলো বাংলার ইতিহাসের বিস্ময়কর ‘পদ্মা বহুমুখী সেতু’। খুলে গেল অপার এক সন্তানার দ্বার। পদ্মা সেতু, আজ সকল বাংলাদেশির সাহসিকতার আরেক নাম। পদ্মা বহুমুখী সেতুর ভিত্তি হয়েছিল আঠারো বছর আগে। দীর্ঘ অপেক্ষার অবসন্ন ঘটিয়ে ২৫ জুন বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস প্রচেষ্টায় সফলভাবে উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনে অংশ নিয়ে বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বলেন ‘পদ্মা সেতু শুধু ইট পাথরের অবকাঠামো নয়, এটা আমাদের অহংকার ও সক্ষমতার প্রতীক’। কিন্তু দৃঢ়খের বিষয় যে এই পদ্মা সেতু বাস্তবায়নে কাঠখড় পোহাতে হয়েছে বাংলাদেশের। পাড়ি দিতে হয়েছে রাজনৈতিক প্রতিহিস্ম। আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র স্বপ্নের পদ্মা সেতু বাস্তবায়নে বাঁধাগ্রস্ত করেছে কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বে ও কঠিন চ্যালেঞ্জে নিঃস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু আজ বাংলার মানুষের কাছে ইতিহাসে বিস্ময়। আজ এ শুধু কল্পনা নয়, বহুল প্রত্যাশিত স্বপ্নের পদ্মা সেতু এখন বাস্তবে ধরা দিয়েছে বাংলার মানুষের কাছে। এ যেন বাংলাদেশের আরেক জয়। এটি শুধু একটি সেতু ই নয়, এটি বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের চালিকাশক্তি, সক্ষমতার প্রতীক। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষসহ সারা বাংলার মানুষের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন ছিল এই সেতু, ছিল বুকভোগ প্রত্যাশা। আজ তা বর্তমান ও বাস্তবিক। দেশের মানুষের সাহস আর অদম্য মানসিকতার দৃঢ় প্রতীক। বিশ্বব্যাংক কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাংলাদেশ যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে এটাই তার অন্যতম প্রমাণ। কারো কাছে মাথা অবনত না করে আত্মর্যাদায় মহিয়ান হয়ে এত বড় প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলার মানুষের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে, জয় হয়েছে মানুষের আস্থার। একটি রাষ্ট্রের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নীতকরণ। যোগাযোগ ব্যবস্থার অবনতি হলে রাষ্ট্রের যোগান সঠিক ভাবে, সঠিক সময়ে হয়ন। এতে রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক বিপর্যয় হয়। পদ্মা সেতুর বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে রাজধানীসহ দেশের ২১টি জেলার সাথে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করেছে; যা এ সকল জেলার যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তরান্বিত করবে। এই সেতুর নিচ দিয়ে রেল সংযোগের ব্যবস্থা রয়েছে। এমন কয়েকটি জেলার সাথে রেল যোগাযোগ স্থাপন করেছে যেসব জেলার সাথে পূর্বে রেল যোগাযোগ ছিল না। সরাসরি সড়ক পথ ও রেল সংযোগের ফলে এসব জেলায় তৈরি হবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, শিল্পকারখানাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের কর্মসংস্থান বাড়বে, ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বার উন্নৃত হবে। পূর্বের তুলনায় যাতায়াত ব্যবস্থায় এখন ৩-৪ ঘণ্টা সময় কম লাগবে। ফলে বাংলাদেশ দ্রুতগতির উন্নয়নে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে। এতে দেশে গ্রস ন্যাশনাল প্রডাক্ট (জিএনপি) মাত্রা ১.২ হতে ১.৫ এ উন্নীত করবে। অপরদিকে গ্রস ডোমেষ্টিক প্রডাক্ট (জিডিপি) বৃদ্ধি পাবে ২.৩ শতাংশ। এখন পুনরুদ্ধার করা লবণাক্ত জমি উর্বর হতে শুরু করবে, ফসলের ফলন বৃদ্ধি পাবে। মৎস শিল্পসহ সকল প্রকার হিমায়িত পণ্ড্যদ্রব্য আর হিমায়িত নয় বরং স্বল্প সময়ে বাজারজাত করনে আয় বাড়বে বৃহৎ। সরাসরি সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে এখন কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত, খুলনা, মোংলায় পর্যটকের সংখ্যা বেড়ে যাবে। এতে যেমন মানুষ কম সময়ে পর্যটন কেন্দ্রে পৌঁছাবে তেমনি পরিবহণ ব্যয় বহুলাংশে কমবে। পর্যটন এরিয়ার স্থানীয় নিঃস্ব ও নিম্নবিত্ত মানুষের উপার্জন ক্ষমতা বেড়ে যাবে ঠিক ততগুলে পর্যটন শিল্পের সমৃদ্ধি হবে। এতে ঘটবে ব্যাপক শিল্পায়ন ও বছরের শুরুতে দারিদ্র্য হ্রাস পাবে আনুমানিক ০.৭৫ শতাংশ। পদ্মা সেতুর প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী হবে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় তিনি কোটির ও বেশি মানুষ। এতে কর্মসংস্থান, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং পিছিয়ে থাকা জেলা গুলোর উন্নয়নের মধ্য দিয়ে পুরো দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দরিদ্রতা কমবে। একদিকে যেমন যাতায়াতের সময় কমে আসবে অন্যদিকে পরিবহণ খরচ ও কমবে এই সেতুর কল্যাণে। এখন আর চিকিৎসার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করে থাকতে হবেনা ফেরীঘাটে, চাকুরীজীবী মানুষটাকে আর দেরিতে অফিসে যাওয়ায় মিথ্যা অজুহাত দেখাতে হবেনা। ফেরি বা নৌযানে বহন করা কষ্টসাধ্য পন্য এখন সহজেই রেলে বাজারজাতকরণ ও ভোজনের কাছে বিপণন করা যাবে। ফলে দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ করে বাজারের মূল্য স্থিতিশীল থাকবে। এতে যেমন জাতীয় অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে তেমনি ২০৩০ সাল নাগাদ প্রায় পাঁচ কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। পদ্মা সেতু শুধু স্থানীয়ভাবে নয়, এটি আন্তর্জাতিক ভাবেও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা পদ্মা সেতু ও সরাসরি সংযোগ সড়ক এশিয়ান হাইওয়ে রুট এএইচ-১ এর অংশ হওয়ার ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ সহজ করবে। ভারত, নেপাল ও ভূটানের সাথে সরাসরি সংযোগ করে চলাচলে যেমন সহজ হবে ঠিক ততটাই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এটি আর্থ-সামাজিক অবদান রাখার পাশাপাশি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ কে অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি হিসেবে পরিচয় দিবে।

সর্বোপরি, দক্ষিণাঞ্চলের ২১ টি জেলার মানুষের ব্যবসা, শিক্ষা, শিল্প ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে বৈপ্লাবিক পরিবর্তনের সঙ্গী হয়ে থাকবে। পদ্মা সেতু শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থা নয়, বরং অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক অবদান রাখবে। পদ্মা সেতু আমাদের অহংকার, আমাদের আত্মপরিচয়।

লেখকঃ

সদস্য; বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।



# ‘মুক্তিযুদ্ধে আলেম সমাজ’

## মো. মনিরুল ইসলাম

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচিত্র কিংবা নাটকে দাঢ়ি-টুপিওয়ালা ব্যক্তিদের সাধারণত মুক্তিযুদ্ধের খলনায়ক, ধর্ষক, দুশ্চরিতা বা রাজাকার হিসেবে প্রদর্শন করা হয়। অথচ একান্তরের দাঢ়ি টুপিওয়ালা অসংখ্য আলেমদের ইতিবাচক ভূমিকা থাকলেও তা আমাদের অনেকের আজনাই রয়ে গেছে। অসংখ্য আলেম সমাজ মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশে অবদান রেখেছেন। কেউ কেউ সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। কেউ বা যুদ্ধে না যেতে পেরে পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন। কেউ বা পালিয়ে পালিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। আবার অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামের যেতে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

অসংখ্য আলেমগণ মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার ফলে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের ঘরবাড়ি আগুনে পুড়ে বিধ্বংস করেছে। মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ ২৪৩ দিন আতঙ্গের থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং তারই পরামর্শ অসংখ্য মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা তার বাড়ির আগুনে পুড়িয়ে দেয়।

২৬ মার্চ পাকহানাদারদের গুলিতে প্রাণ হারান ঢাকার হাতিরপুল মসজিদের ইমাম, বহুতর ময়মনসিংহের ইমাম মাওলানা ইরতাজ কাসেমপুরী পরাধীন দেশের জুমার নামাজে ইমামতি করতে অস্বীকৃতি জানালে পরবর্তীতে পাকহানাদাররা তাকে নির্মভাবে গুলি করে হত্যা করে। এই ইরতাজ আলী কাসেমপুরীর কথা ছুমায়ুন আহমেদের বিখ্যাত উপন্যাস জোসনা ও জননীর গল্পে তা উল্লেখ করেন।

স্বাধীনতা ইসলাম সমর্থন দেয় দাসত্ব বা গোলামিকে নয়। সে কারণে আলেমদের সিংহভাগ অংশ পাকিস্তানি শাসকদের জুলুম, অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতনের প্রতিবাদ করেছে। তাদের অবস্থান ছিল কোরআন-হাদিস সমর্থিত। নীরবে-নিভৃতে অসংখ্য আলেমসমাজ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামে অংশীভূতি করেছেন। যশোর রেল ইন্সিনে মাদ্রাসার মুহতামিম দেওবন্দ ফারেগ মাওলানা আবুল হাসান যশোরী এবং তার মাদ্রাসার ছাত্ররা মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামে অংশ নেয়।

১৯৭১ সালের ৮ এপ্রিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হামলা করে। শহীদ হন ২১ জন। যাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ আলেম হাবিবুর রহমান এবং বাকিরা ছিল ওখানে আশ্রয় নেয়া মুক্তিযোদ্ধারা। এমনকি মাদ্রাসার প্রাঙ্গনে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের কবর রয়েছে। অন্যথায়, পুরাণ ঢাকার পীর জুরাইনের নির্দেশে অসংখ্য মুরিদ মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। জুরাইনের পীর সাহেব সরাসরি মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন দিয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান পটিয়া মাদ্রাসার আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখন তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন অত্র মাদ্রাসার মুহতামিম আল্লামা দানেশ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। এমনকি মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বখন আলেম-ওলামাদের প্রশংসন করা হয়, তখন প্রতিউত্তরে তারা বলে পাকিস্তানিরা হচ্ছে জালেম আর আমরা হচ্ছি মজলুম সুতরাং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা আমাদের জন্য ফরয। পরবর্তীতে জনসাধারণ পাক হানাদার বাহিনীদের বিরুদ্ধে আরও সৌচার অবস্থান গ্রহণ করে। পাক হানাদার বাহিনীদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে বীরত্পূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য অনেকে খেতাবও পান। এর মধ্যে কিছু আমরা উল্লেখ করতে পারি-

সেই সময়ে বাংলাদেশের শীর্ষ আলেম হাফেজী হজুর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে রাজনৈতিক ও নৈতিক অবস্থান নেন। তিনি পাকিস্তানদের জালেম এবং মজলুমের লড়াই বলে অভিহিত করেন। মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা এমদাদুল হক আড়ইহাজারী তার মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া প্রসঙ্গে বলেন- আমি হাফেজী ভজুরের খুব ভক্ত ছিলাম। যুদ্ধ চলাকালীন অনেক ছাত্র ট্রেইনিং নিচ্ছিল। আমি হাফেজী ভজুরের কাছে পরামর্শ চাইলাম যে আমি ট্রেইনিং এ যাব কিনা? এখন আমি কি করব?

তিনি আমাকে বলেন, পাকিস্তানীরা বাঙালীদের উপর অত্যাচার করছে। সুতরাং তারা জালেম। জুলুম আর ইসলাম কখনো এক হতে পারে না। তুমি যদি খাঁটি মুসলমান হও, ইসলাম মানো, তবে পাকিস্তানীদের পক্ষে চাও কিভাবে? এটা তো ইসলামের সঙ্গে কুফুরের যুদ্ধ নয়; বরং এটা হলো জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ।

তিনি মুক্তিযুদ্ধের জালেমের বিরুদ্ধে মাজলুমের ন্যায়যুদ্ধ বলে তার অনুসারীদের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। শাহখুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক অর্থাৎ (বর্তমান আলোচিত আলেম শাহখুল মাঝুনুল হকের বাবা) মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ৩২ নম্বর ধানমণ্ডিতে দীর্ঘ বৈঠক করেন। এ বৈঠকের পর মাওলানা আজিজুল হকের প্রশংসন করে শেখ সাহেব (শেখ মুজিবুর রহমান) পত্রিকায় একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। এরকম অসংখ্য আলেম-ওলামা মুক্তিযুদ্ধের ভূমিকায় চূড়ান্ত অবদান রেখেছে। বলা যায়, এক বিশাল আলেম সমাজ এই স্বাধীন বাংলাদেশের মূল হতিয়ার। যাদের অবদান আকাশচূম্বী।।।

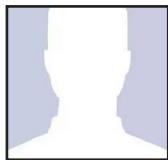
লেখকঃ শিক্ষার্থী,

সরকারি আকবর আলী কলেজ, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ

প্রকাশ তথ্যঃ

পত্রিকাঃ দৈনিক আমার বার্তা।

তারিখঃ ২০-০৫- ২০২২।



# অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট : বাঁচতে হলে জানতে হবে

## তানভীর আহমেদ রাসেল

বিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সব বিশ্ময়কর আবিক্ষারের মধ্যে অন্যতম অ্যান্টিবায়োটিক। সাধারণ ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ বা ইনফেকশনের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়। অ্যান্টিবায়োটিক শব্দের উৎপত্তি গ্রিক শব্দ অ্যান্টি ও বায়োস থেকে। অ্যান্টি অর্থ বিপরীত এবং বায়োস অর্থ জীবন। অ্যান্টিবায়োটিক জীবিত ব্যাকটেরিয়া তথা অগুজীবের বিরুদ্ধে কাজ করে। ব্যাকটেরিয়া গঠিত সংক্রমণ যেমন—নিউমোনিয়া, মৃত্রালি বা মৃত্রখলির সংক্রমণ, বিভিন্ন যৌন সংক্রমণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিক কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এটি ভাইরাস গঠিত সংক্রমণের বিরুদ্ধে কার্যকর নয়। একটি জীবাণুর বিরুদ্ধে যেমন সব অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না, তেমনি সব জীবাণুর বিরুদ্ধেও একটি অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না।

কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই সামান্য জুর-সর্দি-কাশ থেকে শুরু করে তীব্র যে কোনো রোগের জন্যই আমরা যথেচ্ছভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে চলেছি। অ্যান্টিবায়োটিকের এমন লাগামহীন ব্যবহারের ফলে শরীরে তৈরি হচ্ছে ‘অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স’। ‘অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স’ বলতে বোঝায় অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ একটি ব্যাকটেরিয়াকে ধ্রংস করার জন্য নির্দিষ্ট অ্যান্টিবায়োটিকে সব উপাদান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাতে আর ব্যাকটেরিয়া ধ্রংস হয় না। চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত অথথ ইচ্ছেমতো অ্যান্টিবায়োটিক সেবন, অ্যান্টিবায়োটিকের সম্পূর্ণ কোর্স পূর্ণ না করে সেবন করার কারণে সেবনকৃত অ্যান্টিবায়োটিক শরীরে বিদ্যমান ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে সহনীয় হয়ে পড়ে এবং ক্রমাগত ‘রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া’ রূপে সংখ্যা বৃক্ষি করে।

অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স এতটাই ভয়াবহ যে, একে ক্যানসারের চেয়েও বেশি মারাত্মক বলে মনে করা হয়। কারণ আক্রান্ত ব্যক্তির মলমুক্ত, নিঃশ্বাসসহ নানা মাধ্যমে এসব রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া পরিবেশে ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং সুস্থ মানুষকেও আক্রমণ করছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এমন অবস্থা চলতে থাকলে আগামী কয়েক বছরে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক আর মানুষের শরীরে কাজ করবে না।

অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের কারণে বাংলাদেশে কত মানুষ মারা যায়, এমন কোনো জরিপ বা গবেষণা না থাকলেও পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের করা এক গবেষণা জরিপ থেকে জানা যায়, রাজধানীতে শতকরা ৫৫ দশমিক ৭০ শতাংশ মানুষের শরীরে অ্যান্টিবায়োটিক অকার্যকর হয়ে পড়েছে। এর ভয়াবহতা শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ নয়। বিশের উন্নত দেশগুলোতেও অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের প্রাদুর্ভাব ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছে, যা আমাদের দেশের মতো এত ভয়াবহ না হলেও উপেক্ষা করার মতো নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বছরে ২৩ হাজার আমেরিকান আর বিশে ৭ লাখ মানুষ ‘অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের’ কারণে মারা যাচ্ছে।

তাই অ্যান্টিবায়োটিকের এমন করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পেতে অ্যান্টিবায়োটিকের যথাযথ ব্যবহারে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে। আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষ ‘অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স’ সম্পর্কে সচেতন নয়। এর জন্য ডাঙ্কারদের সক্রিয় ভূমিকা খুবই প্রয়োজন। চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের সামান্য সময় নিয়ে অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহারের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা একান্ত জরুরি। চিকিৎসকের পাশাপাশি গণমাধ্যম এই কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আমাদেরও অ্যান্টিবায়োটিক নিতে হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে তা নিতে হবে কিংবা অ্যান্টিবায়োটিক পরিহার করতে হবে। আর যথা রোগের জন্য যথা মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স পুরোটা সম্পূর্ণ করতে হবে, অল্প বা অর্ধেক সেবন করে বন্ধ করে দিলে চলবে না। মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে মারাত্মক ঝুঁকির হাত থেকে রক্ষা করতে সরকারের আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করা উচিত। চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক অবাধে বিক্রিরোধে শাস্তিযোগ্য আইন প্রণয়ন ও তার যথাযথ প্রয়োগ এখন সময়ের দাবি।

লেখক : শিক্ষার্থী

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক, বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম

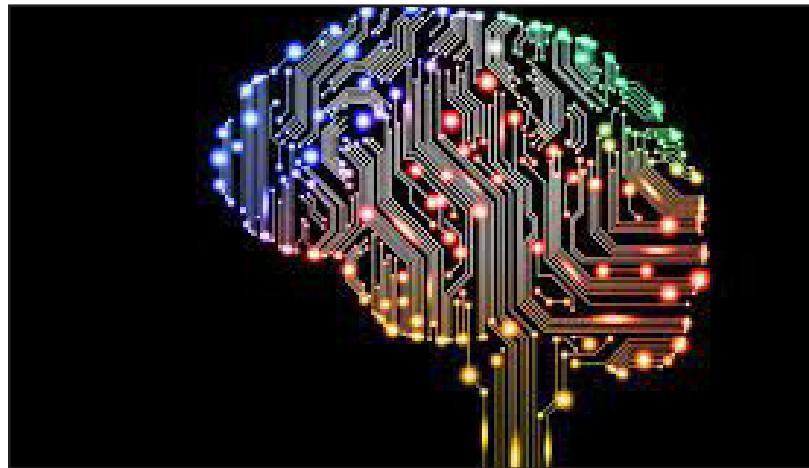


# ‘জাতি গঠনে চাই বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা’

## খায়রুজ্জামান খান সানি

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। অন্যান্য প্রাণী থেকে তাদের চিন্তা, চেতনা ও শক্তির মধ্যে দিয়ে পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবেও তাদের কর্মকাণ্ড ভিন্ন থেকে ভিন্নতর হচ্ছে। একেক জনের মতভেদে ভিন্ন রকম, চিন্তা ভাবনা ভিন্ন। এসকল ভিন্নতা একদিকে ভেদাভেদ গড়ে তুললেও অনেকাংশে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় গড়ে উঠছে। বিবেকবান হয়ে কখনো কখনো পশুর ন্যায় আচরণ করছে। যা মানবকূলের জন্য ক্ষতিকর বা অশনিসংকেতাইতিহাসের পাতায় যা অন্ধকার অধ্যায় হয়ে ছেঁয়ে আছে।

যুগে যুগে সময়ের পরিবর্তন ঘটেছে। উন্নত হচ্ছে বিশ্ব। মানবসভ্যতার উন্নয়ন বিকাশে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে নিত্যনতুনভাবে। তরঙ্গ সমাজ যার পেছনে আসছে। একটি তা নির্ভর করে সে শিক্ষা যদি একটি হয়, তাহলে সে মেরুদণ্ডের দুর্বল হয়ে পড়লে যেমন দাঁড়ানো একটি জাতির হয়ে পড়লে সে দাঢ়াতে পারবেনো। হচ্ছে শিক্ষার্থী। বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার যাতে করে



ব্যাপক অবদান রেখে জাতি কতটা উন্নত জাতি কতটা শিক্ষিত। জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষাসংগুলো হলো কশেরকা। কশেরকা মেরুদণ্ড সোজা করে সম্ভব না তেমনই শিক্ষাসংগুলো দুর্বল জাতি সোজা হয়ে শিক্ষাসংগুলোর প্রাণ শিক্ষার্থীদের এজন্য প্রতি আকৃষ্ট করতো নিত্যনতুন জিনিস

উদ্ভাবনের রূপরেখা তারা গড়ে তুলতে পারে। দেশ ও দশের সমৃদ্ধি বয়ে আনতে সচেষ্ট থাকবে। কিন্তু, আজকাল দেখা দিচ্ছে, শিক্ষার্থীরা মানসিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে নেশায় ডুবছে, মাদকাসক্ত হচ্ছে। মাদকাসক্ত যেমন দেহের জন্য ক্ষতিকর তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় চরম ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। যা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির চর্চায় ব্যাপ্ত ঘটাচ্ছে। মাদকের কবলে অচিরেই নিভে যাচ্ছে প্রাণ। তাই মানসিক হতাশার থেকে শিক্ষার্থীদের বেরিয়ে আসতে হবে, বেরিয়ে আসতে হবে মাদকাসক্তি থেকে। বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার জন্য প্রথমত তাদের বই পড়ার প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। একটি বই পারে চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটাতে। কারণ, যখন একটি বই পড়া হয় তখন কল্পনায় সেই কথা গুলো ছবির মত ভাসতে থাকবে, নতুন কিছু তাকে ভাবতে সহায়তা করবে। বই হতে পারে যেকোনো ধরণের। হোক সেটা উপন্যাসের, গল্প, কবিতা, ইতিহাস, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বই ইত্যাদি। গল্প, কবিতার বই মনের খোরাক মেটালেও কল্পনার জায়গা বিস্তৃত করতে মৃখ্য ভূমিকা পালন করো। বই পড়ার পাশাপাশি পত্রিকা পড়ার চর্চা রাখতে হবে। প্রতিদিনকার ঘটে যাওয়া খবর যেমন জানা যাবে, তেমনই পড়ার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। বিভিন্ন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হবে। বিতর্ক প্রতিযোগিকে একটি বিষয়ে বর্তমান, অতীত বিশ্লেষণ করার সুযোগ পাচ্ছে যেমন, তেমন জ্ঞানের পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। বিজ্ঞান বা গবেষণার জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্ভুদ্ধ করতে হবে। বিজ্ঞান সেমিনারের আয়োজন করে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত আয়োজন নিশ্চিত করতে হবে। যাতে করে তারা তাদের সৃজনশীলতা দেখাতে পারে নতুন কিছু সৃষ্টির মাধ্যমে।

গবেষণাকে সংস্কৃতিতে রূপ দিতে হয়। একজন মানুষকে মূল্যায়ন করতে হয় শুধু কর্ম দিয়ে। মেধাকে লালন করতে হয়। মেধার তীব্র প্রতিযোগিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এরজন্য স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি বেশি বিজ্ঞান সেমিনার বা সভার আয়োজন করতে হবে। সর্বেপরি, একটি উন্নত দেশ গড়তে হলে আমাদের সবাইকে সচেতন নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা বিকল্পহীন। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় উদ্ভুদ্ধ করতে পারলে উন্নত হবে দেশ, উন্নত হবে দেশের সংস্কৃতির প্রতিটি রূপ। তাই তারণ্যের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার জ্যগাম নিয়ে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ এমনটি প্রত্যাশা।

লেখকঃ

প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক; বাংলাদেশ তরঙ্গ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

প্রকাশ তথ্যঃ

পত্রিকা: দৈনিক ইতেফাক।

তারিখ: ২২ মে ২০২২।



## পরকালে সুখের জন্য

### মুহাম্মদ নাহিদ হোসেন নাইম

একজন মুসলমান তার দৈনন্দিন কার্যক্রম কীভাবে পরিচালনা করবে তা কোরআন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। কিছু কিছু কাজ আছে। যা দৈনিক করার প্রয়োজন নেই, যেমন জুমার নামাজ। তবে যেসব কাজ দৈনিক করতে হয়, তার মধ্যে থেকে ৫ টি কাজকে নির্বাচন করে এই লেখায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এই কাজগুলো নারী - পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকের করা উচিত।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সঙ্গে মসজিদে গিয়ে আদায় করার জন্য বিশেষ গুরুত্বারূপ করা হয়েছে। যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে জামাত ত্যাগ করে, তবে তার জন্য হাদিস শরিফে কঠিন হাঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। নামাজ আদায় শুধু ইবাদত নয়, বরং নামাজের মধ্যে রয়েছে দৈহিক, মানসিক এবং আত্মিক প্রশান্তি। নামাজ আদায় দ্বারা অন্যান্য গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা সন্তুষ্ট। প্রবাহমান নদীতে দৈনিক ৫ বার গোসল করলে শরীর যেমন পরিষ্কার এবং ভালো থাকে তেমনি ৫ ওয়াক্ত নামাজ। তাই নামাজ ইসলামের মৌলিক এবং ফরজ ইবাদত হওয়ার কারণে একজন মুসলমানের প্রতিদিন তা আদায় করা উচিত।

**পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত :** পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত মন এবং দেহকে প্রশান্ত করে। প্রতিদিন কোরআন তেলাওয়াত করা কোরানে কারিমের হক। কোরআন হলো, হৃদয়ের আলো। কোরআন তেলাওয়াতের দ্বারা হৃদয়ের আলো বৃদ্ধি পায়। প্রতিদিনের সকালটি যদি আপনি কোরআন তেলাওয়াত দিয়ে শুরু করতে পারেন, তবে আপনি নিজেই পরকালে সুখের জন্য বেঁচে থাকা যায়। আল্লাহর ভয়ে পাপ থেকে বিরত থাকা যায়। এছাড়া আল্লাহর প্রশংসা এবং জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। হজরত আবুল আহওয়াস ( রহ . ) থেকে বর্ণিত, হজরত আবদুল্লাহ ( রা . ) বলেছেন, আল্লাহর জিকির করলে শয়তানের পক্ষ থেকে ঘুম এসে যাবে। তোমরা চাইলে অনুশীলন করে দেখতে পারো। তোমাদের কেউ যখন শয়াগত হয়ে ঘুমাতে ইচ্ছা করে তখন সে যেন মহামহিম আল্লাহর জিকির করে। সহিহ বোখারি জিকিরের মধ্যে রয়েছে মানসিক প্রশান্তি। আর জিকিরের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো জিকির সবসময় করা যায়। আপনি গাড়িতে আছেন কিংবা রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন সেই সময়ও জিকির করতে পারেন। তাই জিকির একজন মুসলমানের প্রতিদিনের আমল হওয়া চাই।

**তওবা এবং ইস্তেগফার :** মানুষের মৃত্যু অনিচ্ছিত। যেকোনো সময় যেকোনোভাবে একজন মানুষের জীবনের অবসান হতে এর উপকারিতা দেখতে পারবেন। প্রতিদিন বেশ কিছু সুরা পাঠ করার ব্যাপারে হজরত রাসুলুল্লাহ ( সা . ) তাঁর দিয়েছেন এবং এর ফজিলত বর্ণনা করছেন। কোরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে সওয়াব এবং এর উপকারের কথা হজরত রাসুলুল্লাহ ( সা . ) তার হাদিসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, হজরত আবদুল্লাহ ( রা . ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী কারিম ( সা . ) বলেছেন, এটা খুবই খারাপ কথা যে, তোমাদের মধ্যে কেউ বলবে, আমি কোরানের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি; বরং তাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা কোরআন তেলাওয়াত করতে থাকো, কেননা- তা মানুষের অন্তর থেকে উটের চেয়েও দ্রুতগতিতে চলে যায়। সহিহ মুসলিম : ৫০৩৯

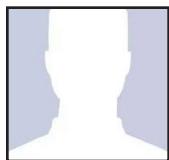
**জিকির এবং আল্লাহর প্রশংসা :** জিকির তথা আল্লাহতায়ালাকে সর্বদা স্মরণ রাখা। আল্লাহতায়ালাকে সর্বদা স্মরণ রাখার প্রধান উপকারিতা হলো, এর দ্বারা গোনাহ থেকে পারে। আর এ রকম অনিচ্ছিত জীবনে আমরা সর্বদা বিভিন্ন পাপে লিঙ্গ হই। তাই একজন মুসলমানের উচিত প্রতিদিন তওবা এবং ইস্তেগফার করা। হজরত আবু মুসা আশআরি ( রা . ) থেকে বর্ণিত, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা নিজ হাত রাতে প্রসারিত করেন। যেন দিনে পাপকারী ( রাতে ) তওবা করে এবং দিনে তার হাত প্রসারিত করেন; যেন রাতে পাপকারী ( দিনে ) তওবা করে। যে পর্যন্ত পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হবে, সে পর্যন্ত এই রীতি চালু থাকবে।’- রিয়াদুস সালেহিন মৃত্যু অনিচ্ছিত, আপনার মৃত্যু কখন হবে আপনি জানেন না। আর মৃত্যুর পর কোনো তওবা করুল করা হবে না। তাই একজন মুসলমানের উচিত সর্ব অবস্থায় তওবা করা। কারণ একজন সাধারণ মুসলমান হিসেবে গোনাহ হতেই পারে, এ জন্য অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং হতাশ না হয়ে আল্লাহর ওপর আস্থা রেখে তওবা করা উচিত।

**দান - সদকা করা :** দান - খ্যরাতের দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি পায়। দান করার ফলে গোনাহ মাফ হয় এবং অন্য মানুষের উপকার হয়। তাই সর্বদা দান করা উচিত। আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা কর, যাতে কখনো লোকসান হবে না।’- সুরা ফাতির : ২৯

দান সদকা পাপমোচন করে, ভাত্তবোধ এবং সম্পদ বৃদ্ধি করে।

একজন মুসলমান নিয়মিত দান করবে এটাই স্বাভাবিক। দান করলে কখনো সম্পদ হ্রাস পায় না। তাই বেশি বেশি দান করা উচিত। উপরোক্তিত কাজগুলো একজন মুসলমান নিয়মিত করলে গোনাহ থেকে যেমন বেঁচে থাকতে পারবে, পাশাপাশি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে- ইনশাআল্লাহ। হতে পারে প্রথম দিকে সবগুলো কাজ করা কঠিন হবে, তবে নিয়মিত করলে তা সহজ হয়ে যাবে।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা



# নিম্ন আয়ের মানুষদের কষ্ট দেখবে কে?

## প্রসেনজিৎ চন্দ্ৰ শীল

শান্ত মিয়া একজন রিঙ্গাচালক। তার থামের বাড়ি সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলাতে। সেখানে সে স্ত্রী ও চার সন্তান নিয়ে বসবাস করতো। কোনো রকমভাবে রিঙ্গা চালিয়ে যা উপার্জন করতো তা দিয়েই সে তার সংসার চালাতো। পরিবারকে নিয়ে শুধু একটু ভালো থাকার উদ্দেশ্য নিয়ে সে তার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে ইট পাথরে ঘেরা শহরে পাড়ি জমান। শহরে এসে সে নিউমার্কেট এলাকায় বাসা ভাড়া করে ২০১৯ সাল থেকে বসবাস শুরু করে।

স্ত্রী ও চার সন্তান নিয়ে বসবাস করলেও পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি বলতে সে নিজে একাই। রিঙ্গা চালিয়ে যে টাকা উপার্জন করে এতে বাসা ভাড়া, খাওয়া-দাওয়া ও ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচ চালাতেই হিমসিম খায়। একদিন সে অসুস্থ হয়ে যদি রিঙ্গা না চালাতে পারে তাহলে ঐদিন পরিবারের সকলকেই উপোস করতে হয়।

এর মাঝেই ২০২০ সালে

করোনা ভাইরাস। এতে একেবারেই কমে যায়।

করোনা ভাইরাসের প্রকোপ দেশে অর্থনৈতিক মহামন্দা।

সদস্যদের মুখে দু'বেলা অন্ন শান্ত মিয়ার মতো হাজারো থেকে শুরু করে নিম্ন পেশার লাগামহীন ভাবে বাড়তে দৃঢ় পরিবারের পক্ষে পণ্যসামগ্রীর মূল্য বাড়লেও মানুষদের আয়-রোজগার।

নিম্ন আয়ের মানুষদের কোনো হিসাব নেই।

নিম্নবিত্ত পরিবারের অবস্থা

নয়, পাশাপাশি মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষদের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মধ্যবিত্তের মানুষও হয়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে আগে থেকেই দ্রব্যমূল্য অধিকাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছিলো। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ মূল্য পরিস্থিতিলे রীতিমতো ভয়াবহ করে তুলেছে। যাদের আয় ৫০০০ হাজার থেকে ১৫০০০ টাকার মধ্যে তাদের পক্ষে বাসা ভাড়াসহ প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য কেনাও অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এর উপর আছে সংসারের অন্যান্য খরচ। করোনা ও অন্যান্য কারণে অনেকের চাকরি চকে গেছে, আবার অনেকের আয়-রোজগার আগের চেয়ে কমেছে। তাদের কিভাবে দিন কাটছে কল্পনাও করা যায় না।

বর্তমানে আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা ভোজ্য তেল নিয়ে যা করছেন তা শুধু দুঃখজনকই নয়, বরং লজাক্ষরও বটে। তারা লক্ষ লক্ষ টন ভোজ্য তেল গুদামে লুকিয়ে রেখে বাজারে তেলের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে তেল বিক্রি করছেন। ভার্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে ব্যবসায়ীদের গুদাম থেকে লুকিয়ে রাখা তেল বের করে আনছে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের জরিমানা করছে। এসব ব্যবসায়ীদের মধ্যে যদি নৈতিকতাবোধ অথবা মনুষ্যত্ব থাকত, তাহলে তারা মুনাফা লুঠার জন্য এহেন জঘন্য কাজ করতে পারতেন না। এক কথায়, ব্যবসায়ীরা ব্যবসার নামে জনগণকে শোষণ করছে।

পণ্যদ্রব্যের বাজারের উপরই সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। বাজারের নিয়ন্ত্রণ বরাবরই ব্যবসায়ীদের হাতে। সরকার পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ লরে দিলেও কিছু কিছু অসাধু ও বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন ব্যবসায়ীরা এসব বাজারের উপর আধিপত্য বিস্তার করছে। চাল, ডাল, তেল, চিনি, আটা থেকে শুরু করে নিয়ত্যপ্রয়োজনীয় এমন কোনো পণ্যদ্রব্য নেই যার মূল্য বাড়েনি।

সয়াবিন তেলের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, সয়াবিন তেলের মূল্য সরকার নির্ধারণ করে দিলেও ব্যবসায়ীর ইচ্ছেমতো দফায় দফায় দাম বাড়িয়েছে। সরকার মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়ার ফলে খুচরা বিক্রেতারা খোলা তেল বিক্রি করা বন্ধ করে দিয়েছে। সরকার সয়াবিন তেলের উপর আমদানি ভ্যাটমুক করে দিয়েছে। কিন্তু বাজারে এর প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করতে গিয়ে ব্যবসায়ীরা অনেক সময় আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধির দোহাই দেন। কিন্তু তারা আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সামঞ্জস্য না রেখে বরং আরো কয়েকগুণ বেশি মূল্য বৃষ্টি করেন। আবার আন্তর্জাতিক বাজারে জিনিসপত্রের দাম কমলেও আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা সহজে জিনিসপত্রের দাম কমাতে চান না। ব্যবসায়ীরা নানা প্রকার চল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে বর্ষিত মূল্য বহাল রাখার চেষ্টা করেন। এতে করে নিম্নবর্গের সাধারণ জনগণকেই এসব দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

হানা দেয় মরণঘাতী  
করে তার আয়-রোজগার

যেতে না যেতেই শুরু হয়  
যেখানে পরিবারের  
তুলে দিতে হিমসিম খাচ্ছে  
রিঙ্গাচালক, দিনমজুর  
মানুষ। সেখানে এইভাবে  
থাকা পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা  
অসম্ভব। নিয়ত্যপ্রয়োজনীয়  
বাড়েনি নিম্নস্তরের  
এরকম শান্ত মিয়ার মতো  
সংখ্যা কতো তার নিদিষ্ট

যে শুধু শোচনীয় তা  
দিশেহারা অবস্থায় পতিত  
হয়েছে। করোনা অবস্থায় পতিত  
হয়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেন  
যুদ্ধ মূল্য পরিস্থিতিলে  
রীতিমতো ভয়াবহ করে তুলেছে।  
যাদের আয় ৫০০০ হাজার থেকে  
১৫০০০ টাকার মধ্যে তাদের পক্ষে  
বাসা ভাড়াসহ প্রয়োজনীয়  
খাদ্যপণ্য কেনাও অসম্ভব হয়ে  
উঠেছে। এর উপর আছে  
সংসারের অন্যান্য খরচ।  
কারণে অনেকের চাকরি চকে  
গেছে, আবার অনেকের আগের  
চেয়ে কমেছে। তাদের কিভাবে  
দিন কাটছে কল্পনাও করা যায়



জমি, ঘরবাড়ি সব বন্যার পানিতে ঢুবে গেছে। যেখানে এসব এলাকাতে বন্যাদুর্গত মানুষদের বসতি ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণ করা কষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেখানে তাদের পক্ষে উচ্চ মূল্যে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করা সাধ্যের বাহিরে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির যেসব কারণ রয়েছে তার মধ্যে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, সরবরাহ ব্যবস্থা, চাহিদার উঠানামা ও আমদানি রঙানি ব্যয়। আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য শস্য ও খাদ্যসামগ্রী। এখন ভরা মৌসুম। আমাদের দেশে খাদ্যসশ্যের দাম বাড়ানোর কোনো যৌক্তিকতা নেই।

ক্রয়মূল্যের কারণ হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়ানোর কথা বলা হয়। কিন্তু শাকসবজি সহ অন্যান্য দেশজ দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির কোনো যৌক্তিকতা নেই বলে মনে করি।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), পিপিআরসি ও সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম)-এর গবেষণা ও জরিপে দেখা গেছে, করোনাকালে দেশে দারিদ্রের সংখ্যা বেড়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায়। তাদের মতে, দারিদ্র্যের এই হার করোনাপূর্ব ২১ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪১ শতাংশ হয়েছে। যদিও সরকার বারবারই বলছে, এ হার অনেক কম। কিন্তু সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরোর (বিবিএস) কাছে এর সমর্থনে কোনো তথ্য নেই। ২০২০ সালের অক্টোবরের বিবিএস-এর এক জরিপে দেখা যায়, বাংলাদেশের মানুষের আয় ২০ শতাংশ কমে গেছে। একদিকে আয় কমেছে ২০ শতাংশ, অপরদিকে ব্যয় বেড়েছে ৩৬ শতাংশ। তার মানে হলো, ১০০ টাকার আয় কমে ৮০ টাকা হয়েছে আর ১০০ টাকার ব্যয় বেড়ে ১৩৬ টাকা হয়েছে। আয়-ব্যয়ের ব্যবধান হলো ৫৬ শতাংশ। এ বিশাল ঘাটতি মেটানোর উপায় সাধারণ মানুষের জানা আছে কি?

করোনা ভাইরাসের মহামারীর কারণে অনেক চাকরিজীবী মানুষ চাকরি হারিয়েছেন। আবার যাদের চাকরি আছে তাদের মাসের শুরুতে বেতন বৃদ্ধি করা হয় না। তাহলে বাড়তি এই টাকা কোথায় থেকে পাবে? সর্বশেষ হিসাবে দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় এখন ২ হাজার ৫৯১ ডলার। অর্থাৎ, ৮৭ টাকা ডলার ধরলে ২ লাখ ২৫ হাজার ৪১৭ টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় ছিল ২ হাজার ২২৭ ডলার। তারপর মাথাপিছু আয় বেড়েছে আরও ৩২৭ ডলার, হয়েছিল ২৫৫৪ ডলার। এখন আরও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫৯১ ডলার এবং ভবিষ্যতে বাড়বে কিন্তু প্রশ্ন হলো একজন কৃষকের কি আয় বেড়েছে? শ্রমিকদের কি আয় বেড়েছে? নিম্নবিভেদের কি আয় বেড়েছে? প্রশ্নের উত্তরগুলো প্রত্যেকটি সচেতন জনগণ জানেন। তবে আয় কী?

মহামারি করোনা এরই মধ্যে আমাদের অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে, আমাদের অনেককে নিঃস্ব করে দিয়েছে। কমবেশি সবার মধ্যেই পড়েছে এর নেগেটিভ প্রভাব। অনেকে সবকিছু হারিয়ে অর্থকষ্টে দিনযাপন করছে। অন্তত সাধারণ জনগণের কথা ভেবে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলোর যেন ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করা হয় এবং তা যেন সবার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। সহনশীল মাত্রায় মূল্য নির্ধারণের জন্য বাজার নিয়ন্ত্রণকারীদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও ব্যবস্থা নিতে হবে। বিভিন্ন অজুহাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মূল চক্রের বিরুদ্ধে আমাদের বিবেককে জাগ্রত করি। সাধারণ মানুষের কথা ভেবে তাদের পাশে দাঁড়াই। কোনো অজুহাতে কেউ যেন কখনও ইচ্ছেমতো কোনো জিনিসের দাম বাড়াতে না পারে, সেদিকে দৃষ্টি দেই।

লেখকঃ

প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক,

বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, ঢাকা কলেজ

প্রকাশ তথ্যঃ

পত্রিকাঃ আজকালের খবর।

তারিখঃ ০২ জুন ২০২২।



# Turkey's equation in Ukraine-Russia conflict

M. Athar Noor

In almost every corner and region of the world, the claws of domination are spreading in different forms and in different ways. At a glance, these marginal and regional hegemonic interests are intertwined with regional and global issues. And around the problems, various crises are being created in the world from age to age. The crisis in the world will be discussed and its solution will be the religion Russia's recent hundreds of troops along der has raised international resumption of the "Ukraine

of world politics. deployment of thousands of Ukraine's bor-suspicious in politics about a hostilities over crisis."



After the fall of government in Russia invaded and occupied and Russia fire agreement 2015 in the us, mediated by France and Germany to end the conflict. Relations between the two countries have been strained recently as a result of renewed Russian military mobilization on the Ukrainian border. Amid tensions between Russia and the United States over Ukraine, Turkish President Recep Tayyip Erdogan has expressed a desire to mediate in the ongoing dispute.

For this purpose, Erdogan has already completed a significant visit to Kiev (the capital of Ukraine) on Thursday at the invitation of Ukrainian President Volodymyr Zelensky. There, 6 important agreements were signed between the two countries. Among them are the duty-free trade agreement and the agreement on Turkey's drone production in Ukraine. It remains to be seen how Russia will deal with the new drone production in Ukraine. Meanwhile, the United States is quite satisfied with Erdogan's visit to Ukraine. Erdogan also hopes that the US attitude towards Turkey may change now. Because, Ankara's position is gaining importance in the competition of the big powers in one way or another. Also significant are Turkey's role in the Black Sea region, Ankara and Washington's shared interests in Ukraine, Iraq and Libya.

Omar Ozkizilchik, a researcher at the Ankara-based Foundation for Political, Economic and Social Research, says a comprehensive dialogue is essential to the Ukraine crisis. But everything depends on the goodwill of Russia. Therefore, all parties should focus on diplomatic talks rather than the military situation in the region. President Erdogan's visit to Kiev is based on his support for Ukraine's territorial integrity and sovereignty. Turkish president's offer of mediation to resolve the crisis has become a real challenge. It can be said that Erdogan's government will work impartially to resolve the conflict. Thus, Turkey has the experience and strength to work for the

restoration of regional peace.

The question is elsewhere, Ankara refused to accept Russia's occupation of Crimea in 2014, and since then Turkey has avoided any dispute with Russia over Ukraine. But suddenly Turkey: Why is it trying so hard to avoid war in the Ukraine crisis, and what is the secret behind President Erdogan's race for mediation in resolving the conflict? If war breaks out Turkey will face one of the worst tests in the history. You can't be neutral, you can't fight for either side. That means it will not be able to go against Russia, nor will it be able to stay away from Ukraine.

If Turkey takes a direct stand against Russia, then Russia will trap Turkey again in the old fashioned way. Russia could, for example, attack Turkish troops or Turkish-backed forces in Syria and Libya. In addition to suspending or canceling various important military agreements, Russia will seek to do great harm to the economic sector by imposing travel bans on tourists in Turkey. And these are capable of throwing Erdogan into extreme disarray inside the country. For these reasons, Turkey does not want any war to take place around this crisis. Turkey, on the other hand, has a dynamic military relationship with Ukraine, particularly over the supply of drones to the country. There are also ongoing projects to bring in various military industries and important engines. There is already a gap between Turkey and the Ukrainian-backed United States and the European Union.

Despite being a member of NATO, Turkey has maintained a strategic position in international politics through its own influence and power. Erdogan's efforts to establish a strategic autonomy by developing an independent defence industry have not been well received by the rest of NATO's powers. Therefore, the traditional relations of the western countries with Turkey are getting weaker and weaker. Therefore, if Turkey is on the side of America in the Ukraine issue, then the ongoing enmity between them will decrease. This is a great opportunity to normalize the relationship. Erdogan-led Turkey has built parallel relations with the Russia-China axis. On the other hand, the United States and European countries prefer to move forward with the conviction to restore the damaged relations. Erdogan's innovation has increased Turkey's acceptance in international politics due to its foreign strategy.

Therefore, in order for President Erdogan to accelerate Turkey's ongoing efforts to build a positive and balanced relationship in the international arena and to brighten its future in the international arena, it is important that Erdogan's role as mediator be successful. Now it remains to be seen how President Erdogan will resolve this conflict through dialogue peacefully and on the basis of international law, and how it brightens Turkey's image in the world.

Writer,

Student

Department of International Relations, University of Chittagong, Bangladesh

Date: 10-2-2022

Name of Newspaper: The daily observer



# অনশন ও ছাত্র আন্দোলন

## শাহ মোঃ আশরাফুল ইসলাম

মানুষের সামাজিকীকরণে পরিবার সর্প্রথম প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিকীকরণ শিক্ষায় সর্বাধিক দায়িত্ব ও অবদান পরিবারের। এরপরই আসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও শিক্ষার্থীদের একটি পরিবার যেখানে শিক্ষকরা থাকেন পিত্ত-মাতৃত্বল্য। শিক্ষকরা শিক্ষা দেন নৈতিক ও আদর্শ মানুষ হওয়ার। কিন্তু সেই শিক্ষক যখন নৈতিকতার অবক্ষয় করে তখন আমরা কার কাছ থেকে নৈতিকতা শিক্ষার বরাট করতে পারি? কার কাছ থেকেই বা দেশের সেবায় বৃত্তি হওয়ার শিক্ষা আশা করতে পারি? দেশের একটি শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকগন যখন নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে নিজেদের আচার-ব্যবহারেই অনৈতিকতা চর্চা করেন তখন সেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেশ ও জনগণের কল্যাণের কাঙারি কীভাবে তৈরি হবে? একটি বিশ্ববিদ্যালয় একটি দেশের ইতিহাস- ঐতিহ্য সংস্কৃতির ধারক যেখানে সারাদেশ থেকে ছাত্র-ছাত্রীর আসে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশের কল্যাণে নিজেকে অর্পণ করতে। কিন্তু সম্প্রতি দেশের অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রথম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হলো শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

সেই প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত সাধারণ একটি সমস্যা নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে পরম্পর বিরোধী অবস্থানে। যে সমস্যার সমাধান হতে পারত কেবল একটা মিটিংয়ে সেই সমস্যা এখন ২৪ টি তাজা প্রাণ হাড়িয়ে যাবার কারণ হতে চলেছে।

ছাত্র-ছাত্রীরা কখনও চায় না তাদের শিক্ষকদের সাথে সম্পর্ক টানাপোড়ন হোক, হয়তো শিক্ষকরাও চান না শিক্ষার্থীদেরকে তাদের

থেকে দূরে ঠেলে

দিতে তবুও এক

অদ্র্শ্য বাঁধায়

আবদ্ধ তারা। এই

বিশ্ববিদ্যালয়

এই এ মনিতে ই

আবাসন সঙ্কট

রয়েছে প্রচুর।

মেয়েদের

জন্য কেবল

দুটি হল বরাদ্দ

রাখা হয়েছে।

এছাড়া অন্য

ছাত্রীরা থাকেন

বিশ্ববিদ্যালয়

কর্তৃক ভাড়া

নেওয়া বাড়িতে

অথবা নিজেদের

ব্যবস্থা করে।

ভাড়া নেওয়া

বাড়ি গুলোর

অ ব স্থা ও

যাঁচ্ছ তাই।

কোনোটিতে

পানির সমস্যা

কোনোটিতে এক

রংমে অতিরিক্ত

মানুষ থাকতে

গিয়ে পড়াশুনার

ব্যবস্থা থাকছে

না। এসব

অব্যবস্থাপনার

মধ্যেও ছাত্রীরা

কিছু বলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়



ক্যাম্পাসে অবস্থিত দুটি ছাত্রী হলেও ইন্টারনেট, পানি, খাবারের মানসহ নানা অব্যবস্থাপনায় জর্জিত দীর্ঘদিনযাবৎ কিন্তু এগুলো নিরসনের কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। কিন্তু মানুষের যে মৌলিক চাহিদা, মৌলিক অধিকার সেসবের অব্যবস্থাপনা প্রথম ছাত্রী হলের তুলনায় দ্বিতীয় ছাত্রী হল বেগম সিরাজুল্লেখা চৌধুরী হলে বেশিই ছিলো। কখনও অসুস্থ মেয়েকে দেখতে এসে ঢুকতে না পেরে ফিরে যান মা কখনও বৃষ্টি ভেজা শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় হল গেইটের বাহিরে। দাঁড়োয়ানকে অনেক অনুনয়-বিনয় করলেও সে উপর থেকে হুকুম না আসা পর্যন্ত নড়েন না অতঃপর ছাত্রী ফোন করে ম্যামের সাথে কথা বললে এই কাকভেজা শরীরে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটিকেও গালাগালি করেন। অবশেষে নিরূপায় হয়ে সেসব সমস্যা নিয়ে হলের ছাত্রীরা ১৩ তারিখ রাতে আলোচনায় বসে এবং প্রাধ্যক্ষ মহোদয়কে কিছুক্ষণের জন্য আসতে অনুরোধ করেন। তিনি হয়তো কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলেন কিংবা কোনো অসুবিধার কারণে আসতে অপারণ হন। তাই তাকে কমিটি থেকে উনার পক্ষে একজন প্রতিনিধি পাঠানোর কথা বলা হয় তাও তিনি পাঠাননি, তাদের কোনো আশ্বাসও দেননি যে তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন। উপরন্তু এর প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, “তোমরা তো কেউ মরে যাওনি আমায় এত বিরক্ত করছো কেন?” এভাবে একের পর এক দুর্ব্যবহারে ছাত্রীরা অতিষ্ঠ হয়েই এক পর্যায়ে ম্যামকে বলেন আপনি যদি আমাদের কাছে না আসেন তবে আমরা হলে থেকে বের হয়ে আন্দোলন করবো। এমন নাজুক অবস্থায়ও প্রাধ্যক্ষ বলেন, “যাও তোমরা, তোমাদের যদি লজ্জা থাকে তো আর ফিরবে না হোস্টেলে আমার এত ঠাকুর নাই।” অবশেষে প্রথম ও দ্বিতীয় ছাত্রী হলের ছাত্রীরা একত্রিত হয়ে গত ১৩ তারিখ বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে হল ত্যাগ করে আন্দোলন শুরু করেন। যে আন্দোলনের দায়ী ছিলো তিনটি: প্রথমত, হলের প্রভোস্ট জাফরিন আহমেদ লিজা এবং সেই কমিটির

পদত্যাগ দ্বিতীয়ত, হলের সার্বিক অব্যবস্থাপনা দূর করা এবং তৃতীয়ত, দ্রুত নতুন প্রভোষ্ট কমিটি নিয়োগ দেওয়া। এসব দাবি নিয়ে তারা উপাচার্যের সাথে আলোচনায় বসলেও তিনি তাদের সন্তুষ্ট করতে পারেননি। তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবার ঘোষণা দেন তাদের সাথে অনেক ছাত্রাও সংহতি প্রকাশ করে তাদের সাথে আন্দোলনে যোগ দেন। এক পর্যায়ে ১৫ তারিখ সন্ধ্যায় প্রশাসনের নির্দেশে উগ্রবাদী কিছু ছাত্র সেই আন্দোলনকারীদের উপর হামলা করে এবং মেয়ে শিক্ষার্থীদের হেনস্টা করে যার প্রেক্ষিতে সাময়িকভাবে আন্দোলনকারীদের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি হলেও তাঁরা দমে যাননি। পরবর্তীতে আন্দোলন আরও বেগবান হয়। তবুও প্রশাসন তাদের দাবি মেনে নিতে পারেন বা কোনো আশ্঵াসও দিয়েও তাদের ঘরে ফেরাতে ব্যর্থ হোন। ১৬ তারিখও সারাদিন শান্তিপূর্ণভাবে দ্বিতীয় উৎসাহ-উদ্বৃত্তি নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যায় শিক্ষার্থীরা। একপর্যায়ে কোনো সিদ্ধান্ত বা আশানুরূপ ফল আসছে না দেখে তারা নিরপায় হয়ে দুপুরের দিকে উপাচার্য ফরিদ উদ্দীন আহমেদের সিঙ্কেট মিটিংয়ে যাওয়ার সময় তাকে অবরোধ করে রাখা হয় এম এ ওয়াজেদ মির্যা বিস্তৃত এবং আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বলেন যে সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত তাকে অবরোধ করে রাখা হবে। তবুও তিনি কোনো সিদ্ধান্ত দিতে অপারণ এবং তাকে উদ্বারের জন্য তখনই পুলিশ প্রশাসনের ব্যবস্থা নেন তিনি। কিন্তু কী এমন কারণ যার জন্য তিনি এই ছেটি সিদ্ধান্তটা নেওয়ার বদলে শিক্ষার্থীদেরকে এভাবে আতঙ্কের মুখে ছুড়ে দিতে চান! ? কৌসের তাগিদে বা কৌসের ভয়ে তিনি পুলিশি পাহাড়ার ব্যবস্থা করান। অথচ এই যেখানে একটা ঘোষণা হতে পারে সব সমস্যার সমাধান। কিছুক্ষণ সময় পুলিশ আন্দোলনকারীদের চারপাশে নিরব অবস্থান করলেও সন্ধ্যার দিকে শুরু হয়ে তাদের আগ্রাসী আক্রমণ। যা নিশ্চিতভাবে এ্যাবৎকালে দেশে ঘটে যাওয়া সবথেকে নিন্দনীয় ও বর্বর হামলা। একপর্যায়ে পুলিশের লাটিচার্য থেকে নিজেদের রক্ষা করতে শিক্ষার্থীরা পুলিশকে প্রতিহত করার চেষ্টা করলে পুলিশ একের পর এক সাউন্ড গ্রেনেড ও গুলি ছুড়ে যাতে আহত হয় ৩০ এর অধিক শিক্ষার্থীসহ ৫০ এর অধিক মানুষ। পুরো দেশ আতঙ্কিত হয়ে যায়, কেউ ভাবতেও পারেনি দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠের একজন সর্বোচ্চ অভিভাবক তার শিক্ষার্থীদের উপর এভাবে আক্রমণ করাতে পারে। এই হামলার পরে পরদিন দুপুর ১২টার পূর্বে হল ছাড়ার নির্দেশ দেন তিনি কিন্তু এমন বর্বর উপাচার্যের অধীনে কোনো শিক্ষার্থী নিরাপদ নয় বলে সাধারণ ছাত্রজনতা এক সুরে আন্দোলন করছে এই উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে। উপরন্তু তার নিকট মানসিকতার উদাহরণস্বরূপ বলা যায় জাবি ছাত্রীদের নিয়ে মন্তব্য এবং তার নেই কোনো গবেষণা, নেই কোনো পিএইচডি ডিগ্রী, একাডেমিক সার্টিফিকেটের সাফল্যেও বলে না যে সে উপাচার্য পদের যোগ্য। এমন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একজন অযোগ্য উপাচার্য থাকলে দেশের জন্য কল্যাণকামী মানুষ কীভাবে তৈরি হবে? তাই ১৬ তারিখ রাত থেকেই সকল ছাত্র তার পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন করছে ১৭ তারিখও এই আগ্রাসী ব্যক্তি বিশাল বিশাল জলকামান, পুলিশ ফোর্সের আয়োজন করেন আন্দোলনকারীদের দমন করতে। অবশেষে সরকারের হস্তক্ষেপে এ যাত্রায় বাঁচি আমরা। একের পর এক কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছি আমরা। ১৯ তারিখ দুপুর থেকে আমাদের ২৪ জন ভাই-বোন অনশনে বসেন। নিজেদের জীবন বাজি রেখে তারা আমাদেরকে এই বর্বরতা থেকে উদ্বার করতে প্রতিজ্ঞ হয়েছেন। তারা আমাদের গর্ব, তারা আমাদের ভাই-বোন। ২৪ টা তাজা প্রাণ, দেশের ভবিষ্যৎ কাঞ্চির এখন মৃত্যুর বুঁকি নিয়ে লড়ছে। তাদের একজন হাতজোড় করে শিক্ষকদের কাছে বলছেন, ”আর পারছি না।” একজন প্ল্যাকার্ড লিখে দিচ্ছেন যে,” যে উপাচার্য আপনাদের সন্তানদের মারছে তার পদত্যাগ চান কিনা?”

এসব প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষকরা কেবল নিরব দর্শকের ভূমিকাই পালন করছেন। একজন অনশনরত আপুর অবস্থা খারাপ হলে তাকে অনশন ভাঙ্গতে বলা হলে তিনি বলেন, “আমি আমরণ অনশনে এসেছি, খেতে আসিনি।” আর কত রক্ত জড়ানো লাগবে? আর কতদিন না খেয়ে রাস্তায় পরে থাকবে ওরা? এবার তো একটু সদয় হোন! বুক ফেঁটে চোচিড় হয়ে যাচ্ছে আর কত ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে খোদা? এবার সদয় হও!

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

প্রকাশ তথ্যঃ  
পত্রিকাঃ মানবকর্তৃ।  
তারিখঃ ৩০ জানুয়ারি ২০২২।



# বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবন্ধ প্রয়াস

## মোহাম্মদ এনামুল হক ফজলে রাবী

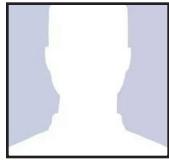
একটি যুদ্ধবিহীন বিশ্ব প্রতিষ্ঠার (যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই স্লোগানে) লক্ষ্যে ১৯৮১ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত নম্বর ৩৬/৬৭ প্রস্তাব অনুসারে প্রতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসের ‘তৃতীয় মঙ্গলবার’ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার দিনটিকে ‘আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরে ২০০১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত ৫৫/২৮২ নম্বর প্রস্তাব অনুসারে ২০০২ সাল থেকে প্রতি বছরের ২১ সেপ্টেম্বর ‘আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস’ হিসেবে উদ্যাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ‘আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস’ উপলক্ষ্যে প্রথমে জাতিসংঘের মহাসচিব ‘শান্তির ঘন্টা’ বাজান এবং বিশেষ বাণী প্রদান করেন। এরপর থেকে জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত বিশ্বের সব দেশ ও সংঘান্তক কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশেও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। ২০০৭ সালে জাতিসংঘের তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল বান কি মুন এই দিনে ২৪ ঘণ্টার জন্য সারা পৃথিবীতে সব রকমের অশান্তিমূলক কাজ বন্ধ রাখার ডাক দেন এবং এই দিন উপলক্ষ্যে প্রতিটি দেশকে দুই মিনিটের নীরবতা পালন করার আর্জি করেন। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলা, ভবিষ্যত্ব প্রজন্মকে সুরক্ষা দেওয়া এবং অশান্তি থেকে দূরে রাখার জন্য অঙ্গীকার নেওয়া হয়। এই দিন উদ্যাপনের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো শান্তি বজায় রাখা, প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা, একে অপরের প্রতি বিশ্বাস এবং সহনশীল মনোভাব গড়ে তোলা ইত্যাদি।

দিবসটির সূচনালগ্নে এই সুবিশাল বসুন্ধরার কোণে কোণে নিপীড়িত ও নির্যাতিত জাতিরা একটি সবুজ স্বপ্ন দেখেছিল, সোনালি আশায় বুক বেঁধেছিল যে, আজ থেকে পৃথিবীর বুক থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নিতে চলেছে অন্যায়-অবিচার, মিটতে চলেছে ধর্ম আর বর্গের বিদ্বেষ, ঘুচে যাবে ধনী-গরিবের ব্যবধান, মুচে যাবে ক্ষমতার দাস্তিকতা আর আধিপত্যবাদের দাপট, থেমে যাবে সংঘাত আর হানাহানি, ভুলে যাবে যুদ্ধ-বিদ্রোহ, তালা পড়বে অন্ত উৎপাদনকারী সংস্থাগুলোতে। এর পরিবর্তে শান্তির আজস্র ধারা প্রবাহিত হবে, বহু কাঙ্কিত সুখ-শান্তিতে পৃথিবী ভরপুর হয়ে উঠবে, প্রতিষ্ঠিত হবে বহুপ্রত্যাশিত শান্তি ও সম্প্রীতি, স্থাপিত হবে বিভিন্ন জাতি-ধর্মের মানুষের মধ্যে হৃদ্যতা ও সৌহার্দ, গড়ে উঠবে একটি নিরাপদ, সংঘাতমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ পৃথিবী। অথচ আজকের পৃথিবী সংঘাত ও অশান্তিতে পরিপূর্ণ। উৎপীড়িতের ক্রমন-রোলে ভারাক্রান্ত হচ্ছে আকাশ-বাতাস। মা ও শিশুদের আর্তনাদে ফেটে যাচ্ছে পৃথিবীর বুক। বিশেষ করে ফিলিস্তিন, সিরিয়া, ইরাক, লেবানন, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশে অশান্তির উত্তাল তরঙ্গ শান্তির স্বপ্নকে ভেঙেচুরে চুরমার করে দিয়েছে। সেখানে শান্তি একটা দিবাস্পপ ছাড়া আর কী হতে পারে?

বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি নানা কারণেই স্বাভাবিক নয়। বছরটি শুরু হয়েছে আমাদের জীবনের জন্য এক হৃদকি মহামারির মধ্য দিয়ে। বিশ্ব সম্প্রদায় একটি অভিন্ন শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছে, যা অদৃশ্য এবং বিশে এমন কোনো শক্তিশালী অন্ত নেই, যা একে ধ্বংস করতে সক্ষম। সমগ্র পৃথিবীটাই কোভিড-১৯ নামের এমন এক ভয়াবহ শক্তির মুখোমুখি, যা মানবসভ্যতার ইতিহাসে বিরল। আমরা উন্নয়নশীল দেশের জনগণই শুধু নই, উন্নত দেশের জনগণও কমবেশি একই ঝুঁকিতে রয়েছে। তবে এ কথা বলা যাবে না, পৃথিবীতে কোনো যুদ্ধবিহু নেই, যদিও জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস সব যুদ্ধের দেশকে তাদের অন্তর্শন্ত্র রেখে বর্তমান বৈশ্বিক মহামারির বিরুদ্ধে যুদ্ধে মনোনিবেশ করার আহ্বান জানিয়েছেন। এ কথা সত্যি, মহাসচিব মহোদয় যুদ্ধের দেশগুলোকে উদ্দেশ্য করেই ঐ কথা বলেছেন। কিন্তু এ আহ্বান সবার জন্য। বিশ্বসম্প্রদায়কে ঐক্যবন্ধ হয়ে এই মহামারির বিরুদ্ধে অবশ্যই একসঙ্গে লড়তে হবে। ঐক্যবন্ধভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে বিশ্বশান্তি ও সম্প্রীতি। সারা বিশ্বের অনুমত, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিশ্বে কাঙ্কিত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এটাই প্রত্যাশা।

লেখক :শিক্ষার্থী,  
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম

প্রকাশ তথ্যঃ  
পত্রিকাঃ ইতেফাক।  
তারিখঃ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১।



# বঙ্গবন্ধুর অবদান বাংলার স্বাধীনতা হামিদা আক্ষাসী

২৫ শে মার্চ কে কালো রাত্রি বলা হয়। কেননা এই রাত্রিতে অসংখ্য সাধারণ বাঙালি, বুদ্ধিজীবী, কলামিস্ট, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং পরিচয় না জানা প্রায় ৫০ হাজার ঘুমন্ত বাঙালিদের নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। তারা চেয়েছিল বাংলাদেশকে মানুষ, জ্ঞান ও মেধার দিকে দিয়ে নির্মূল করে দিতে। কিন্তু এ কাজে যে তারা ব্যর্থ হয়েছে আজকে আমাদের বাংলার স্বাধীনতা তার প্রমাণ বহন করে। আর স্বাধীন হবেই না কেন! যে জাতির বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো আধ্যাত্মিক নেতা আছে, সে জাতি হেরে যেতে পারেনা। বিশ্ব ইতিহাসের ঘৃণ্যতম ও তমসাচ্ছন্ন এক অধ্যায় ২৫ মার্চের মর্মান্তিক গণহত্যার দিনটি মুক্তিযুদ্ধের ৪৬ বছর পর ২০১৭ সাল থেকে ‘জাতীয় গণহত্যা দিবস’ হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। সেইসঙ্গে দিনটিকে আন্তর্জাতিকভাবে ‘গণহত্যা দিবস’ হিসেবে পালনের দাবিও অব্যাহত রয়েছে। পঁচিশ মার্চের ভয়াল রাতে গণহত্যার নীলনকশা ‘অপারেশন সার্চলাইট’ বাস্তবায়নে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মেতে উঠেছিল বাঙালি নিধনযজ্ঞে। অন্যদিকে এই নিষ্ঠুরতা ও নির্মতার বিকল্পে অসম সাহসী বাঙালিরা প্রতিরোধ গড়ে তুলে মুক্তিযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটে। পাকিস্তানি সেনাদের হাতে গ্রেপ্তারের আগমুহূর্তে ২৬ শে মার্চের প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। শুরু হয় বাঙালির সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম। জাতির অস্তিত্ব রক্ষার এ লড়াইয়ের ধারাবাহিকতায় ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আর ৩০ লাখ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর জন্ম নেয় স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। যদি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক না দিতেন, তখন কি হতো! বাঙালি কি স্বাধীন হওয়ার জন্য যুদ্ধে বাঁপিয়ে পড়তো! কোনো কিছু অর্জন করতে হলে সাহস, মনোবল ও উদ্দীপনা দরকার। বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণে যুদ্ধে লড়াই করার মনোবল ও সাহস পেয়েছিল। তিনি যখন ৭ ই মার্চে ভাষণ দিলেন সেই ভাষণ বাঙালি জাতি তাদের মননে গেঁথে নিয়েছিল। তারপর তিনি যখন ২৬ শে মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন বাঙালিরা আর থেমে থাকেনি। একটি ঘোষণা তাঁদেরকে স্বাধীনতার জন্য, পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য প্রাণপণে লড়াই করায় উদ্বৃক্ষ করেছিল। সেদিন ঘোষণা কি ছিল, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এর মূল্যায়ন হয়েছিল কেমন কয়েকটি সংবাদ মাধ্যম পাঠ করলেই বোধগম্য হবে। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা যায়, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের ঢাকার পরিস্থিতি ও শেখ মুজিবকে আটক ও স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদানের ঘটনা ২৭শে মার্চেই বিশ্বের অন্তত ২৫টি দেশের পত্রিকা বা সংবাদ সংস্কার খবরে প্রকাশিত হয়। ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা: ফ্যাক্টস অ্যান্ড উইটনেস (আফ.ম সাইন্ড)’ বইতে স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে বিদেশী সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্টের একটি সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে।

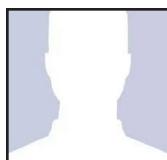
ওই সংকলন অনুযায়ী বিবিসির খবরে তখন বলা হয়েছে,  
“কলকাতা থেকে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের খবরে প্রকাশ যে পূর্ব পাকিস্তানের নেতা শেখ  
মুজিবুর রহমান এক গুপ্ত বেতার থেকে জনসাধারণের কাছে প্রতিরোধের ডাক দিয়েছেন।”  
ভয়েস অব আমেরিকার খবরে বলা হয়েছিলো:  
“ঢাকায় পাকিস্তান বাহিনী আক্রমণ শুরু করেছে। মুজিবুর রহমান একটি  
বার্তা পাঠ্যেছেন এবং সারা বিশ্বের নিকট সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।”

দিল্লির দি স্টেটসম্যানের খবর ছিলো: “বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে, সামরিক অভিযানের প্রতিবাদে রহমানের পদক্ষেপ। একটি গোপন বেতার থেকে প্রচারিত ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের পূর্বাংশকে স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে নতুন নামকরণ করেছেন।” দি ডেইলি টেলিগ্রাফ, লন্ডন: ২৭শে মার্চ দি ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় ‘সিভিল ওয়ার ফ্লেয়ারস ইন ইষ্ট পাকিস্তান: শেখ এ ট্রেইন্ট, সেইস প্রেসিডেন্টশিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীন ঘোষণা ও ইয়াহিয়া খান তার বেতার ভাষণে শেখ মুজিবকে বিশাস্থাতক বলার কথা উল্লেখ করা হয়। দি গার্ডিয়ান: গার্ডিয়ানের ২৭শে মার্চ সংখ্যায় এক খবরে বলা হয়, “২৬শে মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতির উদ্দেশ্যে রেডিওতে ভাষণ দেয়ার পরপরই দি ভয়েস অব বাংলাদেশ নামে একটি গোপন বেতারকেন্দ্রথেকে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করাহয়েছে। তাঁর এই ঘোষণাপ্রাপ্ত এক ব্যক্তি পাঠকেন।” এর বাইরে ভারতের বহু সংবাদপত্র এবং আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ক্যানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, জাপান, হংকং, নরওয়ে, তুরস্ক, সিঙ্গাপুরসহ অনেক দেশের খবরে স্থান পায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার খবর। আর্জেন্টিনার বুয়েনস আয়ারস হেরোল্ডের ২৭শে মার্চের সংখ্যার একটি খবরের শিরোনাম ছিলো, “বেঙ্গলি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডিক্লেয়ার্ড বাই মুজিব।” ৭ই মার্চের এই ভাষণের পরই বোৰা যাচ্ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি কোন দিকে এগুচ্ছে। নিউইয়র্ক টাইমসেও শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার ছবি ছাপানো হয়েছিলো। পাশেই বলা হয়েছে ‘স্বাধীনতা ঘোষণার পর শেখ মুজিব আটক’ বার্তা সংস্থা এপিএ একটি খবরে বলা হয়, “ইয়াহিয়া খান পুনরায় মার্শাল ল দেয়া ও আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার পর পূর্ব পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে।” আয়ারল্যান্ডের দি আইরিশ টাইমসের শিরোনাম ছিলো - পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা আর সাথে ছিলো শেখ মুজিবের ছবি। দিল্লি থেকে রয়টার্সের খবরে ১০ হাজার মানুষের নিহত হবার ও স্বাধীনতা ঘোষণার পর মুজিবকে সন্তুষ্ট আটক করা হয়েছে, এমন কথা বলা হয়। ব্যাংকক পোস্টের খবরে বলা হয়, “শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ নাম দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণার পর পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।”

উপরিউক্ত সংবাদমাধ্যমের পর্যালোচনা থেকে জানা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন ২৬ শে মার্চ প্রথম প্রহরেই। তারপর বাকিটা সবার জানা, বাঙালিরা টানা নয় মাস যুদ্ধের মধ্যদিয়ে দিন অতিবাহিত করে ১৬ ই ডিসেম্বর ছৃঢ়ান্ত বিজয় নিশ্চিত করে। বাঙালি জাতির পিতা স্বাধীনতার ঘোষক স্বসম্মানে স্বশরীরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। আজো বাঙালিরা এই দিনটিকে 'স্বদেশ প্রত্যাবর্তন' দিবস' হিসেবে উদযাপন করে। নিঃসন্দেহে বাঙালি জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার পেছনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান অসামান্য ও অতুলনীয় ছিল। স্বাধীনতার পথগুলি বছরে এই মহান ব্যক্তিকে স্মরণ করছি শ্রদ্ধাসহকারে। তিনি আজীবন দেশ ও জাতির কাছে অতুলনীয় হয়ে থাকবেন।

লেখকঃ  
শিক্ষার্থী,  
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

প্রকাশ তথ্যঃ  
পত্রিকার নাম: কুশিয়ারাভিউড়২৪.কম  
প্রকাশের সময় : ২৫ শে মার্চ ২০২১; বৃহস্পতিবার।



# নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের দৃষ্টি চাই

## রাজু চন্দ্র দাস

নিয়ন্ত্রণের বাজার অঙ্গীকৃত ও নিম্নআয়ের মানুষের দুর্ভোগ বেড়ে যায়। জীবনের তাগিদে হিমশিম খাওয়ার উপদ্রব হয় প্রতিনিয়ত। বর্তমান বাংলাদেশ অসাধু ব্যবসায়ীদের এক মহা চক্রান্তে আক্রান্ত। দেশে প্রতিনিয়ত ব নিয়ন্ত্রণে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে যার মূলে রয়েছে অসাধু ব্যবসায়ীদের চক্রান্ত।

চাল, ডাল, চিনি ইত্যাদী নিয়ন্ত্রণে দামের সাথে লাগামহীন ভাবে সয়াবিন তেলের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। তেলের দাম এত পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে যে যা এর আগে কখনো এমনটা হয়নি।

বর্তমান তেলের বাজার প্রতি লিটার ২০০ টাকা।

যেখানে একজন শ্রমিকদের মজুরি ৩০০-৪০০ টাকার মাঝে সীমাবদ্ধ সেখানে ১ লিটার সয়াবিন তেলের দাম যদি ২০০ টাকা হয় তাহলে সেইসব দিন মজুরির পরিবার কিভাবে জীবন অতিবাহিত করবে তা ভাবার বিষয়।

এই তেলের দাম বৃদ্ধির পেছনে অসাধু ব্যবসায়ী জড়িত।

এক জরিপে দেখা গেছে, একদিনের একটি র্যাবের অভিযানে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার লিটার তেল উকার করা হয়। এই যদি হয় অবস্থা তাহলে একটা বার চিন্তা করা উচিত কি পরিমাণ তেল দেশে স্টক করা হয়েছে! আর এর জন্যই মূলত দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেল লাগামহীন দাম।

এসব জন্দ করা তেল যদি অসাধু ব্যবসায়ী স্টক না করে বাজারে বিক্রি করতো তাহলে হয়তো আজ তেলের দাম ১০০/১১০ টাকা লিটারের বেশি হতো না।

এদিকে আবার দুয়েক দিনের ব্যবধানের তেলের দাম ছাড়াও বেড়েছে পেঁয়াজসহ আরো অনেক পণ্যের দাম।

বাজারে চাল থেকে শুরু করে ডাল, চিনি, আটা-ময়দা, আদা-রসুন, আলু, সব ধরনের মাংস, ডিম ও গুঁড়াদুধসহ ১০ পণ্যের দাম বেড়েছে আরেক দফা। ফলে এসব পণ্য কিনতে ভোক্তাদের কর্ণণদশা।

আলুর দাম কেজিতে ৪/৫ টাকা, চিনির দাম কেজিতে ২/৩ টাকা, তেলের দাম আর নাই বললাম! এভাবেই প্রতিনিয়ত চলতে রয়েছে নিয়ন্ত্রণে জিনিসপত্রের দাম। কিন্তু একজন দিনমজুর চাইলেই বাড়াতে পারছে না তার দৈনিক মজুরি। এমতাবস্থায় একজন দিন মজুরীর বা সাধারণ মানুষের পক্ষে বাচ্চা-কাচ্চা সংসার নিয়ে চলতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

এসব মূলে অসাধু চক্রান্ত জড়িত। অসাধু ব্যবসায়ী তাদের অর্থের লোভে নিয়ন্ত্রণে জিনিসপত্র মজুদ রেখে বাজারে এর সংকট তৈরী করাচ্ছে, বাড়াচ্ছে দাম। এসব থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্তি দিতে হলে প্রশাসনকে মাঠে নামতে হবে তাদের তদারকি করতে হবে।

নিয়ন্ত্রণে জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে সরকারের সদয় দৃষ্টি জ্ঞাপন করছি।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
এম,সি কলেজ, সিলেট।

প্রকাশ তথ্যঃ  
পত্রিকাঃ জনকঞ্চ।  
তারিখঃ ১৯ মে ২০২২।



# তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় আওতায় আনতে হবে

## মো: ইসরাফিল আলম রাফিল

মানসিক বিকাশ একটি চলমান প্রক্রিয়া। শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সের মানুষের মানসিক বিকাশ স্তরে স্তরে বিভক্ত। মানসিক বিকাশ যখন বাঁধাগ্রস্ত হয় তখন সৃষ্টি হয় মানসিক জটিলতা। আর সেই মানসিক বিভিন্ন জটিলতা থেকে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার শুরু। পারিবারিক অশান্তি, তরুণদের পড়াশোনা চাপ, শিশুদের স্কুলের শাস্তি পাওয়ার ভয় ও বৈবাহিক সম্পর্কের জটিলতা ইত্যাদি কারণ মানসিকভাবে আমাদেরকে বিপর্যয় করে তুলে। দেশে মানসিক স্বাস্থ্য নীতিমালা রয়েছে। উন্নত দেশের মতো আমাদের দেশের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। মনকে ভালো রাখতে নিয়মিত ব্যায়ামের চর্চা, পুষ্টিমানসম্পন্ন ও সুষম খাবার মস্তিষ্ককে সুরক্ষা দিতে পারে। তাই মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে।

মানসিক রোগ সচারাচর তরুণদের মাঝে বেশি লক্ষ করা যায়। কিন্তু তরুণরা এগুলো ঠিক মতো বুবাতে পারে না। আমরা মানসিক সমস্যা বিভিন্ন বলে থাকে ধরা বিভিন্ন রয়েছে। যার হতে থাকে। সমস্যার সময়ে একটা রোগ এ অনেকটাই ফলে এখন সমাধানে আসছে। মানসিক বিষয়ে জড়িত রাসায়নিক এবং সামাজিক বিষয়ের মাঝে সামাজিক সমস্যায় আমরা প্রতিনিয়ত বেশি ভুগে থাকি। এছাড়া মানসিক রোগের মেডিসিন প্রয়োগ করা হয় মূলত ইন্হেন ইমাজিং এবং টপোগ্রাফি পরীক্ষা করে। এই পরীক্ষায় রাসায়নিক পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া গেছে।



বাংলাদেশে ভয়াবহ হারে বাঢ়ছে মানসিক রোগী। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, প্রতি ১০০ জনের ৩৪ জনই মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত। সময়ের সাথে এ হার বেড়েই চলেছে। অবাক করার বিষয় মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্তের মধ্যে তরুণদের সংখ্যাই বেশি। প্রতি ১ লাখ মানুষে ছয়জন আক্রান্ত করছেন মানসিক সমস্যার কারণে।

বেকারত, হতাশা, অস্থিরতা, ব্যক্তিজীবনের অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, নানামুখী চাপ, অপ্রাপ্তি, লোভ, বিচারহীনতা তরুণদের মানসিক রোগীতে পরিণত করছে। বর্তমানে তরুণদের বিরাট অংশ অনলাইন জগতে খুব পরিচিত মোবাইল, ল্যাপটপ দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া ও অনলাইন গেইম আসন্ত হয়ে পড়ছে। এমনকি ছোট বয়সী শিশুদের খাওয়াতে অভিভাবক ভিত্তিও গেইম ও কাটুন দিয়ে থাকেন। এই ছোট বয়সে শিশুরা ইন্টারনেটে আসত্তি হয়ে পড়ছে। কিন্তু অভিভাবকরা বুবাতে পেরেও এই উপায় অবলম্বন করছেন। ছোট বয়সে শিশুদের মানসিক বিকাশ ঘটবে হই ছল্লোড়ে খেলার মাঠে। কিন্তু আধুনিক যুগে ফলে বিপরীত হচ্ছে। যার ফলে শিশুরাও মানসিক সমস্যায় ভুগছে।

করোনার প্রকোপে সারাদেশে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিলো। এই সময়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা একয়েরে সময় কাটিয়েছে। দীর্ঘ বন্ধ শেষে আবার শিক্ষার্থী সশরীরে ক্লাস ও পরীক্ষা দিচ্ছে। অনেক দিন পর স্কুল, কলেজ খোলার পর শিক্ষার্থীদের চাপ এড়াতে

সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে যা প্রশংসনীয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা এই সুযোগ পাচ্ছে না। দেশের অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরে দুইটা সেমিস্টারে হয়ে থাকে। যার ফলে শিক্ষার্থীরা অনলাইনে শুধু ক্লাস করেছে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর শুধু পরীক্ষা দিয়েই যাচ্ছে। একটি সেমিস্টার শেষ হওয়ার পর আরেকটা সেমিস্টার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। এখানে কোন সিলেবাস কমানো হচ্ছে না। পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীদের চাপ সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এমন সিদ্ধান্তে মানসিক স্বাস্থ্যের উপর যে প্রভাব পড়তে পারে সেই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিবেচনা করা উঠিত ছিলো।

১৯৯২ সাল থেকে প্রতিবছর ১০ অক্টোবর ‘বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস’ পালিত হয়ে আসছে। কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা করোনার ফলে আমরা অনেকটা বুঝতে পারছি। তরুণ থেকে শুরু করে সব বয়সের মানুষের দোরগোড়ায় মানসিক স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দেওয়া প্রয়োজন। মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকারের বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে। প্রচলিত ভাস্ত ধারণা ও কুসংস্কার দূর করতে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা চালাতে হবে। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য আইন, নীতিমালা ও কৌশলপত্র বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি, আন্তর্জাতিক ও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মানসিক স্বাস্থ্য কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা রাখা জরুরি। প্রাক্তিক জনগণ, প্রবীণ ব্যক্তি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মানসিক স্বাস্থ্যসেবার আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন।

বিশে ১০০ কোটি মানুষ মানসিক রোগে ভুগছে। যার ৫০ শতাংশই শুরু হয় ১৪ বছর থেকে। সারা বিশ্বে মৃত্যুর ১ দশমিক ৩ শতাংশ হলো আত্মহত্যা। যেখানে তরুণদের মৃত্যুর দ্বিতীয় কারণ হলো মানসিক সমস্যা। তাই মানসিক স্বাস্থ্যবুঁকির এড়াতে আমাদের সকলকে মানসিক স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আনতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা হেল্পলাইন এবং এর গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কে মানুষকে অবগত করতে হবে।

স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ঠিক করে মানসিক স্বাস্থ্যের কৌশলগত পরিকল্পনায় সরকারকে নজর দিতে হবে। আমাদের দেশে আত্মহত্যার ঘটনা ও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা বেশি। মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় দক্ষ সেবাদাতা বাড়াতে মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। প্রতিটি হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ দিলে সব পেশার মানুষের কাছে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দেওয়া সন্তুষ্ট হবে আশা রাখি। তাই পরিবার ও অভিভাবকদের এই বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান থাকাও প্রয়োজন। যাতে করে তাদের সন্তানরা মানসিক সমস্যা ভুগলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারে।

মানসিক স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে আরও বেশি মনোযোগী হতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সরকার। সুখী, সমৃদ্ধ, বৈষম্যহীন মানবিক বিশ্ব গঠনে শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। তাহলেই কেবল আত্মহত্যাসহ অন্যান্য মানসিক ব্যাধির ফলে ঘটা মৃত্যুর সংখ্যা কমে আসবে।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়  
সভাপতি, বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা



# হালাল উপর্জনে বরকত আনে

## মো. সাইফুল মিয়া

জীবন-জীবিকার তাগিদে মানুষ বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত। আল্লাহতায়ালা প্রদত্ত মেধা ও ক্ষমতার বলে কিছু মানুষ অসৎ পথে রাতারাতি সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে। অন্যদিকে কিছু মানুষ রাত দিন হাড়-ভাঙ্গ পরিশ্রম করেও ক্ষুধার জুলার ছটফট করছে। এই দুই পথে পৃথিবীর সকল মানুষ পরিচালিত। মহান আল্লাহতায়ালা পবিত্র। আমরা কালেমা তায়েবায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করি। আল্লাহতায়ালা পবিত্রতাকে ভালোবাসে। তাই যারা প্রিয় আল্লাহর বান্দা তারাও সর্বক্ষেত্রে নিজেতে পবিত্র রাখে। রিজিক মহান আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার জন্য বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লাহর গুণবাচক নামে মধ্যে একটি আল্লাহ রাজ্ঞাকুন অর্থাৎ আল্লাহ রিজিকদাতা। আল্লাহতায়ালা মানুষ পৃথিবীতে আসার আগেই তার রিজিক নির্ধারিত করে রেখেছেন। মানব শিশু যখন জন্মগ্রহণ করার পর আল্লাহতায়ালা তার জন্য মায়ের দুধের ব্যবস্থা করে দেয়। আল্লাহতায়ালা চাই বান্দা তার প্রাপ্য রিজিকগুলো যেন হালাল উপায় সংগ্রহ করে। ইসলাম হালাল রিজিক উপর্জন করতে এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহতায়ালা মহাগ্রহ আল-কোরআনে ও প্রিয় নবী হ্যরত মুহাম্মদ (সা.) হাদিসে হালাল উপর্জনের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। নবীগণ নিষ্পাপ হওয়ার পরও তাদের হালাল রিজিকের কথা বলেছেন। তাই সকল নবী ও রাসূলগণ কোনো না কোনো হালাল পেশা অবলম্বন করেছেন। আদি পিতা হজরত আদম (আ.) কৃষি কাজ করতেন। হজরত নূহ (আ.) কাঠমিন্দ্রির কাজ করতেন। হজরত ইদিস (আ.) দর্জির কাজ করতেন। হজরত ইবরাহিম (আ.) রাজমিন্দ্রি ছিলেন। হজরত ইসমাইল (আ.) রাজমিন্দ্রির সহযোগী ছিলেন। আমাদের প্রিয় নবী প্রিয় হ্যরত মুহাম্মদ (সা.) ছাগল চারিয়েছেন ও ব্যবসা করেছেন। কারণ আল্লাহতায়ালা বলেছেন, ‘হে রাসুলরা! তোমরা হালাল পবিত্র উত্তম রিজিক খাও আর সৎকর্ম করো।’ (সুরা মুমিনুন : ৫১)। তাছাড়া মুসলিম জাহানের চার খলিফা হজরত আবু বকর (রা.) ব্যবসা করেছেন। হজরত ওমর (রা.) ও ব্যবসা করেছেন। হজরত ওসমান (রা.) কাপড়ের ব্যবসা করেছেন। হজরত আলী (রা.) কিছু খেজুর বিনিময়ে কৃপ থেকে পানি ওঠানোর কাজ করতেন। সকল মোমিনদের উদ্দেশ্যে আল-কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘হে মোমিনরা! তোমরা হালাল উত্তম রিজিক আহার করো, যা আমি তোমাদের দিয়েছি।’ (সুরা বাকারা : ১৭২)।

নামাজ, রোজা যেমন আল্লাহতায়ালা প্রদত্ত ফরজ ইবাদত। তেমনিভাবে হালাল উপর্জনও একটি ফরজ ইবাদত। আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হয়, তখন জমিনে ছড়িয়ে পড়, আর আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করতে থাক, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার।’ (সুরা জুমুআ: ১০) রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘হালাল জীবিকা সন্ধান করা নির্ধারিত ফরজগুলোর পরে বিশেষ একটি ফরজ।’ (বায়হাকি; কানযুল উম্মাল) জান্নাতে যাওয়ার পূর্বশর্তও হালাল উপর্জন। প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন- ‘ওই গোশত দেহ জান্নাতে যাবে না, যা হারাম খাবার থেকে উৎপন্ন। জাহানামই এর উপযোগী।’ (সুনামে তিরমিজি -৬১৪)। ইবাদত করুল হওয়ার পূর্বশর্ত হালাল উপর্জন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহ পবিত্র, তিনি একমাত্র পবিত্র বস্তুকেই গ্রহণ করেন। আল্লাহ রাসূলগণকে যে আদেশ করেছেন, মুমিনগণকেও সেই আদেশ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, ‘হে রাসূলগণ! তোমরা হালাল পবিত্র খাদ্য ক্ষক্ষণ কর এবং সৎ আমল কর। তিনি আরো বলেন, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার দেয়া হালাল পবিত্র রিজিক থেকে খাও। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) উল্লেখ করেন, ‘কোনো ব্যক্তি দূর-দূরান্তে সফর করছে, তার মাথার চুল এলোমেলো, শরীরে ধুলা-বালি লেগে আছে। এমতাবস্থায় ওই ব্যক্তি উভয় হাত আসমানের দিকে তুলে কাতর স্বরে- হে প্রভু! হে প্রভু! বলে ডাকছে। অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং সে হারামই খেয়ে থাকে। এই ব্যক্তির দোয়া কীভাবে কবুল হবে?’ (মুসলিম: ২৭৬০)

প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন, ‘মানুষের এমন এক কাল অতিক্রম করবে, যাতে মানুষ এ কথার চিন্তা করবে না, যে সম্পদ উপর্জন করা হচ্ছে তা হালাল না হারাম?’ (মিশকাত) বর্তমানে অধিকাংশ পেশার মানুষ পরোক্ষভাবে হারাম উপর্জনের সাথে সম্পর্কিত হয়েও নিজেকে সমাজে হালাল উপর্জনকারী হিসেবে পরিচিত দেয়, গর্ব করে। আমরা হারাম উপর্জন বলতে শুধু সুদ, ঘৃষকে বুঝি। কিন্তু কাজে ফাঁকি কিংবা সঠিকভাবে কাজ না করে মাস শেষে বেতন নেওয়া কিন্তু হালাল নয়। বান্দার দুনিয়ার সকল কৃতকর্মের হিসাব পরিকালে দিতে হবে। রাসুল (সা.) বলেন, ‘কেয়ামতের ময়দানে বনু আদমকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে। সেই পাঁচটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না দেয়া পর্যন্ত কোনো মানুষ অর্ধ হাত পরিমাণ সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। তারমধ্যে একটি হলো-সে কোন পথে উপর্জন করেছে।’ (তিরমিজি : ২৪১৬) হালাল পথে অল্প উপর্জনেও আল্লাহতায়ালা বরকত দেয়। তাই আসুন আমরা নিজে হালাল পথে উপর্জন করি এবং অন্যদের হালাল পথে উপর্জনে উৎসাহী করি। আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলকে হালাল উপর্জনের সক্ষমতা দান করুন। আমিন।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।



# একুশ আমার অহংকার

## কবিতা রাণী মৃধা

একুশে ফেরুয়ারি বাঙালি জাতির এক গৌরবোজ্জুল ইতিহাস। তাই তো ফেরুয়ারি ভাষার মাস হিসাবে সমগ্র বিশ্বে পরিচিত। এই মাসে চেতনায় এবং শ্রদ্ধায় অবনত হয় সমগ্র জাতি ও বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ এবং ভাষাপ্রেমীরা। বাংলাদেশে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের যে ধারাবাহিকতার পুনর্বিন্যাস, পুনর্নির্মাণ এবং অনুশীলন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার চলমানতা রয়েছে, সেই প্রেক্ষিতে ৫২'র ভাষা আন্দোলনের পটভূমি প্রতিদিন, প্রতিবছর ক্রমশই আলোকিত হয়ে উঠছে।

লক্ষণীয় যে, এই ফেরুয়ারি মাসে পুরো বাংলাদেশের প্রকাশপটে বিপণন ও ঐতিহ্য বিকাশে দেশীয় ফ্যাশন হাউজ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ একুশের বিষয়বস্তুনির্ভর আমাদের চেতনা জাগান্য পোশাক-আশাক ও ফ্যাশন সামগ্রী তৈরি করে যাচ্ছেন মূলত আমাদের জাতীয় চেতনায় বারবার বিকাশের তাগিদে। যা বিগত বছরগুলোতে জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতায় ও মিডিয়ার সহযোগিতায় দিন দিন সম্মুদ্ধতর হচ্ছে। সাদা এবং কালো রঙের সমস্বয়ে তৈরি পোশাক ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহের ক্ষেত্রেও থাকে ক্রেতাদের একটি বিয়োগাত্মক দিনের স্মরণগাঁথা। তাই বিয়োগ-ব্যথার বেদনার্থ রঙ কালোই মূলত সবক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়ে থাকে। পোশাকে ও অন্যান্য সামগ্রীতে বর্ণমালা, শহীদ মিনার, একুশের পঙ্কজমালা, শহীদদের প্রতিকৃতি থাকে বিভিন্ন সামগ্রী অবয়বজুড়ে।

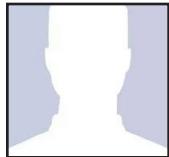
এ ছাড়া থাকে বাঙালির চেতনাবাহী বিবিধ বিষয়; যা আমাদের শহীদদের আত্মাগের স্মৃতিকে চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলে। ভাষার প্রতি বাঙালির যে টান ও মমত্বোধ—এই টান ও মমত্বোধ যেমন উৎকীর্ণ হয় লেখায়, রেখায় এবং দৈনন্দিন জীবন যাপনে, তেমনি ফ্যাশনের ভুবনেও একুশের মর্মার্থকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস থাকে প্রতিবছর, প্রতিনিয়ত গহীন ভালোবাসায়। ভাষার মাস যখন বছর ঘুরে আবেগাতাড়িত বাঙালির প্রাঙ্গণে এসে ছায়া ফেলে, ঠিক তার সঙ্গে এসে পাশে দাঁড়ায় ঝুতুরাজ বসন্ত। একদিকে শোকার্ত অতীতের শোকগাঁথার গল্পবুননের গুগগুলো বুকের স্পন্দনে তিরিতির করে কাঁপতে থাকে। একইভাবে রঙিন বসন্তের ফাণুন হাওয়ার দোলায়ও দুলে ওঠে বাঙালির হূদয়। অনুভূতিতে জেগে ওঠে এক অন্যরকম আবেশ। একদিকে একুশের আবেগময়িত প্রহরের করুণ সুরেলা আবহ ‘রঙে রাজনো একুশে ফেরুয়ারি’র প্রাণবেগেকে করে তোলে বিধৃত আর বেদনাপ্লত। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, চিত্রকলা, ফ্যাশন তথা শিল্পের প্রতিটি শাখায় রয়েছে একুশে ফেরুয়ারির দারুণ প্রভাব রয়েছে। যে প্রভাবের স্পর্শে আলোকিত হয়ে উঠেছে বাংলা কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটকসহ নানা অঙ্গ।

সর্বাপরি প্রতিবছর বাংলা একাডেমি আয়োজন করে ১ ফেরুয়ারি থেকে মাসব্যাপী বইমেলার। তবে করোনার কারণে এ বছর বইমেলা একটু দেরি করে শুরু হয়। বইমেলা আজ বাঙালির প্রাণের মেলারপে প্রতিটি বাঙালির মনে জায়গা করে নিয়েছে। পাশাপাশি একুশের চেতনাকে ধারণ করে সাংস্কৃতিক অঙ্গমেও চলে নানা আয়োজন। একুশের চেতনার ধারা শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির বুকে যে সুপ্রবাহ সৃষ্টি করেছে তাতে সম্প্রতি একুশের চেতনার ছোঁয়া লেগেছে দেশের ফ্যাশন ট্রেন্ডেও। বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে পোশাক একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। যে অনুষঙ্গের গহীনে এখন চলছে দেশীয় মোটিফে করা আধুনিকবোধের প্রকাশ। বিভিন্ন উৎসবের পাশাপাশি নগরবাসীরা একুশের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে পোশাকের প্রতিও তাদের অকৃষ্ণ সমর্থন প্রদানের মধ্যদিয়ে শহীদ দিবসের মর্মগাঁথকে প্রতিবছরের ফেরুয়ারির শরীরে জড়িয়ে নেন গভীর ভালোবাসায়।

দেশীয় ফেরুয়ারি তৈরি একুশের পোশাক বিভিন্ন ফ্যাশন হাউজের আউটলেট থেকে সংগ্রহের উদ্যোগ শুরু হয় ফেরুয়ারির গোড়া থেকে। রাজধানীর শতাধিক ফ্যাশন হাউজ নাগরিক জীবনের পরম এই অনুষঙ্গকে অত্যন্ত নান্দনিকরূপে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গ্রহণ করে বিপুল আয়োজন। এই আয়োজনে থাকে পাঞ্জাবি, শার্ট, ফুতুয়া, শাড়ি, থ্রি-পিস, টি-শার্ট, পট, শো-পিস, টিপট, মগসহ নানা সামগ্রী। টি-শার্টের ছোট এক চিলতে জমিনে যে কত আবেগ আর অনুভূতি এক হয়ে মিশে যেতে পারে তা যেন সময়ের প্রতিটি পরতে পরতে একটু একটু করে উন্মোচিত হচ্ছে আমাদের সামনে। আর তাই একুশের চেতনাকে ধারণ করে থাকা টি-শার্টগুলোতে যেমন দেখা মেলে চিরাচরিত বর্ণমালার সুনিপুণ কোনো বিন্যাস, তেমনি এই সীমিত ক্যানভাসেই অপরিসীম আবেদন নিয়ে উঠে আসে দেশের প্রতি ভালোবাসার নানা গল্প। একুশের আয়োজনে একদিকে একুশের শহীদ বেদীতে গাঁদা কিংবা গোলাপের শুদ্ধার্ঘ আর অন্যদিকে একুশের চেতনায় সামিল হওয়া কোনো তরঙ্গীর মাথায় শোভা পাওয়া গাঁদার মালা যেন একুশের ছন্দটাকেই নিয়ে আসে সকলের মাঝে। সেই সাথে ছোট-বড় সকলের গালে রংতুলির ছোঁয়ায় জন্ম নেওয়া বর্ণমালা আর একুশের মিনারও যেন সবাইকে মনে করিয়ে দেয়—আজ একুশে ফেরুয়ারি। এখনকার সময়টি শোককে শক্তিতে পরিণত করে ভাষার জন্য ভালোবাসা প্রকাশের দিন।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশ তথ্যঃ  
পত্রিকাঃ ইত্তেফাক।  
তারিখঃ ২১-০২-২০২২।



# কোরবানির পশুর বর্জের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা দরকার

## আতিয়া ফাইরুজ ঐশ্বী খান

স্বল্পদিনের মাঝেই দর্জায় কড়া নাড়তে প্রস্তুত মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদুল-আযহা। আসন্ন ঈদকে সামনে রেখে জনসাধারণের মাঝে দেখা যাচ্ছে চরম আবেগ-উৎকর্ষ। ঈদকে কেন্দ্র করে চলছে নানা পূর্ব প্রস্তুতি। দেশের বিভিন্ন স্থানে দেখা যাচ্ছে কোরবানির পশুর হাট এবং একই সাথে উৎসুক জনতার ভীড়। ঈদুল আযহার আনন্দ মূলতঃ নিহিতই থাকে পশু কোরবানির মধ্যে। কিন্তু কেবল পশু কোরবানি নয় বরং রয়েছে আরও একাধিক অবশ্য পালনীয় বিষয় যার প্রতি আমাদের অধিকাংশরাই উদাসীনতা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেই। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পশুর রক্ত ও বর্জ্য নিরসন ব্যবস্থা। প্রায় প্রতি বছর এই বিষয়টা দৃষ্টিগোচর হওয়া সত্ত্বেও উপেক্ষিত।

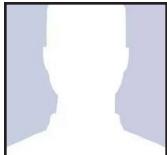
পশু কোরবানির পর থেকে প্রায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত কোরবানির পশুর কাটার স্থান থেকে আসতে থাকে রক্তের দুর্গন্ধ যার তীব্রতা সময়ের পরিক্রমায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাছাড়া কোরবানির পশুর বর্জ্য নিরসনের ব্যাপারে সরকার কর্তৃক কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও সাধারণ জনগণ এসব ব্যাপারে অসচেতনতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। সরকারিভাবে বিভিন্ন স্থানে কোরবানির পশুর বর্জ্য নিরসন ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত করে দেয়া এবং এলাকাধীন মসজিদে কোরবানির পশুর বর্জ্য বহন করার জন্য থলে সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ তা সহজে মানতে নারাজ। এই সমস্যাটি শহরাঞ্চলেই অধিক পরিলক্ষিত হয়। শহরের রাস্তার পাশে, গলির মুখে ও অন্যান্য স্থানে পাওয়া যায় রক্তের তীব্র দুর্গন্ধ এবং এই অবস্থা স্থায়ী লাভ করে একটানা কিছুদিন। পশু কাটার পর সে স্থান থেকে রক্ত ধূয়ে পরিষ্কার করা হলেও সে ব্যবস্থাপনায় শূন্যতা থাকে এবং পরিপূর্ণরূপে পরিচ্ছন্ন হয় না। আর শহরের জলপ্রণালীগুলো মূলতঃ বড় বড় ভবন যেমনে রাস্তার পাশেই অবস্থান করে এবং অনেক জলপ্রণালীর মুখে ঢাকনাও থাকে না ফলে পর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনার অভাবে দুর্গন্ধ খুব দ্রুত বিস্তৃত ও স্থায়ীভাবে লাভ করে এবং এক পর্যায়ে সে দুর্গন্ধ মানুষের বস্তবাদ্বিতো প্রবেশ করতে কোন বাধা পায় না। পাশাপাশি মানুষের যাতায়াত পথেও সমস্যার উক্তব ঘটে। আর ঈদ যদি হয় বর্ষণের মৌসুমে তবে মানুষ নিজেরা এই নোংরা পরিষ্কার ক্ষেত্রে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের পরিবর্তে অপেক্ষা করে ভারী বর্ষণের। “বৃষ্টি হলে সকল আবর্জনা পানির সাথে পরিষ্কার হয়েই যাবে”- অনেকের ধারণা থাকে এমন পর্যায়ে। অথচ পশুর এসব রক্ত বর্জ্য অপরিকল্পিত ভাবে জলপ্রণালিতে ফেলার ফলে অনেক সময় জলপ্রণালীগুলোর মুখ বন্ধ হয়ে পানি চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়ে জলবদ্ধতার ন্যায় আরেক সমস্যার উক্তব ঘটতে পারে, এই ব্যপারে কয়জনই সচেতন থাকে। তাই বৃষ্টির আশায় চক্ষু থাকা সত্ত্বেও দৃষ্টিহারার ন্যায় আচরণ করা কাম্য নয়।

পশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় একুশ অবহেলা মানুষ ও পরিবেশ উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকর। পশুর রক্ত ও নিঃস্তু বর্জ্য থেকে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া বাতাসের সাথে মিশে পরিবেশকে দূষিত করে যাচ্ছে এবং সে বাতাসে থাকা অক্সিজেন আমরা গ্রহণ করছি যার ফলে আমাদের শাসনালী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কারণ প্রতিটি নিশ্চাসের সাথে গ্রহণ করা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া। পক্ষান্তরে পশু জবাইয়ের পর রক্ত পরিষ্কারের জন্য যে পানি ব্যবহার করা হচ্ছে সে পানি যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী জলপ্রণালীগুলোতে প্রবেশ করতে না পারে পরিবর্তে কোন স্থানে জমে থাকে তবে সে জমাট বাধা পানি থেকে জন্ম নিতে পারে ডেঙ্গু ও অন্যান্য মশা যা মানব জীবনের পক্ষে ভয়ানক হৃষ্কিপ্রদর্শন।

তাই কোরবানির পর পশুর রক্ত ও বর্জ্য নিরসনের ক্ষেত্রে প্রশাসনের নির্ধারিত নিয়মকানুনসমূহ যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে এবং ব্যক্তিগতভাবেও নিজেদের সচেতন হতে হবে। তাছাড়া সরকার ও প্রশাসনকে আরও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ঈদ-উল-আযহা'য় পশু কোরবানি দেয়া একটি পুণ্যের কাজ কিন্তু এই পুণ্য অর্জন কেবল পশু কোরবানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং যাবতীয় আরও অনেক অবশ্য পালনীয় কর্তব্য রয়েছে।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশ তথ্যঃ  
পত্রিকাঃ মানবকর্তৃ।  
তারিখঃ ১৮-০৭-২০২১।



# স্বাস্থ্য দিবসের ভাবনা

## রাজিয়া আক্তার রিমু

কথায় বলে, সুস্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। বৈশিক করোনা মহামারি যেন আমাদের আবারও বুবিয়ে দিল পৃথিবীতে টিকে থাকতে সুস্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু। এই মহামারিতে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য হাজারো মানুষের আর্তনাদ আমরা দেখেছি। কিন্তু স্বাস্থ্য বলতে আমরা কি শুধু শারিরিক স্বাস্থ্যকেই বুঝি? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ১৯৪৮ সালে ঘোষিত সজ্ঞা অনুসারে স্বাস্থ্য বলতে সম্পূর্ণ শারিরিক, মানসিক এবং সামাজিক মঙ্গল বা কল্যাণবোধকে বোঝায়। শুধু রোগ বা দুর্বলতার অনুপস্থিতিকে স্বাস্থ্য বলে না। স্বাস্থ্য শারিরিক, মানসিক এবং সুস্থিতার যোগফল যেখানে রোগ এবং অসুস্থিতা অনুপস্থিত।

মানব সমাজে ব্যক্তির টিকে থাকা তার স্বাস্থ্যের ওপর নির্ভর করে করে। একটি সুস্থ সবল দেহের জন্য স্বাস্থ্যকর জীবন ধারা অতি জরুরি। সম্প্রতি গবেষকরা স্বাস্থ্যের সজ্ঞা হিসেবে একটি নতুনত্ব যোগ করেছেন। তাদের ভাষ্যমতে স্বাস্থ্য হচ্ছে নতুন নতুন বাধা এবং দুর্বলতার সাথে খাপ খাইয়ে সুস্থিতাবে জীবনযাপন করা।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অত্যধিক উন্নয়নের ফলে এখন শুধু নিরোগ থাকাকেই স্বাস্থ্য বলে না। সমস্ত প্রতিকূল পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে সুন্দরভাবে শরির ও মন পরিচালনা করাকে স্বাস্থ্য বলে। অতএব, স্বাস্থ্য বলতে শারিরিক এবং মানসিক উভয় স্বাস্থ্যকেই বোঝায়। এই দুই ধরনের স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা অতি জরুরি।

শারিরিক স্বাস্থ্য বলতে মন্তিক্ষ থেকে শুরু করে পায়ের পাতা পর্যন্ত অর্থাৎ শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রতঙ্গ নিজস্ব নিয়মে কাজ করাকে বোঝায়। প্রতিটি কাজ সুস্থিতাবে সম্পন্ন করার জন্য শারিরিকভাবে সবল এবং কর্মক্ষম থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন মানুষ সুস্থিতাবে কাজ সম্পন্ন করে তার সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে। কারণ এটা শুধু তার নিরোগ থাকা নয়, বরং সঠিক খ্যাদানভাস, পরিমিত ঘুম, আবেগ নিয়ন্ত্রণ এবং শারিরিক ব্যায়ামের যোগফল। এছাড়াও পরিবেশগত, জৈবিক, সামাজিক এবং পারিপার্শ্বিক উপাদানগুলোও স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে।

সঠিক খ্যাদানভাস, নিয়মিত অনুশীলন এবং স্বাস্থ্য সেবাতে অ্যাক্সেসের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নিজের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে পারে এবং রোগ প্রতিরোধে জয়ী হতে পারে। শারিরিক সুস্থিতার উপর মানুষের দৈহিক গঠন নির্ভর করে। শারিরিকভাবে সুস্থ ব্যক্তির বিভিন্ন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে মানসিক সুস্থিতাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে একটি ভালোর অবস্থা যেখানে ব্যক্তি তার নিজস্ব দক্ষতা উপলব্ধি করে, জীবনের স্বাভাবিক চাপকে মোকাবিলা করতে পারে, উৎপাদনশীল এবং ফলদায়কভাবে কাজ করতে পারে।

একজন ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য তার শারিরিক স্বাস্থ্যের মতই গুরুত্বপূর্ণ। মানসিক স্বাস্থ্যের অসুস্থিতা শারিরিক স্বাস্থ্যের অসুস্থিতার মতই বাস্তব। মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতির ফলেই তরুণ সমাজ আত্মহননের মতো পথ বেছে নেয়। অকালে বারে যায় হাজারো তাজা প্রাণ। পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুম, ইতিবাচক মনোভাব তৈরি, নতুন পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, কানেক্টিভিটি বাড়ানোর মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখা যায়। মানসিকভাবে সুস্থ না থাকলে শারিরিকভাবেও সুস্থ থাকা সম্ভব নয়। সবসময় হাসিখুশি থাকা এবং নিজের অবস্থানে সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমে মানসিক সুস্থিতা বজায় রাখা সম্ভব।

আমাদের জীবন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল স্বাস্থ্য। এই স্বাস্থ্য বিষয়ক জনসচেতনতা বাড়াতে প্রতিবছর ৭ই এপ্রিল স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয়। যার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করার মাধ্যমে যেকোনো প্রতিকূল পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী করে তোলা। অনেক তো মৃত্যুর মিছিল দেখলাম এই মহামারিতে। আসুন আমরা এবার স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি, সচেতন হই। মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে প্রয়োজনে কাউন্সেলিং করাই। অন্যথায় পৃথিবীতে এমন দিন আসতে খুব বেসি দেরি নেই, যে-দিন ডাইনোসরের মতো মানুষের অস্তিত্ব সংকটের মুখে পরবে।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশ তথ্যঃ  
পত্রিকাঃ শেয়ার বিজ।  
তারিখঃ ২৭-০৪ ২০২২।



# স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

## সুকান্ত দাস

সুজলা সুফলা শ্যামলা আমদের এই সোনার বাংলাদেশ। দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র সংগ্রাম, ত্রিশ লক্ষ শহীদ এবং তিন লক্ষ মা বোনের সম্মের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমদের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্বাধীন দেশে সাধারণ মানুষের চাওয়া ছিলো ক্ষুধা মুক্ত, দারিদ্র্য মুক্ত, অসাম্প্রদায়িক দেশ। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগনের এই চাওয়া গুলো পূরণ করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কিন্তু '৭৫' এর ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর স্বৈরশাসকেরা জনগণের এই চাওয়া গুলো পূরণ করে নি। জনগণের ইচ্ছাগুলোকে পদদলিত করে গেছে। তখন মানুষের চাওয়া ছিলো স্বাধীন দেশে স্বাধীন ভাবে চলার অধিকার যেন তারা পায়।

মুক্তিযোদ্ধারা জাতির সূর্য সত্তান। তাদের রক্তের উপর দাঢ়িয়ে আছে দেশ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে অনেক ব্যাঙ বিদ্রূপ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় খাঁটি মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে টাকার বিনিময়ে ভূয়া মুক্তিযোদ্ধাদের দাঢ় করানো। অনেক জায়গায় আসল মুক্তিযোদ্ধারা নিঃস্থান হচ্ছেন। বর্তমান সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের যোগ্য সম্মান এবং সুবিধা দেওয়ার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে মুক্তিযোদ্ধাদের সরকারি তালিকায় বেশ বড় সংখ্যক ভূয়া মুক্তিযোদ্ধার নাম দেওয়া হয়েছে। যা ধরাও পড়েছে।

মানুষের জাতীয় তালিকায় নাম দিয়েছে। ফলে আসল সম্মান পাচ্ছে না। কিছু ভূয়া সরকারের উচিত আরো কিছু ভূয়া মুক্তিযোদ্ধা চিহ্নিত হয় যোগ্য সম্মান পান এটাই দূর্নীতিতে দেশ অনেকবার অবশ্য সময় বদলেছে। কিন্তু থেকে দূর্নীতির কালো মেঘ এসেও আসছে না। কোথাও যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



টাকার বিনিময়ে দূর্নীতিবাজ এসব ভূয়া মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তিযোদ্ধারা যোগ্য মুক্তিযোদ্ধা চিহ্নিত হয়েছে পদক্ষেপ নেওয়া যাতে সকল এবং আসল মুক্তিযোদ্ধারা প্রত্যাশা।

চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এখন মেঘাচ্ছন্ন বাংলার আকাশ সরে নতুন সূর্যের রশ্মি যেন যেন একটা গলদ থেকেই দূর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো

টলারেন্স নীতি ঘোষণা করলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে দূর্নীতি যেনো কমছেই না। রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্রে বালিশ কেলেক্ষারি, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ডিজির অপসারণ এবং তার ড্রাইভার অবৈধ সম্পদ অর্জন, প্রায় সকল প্রকার চাকরীতে যুষ গ্রহণ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দূর্নীতি করা হচ্ছে। সরকার অনেক চেষ্টাও দূর্নীতির গতি রোধ করতে পারছে না। আমরা দূর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ চাই।

বর্তমানে নারীর প্রতি সহিংসতা যেন সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে দৃতগামী অশ্বের মতো সামনে এগোচ্ছে। অহরহ ধর্ষণ হচ্ছে, নারীদের অসম্মান করা হচ্ছে। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীই নারী। তবুও তারা যোগ্য সম্মান পান না। মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অসামান্য অবদান ছিলো। তিন লক্ষ মা বোন তাদের সম্মুখ হারিয়েছেন। স্বাধীনতার ৫০ বছর তথা সুবর্ণজয়ন্তীতে এসে নারীদের প্রতি এই সহিংসতা কোন ভাবেই মানা যায় না। মুক্তিযুদ্ধের পর যখন ধর্ষিতা মা বোন দের তাদের পরিবার ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করে তখন সাধারণ মানুষের একমাত্র আশ্রয়স্থল বঙ্গবন্ধু বুক চাপড়ে বলেছিলেন” সকল ধর্ষিতার বাপের নামের জায়গায় আমার নাম লিখে দে আর ঠিকানা ধানমন্ডি ৩২ নং দিতে বল”。 যেভাবেই হোক নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ করতে হবে। আমরা এমন একটা দেশ চাই যেখানে নারী পুরুষ সমাজিক একটা সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা থাকবে।

মাদক একটা খুব বড় সমস্যা। যুবসমাজ ধ্বংসের একমাত্র দায় মাদক ব্যাবসায়ীদের। যুবসমাজ হলো সকল জাতির আশা আকাঞ্চ্ছার প্রতীক। সরকার কিছু মাদক চোরাকারবারীকে আইনের আওতায় এনেছে কিন্তু রাঘববোয়ালেরা সবসময় ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে। গাছের শাখা প্রশাখা কাটলেও গাছ মারা যায় না যদি না মূলোৎপাটন করা না হয় তেমনি মাদক ব্যাবসার মূল হোতাদের মূলোৎপাটন করতে হবে। আমরা মাদক মুক্ত সুস্থ সমাজ চাই।

বর্তমানে দেশে নতুন একটা সিস্টেমের চালু হয়েছে। তাহলো ইস্যু সিস্টেম। নতুন এক একটা ইস্যু আসে আর আগের টা ঢাকা পড়ে যায়। সেসব নিয়ে কেউ কথা বলে না।

সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো বিভিন্ন সময়ে একান্তরের পরাজিত শক্তির উত্থান হওয়া। ১৯৭৫ সালে জাতির পিতার হত্যার মাধ্যমে দেশকে আবার পুনরায় পাকিস্তানে রূপান্তরের মনোবাসনা নিয়ে কাজ শুরু করে তারা। যার সর্বশেষ কর্মকাণ্ড এবছর দুর্গাপুজার সময়ে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে দেশকে অস্তিত্বশীল করার প্রচেষ্টা। এই কর্মকাণ্ডের অংশ স্বরূপ তারা বিভিন্ন সময়ে দেশের উদারামনক মানুষের উপর হামলা করেছে এবং হত্যা করেছে। যাতে দেশের উন্নতি স্থু হয়ে যায়। উদার এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাহিনী মানুষের দিকনির্দেশনা যেন তরঙ্গ প্রজন্ম না পায়, তারা যেন মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে না পারে, তারা যেন অন্ধকারে পতিত হয় তার একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রচেষ্টার অংশ এটা। স্বাধীনতার পর দেশে বিভিন্ন সময়ে জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটে। জনপ্রিয় লেখক ভূমায়ন আজাদ, ধর্মাপক মোহাম্মদ ইউনুস, ব্লগার অভিজিত সহ উন্নত চিত্তশীল প্রগতিশীল কিছু মানুষকে হত্যা করে যাতে এই পথে আসতে চাওয়া বা উদার মনোভাব পোষণ করা মানুষের মনে ভীতির সংগ্রাম করে। এসব হত্যাকাণ্ডের বিচার হ্যানি

এখনো। যদি সঠিক বিচার হতো এবং অপরাধীরা শাস্তি পেত তাহলে অন্তত এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতো না।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। একটা জাতি কতটা উন্নত তা বিচার করা হয় সেই জাতির শিক্ষা শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা দিয়ে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে হাজারটা প্রশ্ন থেকে যায়। দু'বছর আগেও এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস ছিল নিয়মিত ঘটনা। বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস সব সময় হয়ে থাকে। গত কিছুদিন আগেও একটা চাকরির পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। দেশের বড় সমস্যার মধ্যে বেকারত্ব অন্যতম। লাখ লাখ বেকার রয়েছে। যাদের বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে না। এর পেছনে অনেকাংশে দায়ী আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষার্থীরা স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে যা পড়ে চাকরির পরীক্ষায় তার কিছুই আসেনা। চাকরির জন্য আবার নতুন করে পড়াশোনা করতে হচ্ছে। একজন শিক্ষার্থী তার সমগ্র শিক্ষা জীবনে যা পড়ে আসলো ঠিক চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়ার সময় তার ৯৫ ভাগই কাজে লাগছে না। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা দিন দিন বেকার তৈরির যন্ত্র পরিণত হচ্ছে। আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা অন্যান্য দেশের শিক্ষার্থীদের তুলনায় কোনো অংশে কম মেধাবী নয়। কিন্তু যথাযথ পরিচর্যা, পরিকল্পনা এবং অবকাঠামোগত দুর্বলতার কারণে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মেধা কাজে লাগাতে পারছে না দেশ। এর মধ্যে আবার রয়েছে হাজারো দুর্নীতি। নিয়োগ বাণিজ্য, ভর্তি বাণিজ্য চলছে অহরহ। যার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দক্ষ শিক্ষক পাচ্ছে না শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। ছাত্রাবাদ শিখতে পারছে না। এই সমস্যাটা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রকট আকার ধারণ করেছে। নিয়োগ বাণিজ্যের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে পাঠদান না করে সময় দিচ্ছে রাজনীতিতে, লেজুড়বৃত্তিতে। আর তারা তো দক্ষও না যে ছাত্র দের সঠিক শিক্ষা দিবে। এছাড়া রয়েছে গবেষণা জালিয়াতির ঘটনা। দেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনেক শিক্ষকের বিরুদ্ধে রয়েছে গবেষণা জালিয়াতির অভিযোগ।

এসব দুর্নীতির প্রভাব পড়ে দেশের ভবিষ্যতের উপর। বিভিন্ন সেক্টরে দুর্নীতি গুলো দেশের ভবিষ্যৎ কে পঙ্ক করে দিচ্ছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নেই যথেষ্ট গবেষণার সুযোগ। বিশেষ আমাদের দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো অবস্থান নাই। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি গুলো বন্ধ না করতে পারলে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে না পারলে দেশের অগ্রগতি কখনোই সম্ভব নয়। তাই সরকারের উচিত নিয়োগ-বাণিজ্য ভর্তিবাণিজ্য রোধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া। চাকরির পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের সাথে যুক্ত মানুষদের কঠোর শাস্তির আওতায় আনা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার পরিবেশ সৃষ্টি করা। শিক্ষা ক্ষেত্রে সকল প্রকার দুর্নীতি দমন করা। দেশের স্বাক্ষরতার হার আগে থেকে বেড়েছে ঠিক কিন্তু সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে বেকারত্ব কমানোর ব্যবস্থা হয় নাই এখনো। এবিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। যদি উপর্যুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে তোলা যায় তাহলে বাইরে থেকে ইঞ্জিনিয়ার কিংবা জনবল আনতে হবে না নিজের দেশের শিক্ষার্থীদের দিয়ে কাজ হবে। এতে দেশ এগিয়ে যাবে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার সম্ভব হবে।

বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বিচারের দীর্ঘসূত্রতা কমিয়ে আনতে হবে। কারণ অনেক সময় বিভিন্ন প্রভাবশালী মহলের চাপে অনেকে পিছিয়ে যায়। আবার দীর্ঘদিন ধরে মামলা চালাতে না পেরে অনেকে মামলা তুলে নেয়। তাই এমন কিছু পদক্ষেপ নেওয়া উচিত যাতে অল্প সময়ে বিচারকার্য সম্পন্ন করা যায়।

হাজার বছর ধরে দেশের সকল ধর্মের মানুষ সুখে শাস্তিতে বসবাস করে আসছে। সাধারণ মানুষের মাঝে ধর্ম নিয়ে কোনো বামেলা নেই। কিন্তু কিছু সাম্প্রদায়িক শক্তি সাধারণ মানুষের এই সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করে আসছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় সংখ্যালঘুদের উপর বেশি অত্যাচার করা হয়েছে। সংবিধানের চারটি মূল স্তরের একটা হলো ধর্মনিরপেক্ষতা। বঙ্গবন্ধু ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাকে হত্যা করার পর বৈরেশাসকেরা সব নিয়ম ভেঙে সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন ভাবে চাপে রেখেছে। স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তি রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেও ৭২ এর সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা পুরোপুরি ফিরিয়ে আনতে পারে নাই। এটা সংখ্যালঘুদের বুকে আজও কাটার মতো বিধে আছে। এই সরকার মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের দল। সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষায় এরা অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু কিছু সাম্প্রদায়িক শক্তি সংখ্যালঘুদের উপর বিভিন্ন ভাবে অত্যাচার চালাচ্ছে। আর এসব অপরাধের তেমন কোন চোখে পড়ার মতো বিচারও হচ্ছে না। রামুর বৌদ্ধ মন্দিরের অধ্যক্ষ বলেন মন্দির কাঠের থেকে দালান হয়েছে কিন্তু রাতে ঘুম আসে না। কারণ মন্দিরে হামলাকারীরা এখন চেতের সামনে ঘুরে বেড়ায়। নতাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়ার সাহস কারো নাই। সকল অপরাধীদের বিচার করতে হবে তা নাহলে এমন ঘটনা ঘটেই থাকবে। এবছর সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজার সময় সাম্প্রদায়িক অপশক্তির তান্ত্র দেখেছে দেশবাসী। যদি পূর্বের ঘটনাগুলোর সঠিক বিচার হতো তাহলে এই ঘটনা দেখতে হতো না। এর ফলে সমগ্র বিশ্বের কাছে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের মনের বিশ্বাস নড়বড়ে হয়েছে। দেশ স্বাধীনের উদ্দেশ্য গুলোর মধ্যে একটা ছিলো অসাম্প্রদায়িক দেশ গঠন। কিন্তু আজ স্বাধীনতার ৫০ বছর পর এসে সাম্প্রদায়িক অপশক্তির উত্থান কারোরই কাম্য নয়। আমরা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একটা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ চাই।

সর্বোপরি আমরা দুর্নীতি, ক্ষুধা, মাদক, দারিদ্র্য মুক্ত অসাম্প্রদায়িক এক বাংলাদেশ চাই যেখানে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে নারী পুরুষের সমাধিকার ভিত্তিক একটা সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা থাকবে।

লেখকঃ

দপ্তর সম্পাদক; বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, শাখা।

প্রকাশ তথ্যঃ

পত্রিকাঃ মানবকর্ত্তা।

তারিখঃ ২০-১২- ২০২১।



# শিশুদের জন্য নিশ্চিত করতে হবে নিরাপদ ইন্টারনেট জেবা ফারিহা

ইন্টারনেট কথাটার সাথে আমরা সবাই পরিচিত। বর্তমানে পৃথিবীব্যাপি ইন্টারনেট এর প্রচলন বেশী। ২০০০ সাল থেকে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৮০০০ গুণ বেড়েছে। যেকোনো তথ্য আদান-প্রদান করা, জ্ঞান করা এমনকি দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের তথ্য সংগ্রহ করা যায় এই ইন্টারনেট এর মাধ্যমে। করোনা পরিস্থিতির কারণে আমরা সবাই ইন্টারনেট এর ওপর নির্ভর হয়ে পরেছি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণে আমাদের সকল কাজ ইন্টারনেট এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। স্কুল-কলেজ এর ক্লাস ও পড়াশোনা ইন্টারনেট নির্ভর হয়ে থাকে। শিশুরাও এই ইন্টারনেট ব্যবহার করে ক্লাস ও পড়াশোনা করছে। ইন্টারনেট এর যেমন ভালো দিক রয়েছে, তেমনি খারাপ দিক ও রয়েছে। তাই শিশুদেরকে নিরাপদ ইন্টারনেটের সুবিধা দেওয়া আমাদের সকলের কর্তব্য।

ইন্টারনেটের অধিক ব্যবহার আমাদের সময় নষ্ট করে। আজকাল ইন্টারনেটে অনেক ধরণের গেইম পাওয়া যায় ফলে শিশুরা এসবের দিকে ঝুঁকে পরছে। পাবজি, ফ্রি-ফ্যায়ারের মতো গেইম গুলোয় শিশুরা অনেক বেশী আসক্ত হয়ে পরেছে। এমনকি ফেসবুক, মেসেঞ্জারের মতো সোশ্যাল মিডিয়ায় অতিরিক্ত সময় ব্যয় করছে। এতে করে তাদের পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। তাদের পড়াশোনায় মনোযোগ আসছে না। ইউনিসেফ এর জরিপে বলা হয়েছে, ছেলে শিশুদের মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রচলন বেশী, যা ৬৩%। এমনকি এই জরিপে আরও একটি বার্তা দেওয়া হয়েছে তা হলো, ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ৩২ ভাগ শিশু চরম ঝুঁকিতে রয়েছে; যা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

অতিরিক্ত ইন্টারনেট ব্যবহারের ফলে শারীরিক ও মানসিক সুস্থিতারও ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। সবসময় ক্রিন এর দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ জুলে, মাথা ব্যথা করে, দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। বর্তমানে আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করে থাকি যে, শিশুদের চোখে চশমার ব্যবহার বেশী। আবার শিশুরা মানসিকভাবেও অসুস্থ হয়ে যায়। সবসময় ইন্টারনেট এ গেম খেলা, ভিডিও দেখা, সোশ্যাল মিডিয়া চালানোতে এতটা নির্ভর হয়ে যায় যে, তারা মাঠে খেলতে যায় না। তাদের নিজস্ব চিন্তাশক্তি হ্রাস পাচ্ছে। আপনজনের সাথে সময় কম কাটায়। সবসময় ঘরে বন্দী জীবনযাপন করে, ফলে তাদের মেজাজ রঞ্চ হয়ে যায়।

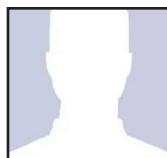
বর্তমানে শিশুরা সাইবার ক্রাইম এরও শিকার হয়। অনলাইনে অপরিচিত ব্যক্তিদের সাথে কথা বলে, ছবি আদান-প্রদান করে অনেকসময় ডিজিটাল উৎপীড়ন এর শিকার হয়। শিশুরা ইন্টারনেট সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে অবগত না হওয়ায় এমন ভুল করে। এমনকি অনেক সময় খারাপ বন্ধুদের সাথে মেলামেশায় নেশাদ্বয় ও অ্যালকোহলে আসক্ত হয়ে পরে। সাইবার বুলিং এর শিকার হয়। আবার, কিশোর অপরাধের সাথে জড়িয়ে যায়। এতে করে অনেক শিশু মানসিক স্বাস্থ্যের ভ্রান্তির মুখে পরে।

ইন্টারনেট মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে শিশুরা অসামাজিক হয়ে পরছে। তারা বাঙালি সংস্কৃতি চর্চা থেকে পিছিয়ে পরছে। সমাজের সাথে মিশতে চায় না। ইন্টারনেট এর অসামাজিক সংস্কৃতির সাথে তারা জড়িয়ে পরছে। আমাদের সকলের উচিত শিশুদেরকে বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা করানো। আবার, অতিরিক্ত ইন্টারনেট এর ফলে শিশুদের খাদ্যাভাসে এবং ঘুমে পরিবর্তন আসে। তারা সময়মতো খাওয়াদাওয়া করে না এবং পুষ্টিকর খাবার খায় না। আবার রাত জেগে অনেক শিশু ইন্টারনেট চালায়। তাদের রাতে ঠিকমতো ঘুম হয় না ফলে সকালের সকল কাজে তাদের ব্যাঘাত ঘটে। সারাদিন ক্লাস্ট অনুভব করে। তাদের স্মৃতিশক্তি প্রথর থাকে না।

তাই, শিশুদের নিরাপদ ইন্টারনেট নিশ্চিত করতে হবে। শিশুরা যেন অতিরিক্ত সময় ইন্টারনেটে ব্যয় না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বাবা-মাকে খেয়াল রাখতে হবে শিশুরা কিভাবে ইন্টারনেট চালাচ্ছে; এমনকি শিশুদের সময় দিতে হবে। তাদের চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। শিশুরা ইন্টারনেটে কাদের সাথে মিশছে, কাদের সাথে কথা বলছে সেদিকে নজর দিতে হবে। ভালো-মন্দ জ্ঞান বুঝিয়ে দিতে হবে। আমাদের সরকারের উচিত ইন্টারনেট এর ইতিবাচক দিকগুলো সকলের সামনে তুলে ধরা, কিভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করে আমরা উপকৃত হতে পারি। তাহলেই, আমরা শিশুদের জন্য নিরাপদ ইন্টারনেট নিশ্চিত করতে পারব।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশ তথ্যঃ  
পত্রিকাঃ ভোরের কাগজ।  
তারিখঃ ১১-০২-২০২২।



# বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে পদ্মা সেতুর ভূমিকা অনস্থীকার্য জুবায়েদ মোস্তফা

বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত শব্দের তালিকা করা হলে একদম ওপরের দিকেই থাকবে পদ্মা সেতুর নাম। আমাদের সমস্ত আবেগ অনুভূতির সাথে মিশে আছে শব্দটি। নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য অনেক বড় একটি অর্জন হলো পদ্মা সেতু। পদ্মা

সেতু এখন আর স্থপ

বিশেষ। পদ্মা সেতুর শেষ এখন শুধু বাকি জুন উদ্বোধনের মধ্য দেশের বৃহত্তম এই ৬.১৫ কিলো মিটার।

পদ্মা সেতুকে নিয়ে আর কল্পনার সমগ্র বাংলা বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জায়গা, প্রশান্তিও অপেক্ষার প্রহর গুনছে দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ পিছিয়ে আছে অন্যান্য



নয় বাস্তবতার অংশ  
সকল কার্যক্রম  
আনুষ্ঠানিকতা। ২৫  
দিয়ে যাত্রা শুরু করে  
সেতু, যার দৈর্ঘ্য

আমাদের উন্মাদনা  
অস্থংবিন্দু নেই।  
করে দক্ষিণ  
জন্য অনুভূতির  
বটে। তাই মানুষ  
পদ্মা সেতু নিয়ে।  
স্বত্বাবতই অনেকটা  
সকল অঞ্চল হতে।

যোগাযোগ ব্যবস্থাও সেই কথার পক্ষেই সাক্ষী দেয়। পদ্মা সেতুর ফলে দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষের সন্তাননার দ্বারা উন্মোচন হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় ও বিপ্লব সাধন। সেতু নির্মাণ ব্যয় যুক্ত হয়ে বিসিআর ২ দশমিক ১ এবং ইআইআরআর দাঁড়াবে ২২ শতাংশ। এর অর্থ হল, এ সেতু নির্মাণ অর্থনৈতিক বিবেচনায় লাভজনক হবে। দক্ষিণাঞ্চলের ২১টি জেলার সঙ্গে ঢাকার যোগাযোগ দূরত্ব ২ থেকে ৪ ঘণ্টা কমে যাবে। রাজধানীর সঙ্গে সরাসরি সংযোগ সহজ হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে, কাঁচামাল সরবরাহ সহজলভ্য হবে এবং শিল্পায়নের প্রসার ঘটবে, অর্থাৎ ছেট-বড় নানা শিল্প গড়ে উঠবে এবং কৃষির উন্নয়ন হবে। ডিজাইন পরামর্শক ছাড়াও বিশ্বব্যাংকের স্বাধীন পরামর্শক এবং সেতু বিভাগ নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানও সেতু নির্মাণের অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করেছে। এসব সমীক্ষা প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, সেতু নির্মাণের অর্থনৈতিক প্রভাবে দক্ষিণাঞ্চলের বার্ষিক জিডিপি ২ শতাংশ এবং দেশের সার্বিক জিডিপি ১ শতাংশের অধিক হারে বাড়বে।

আমরা নির্ধার্য বলতে পারি, এ সেতু নির্মাণের ফলে দেশের সময়িত যোগাযোগ কাঠামোর উন্নতি হবে। দেশের দক্ষিণাঞ্চল ট্রাঙ্ক-এশিয়ান হাইওয়ে (এন-৮) ও ট্রাঙ্ক-এশিয়ান রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে। ভারত, ভূটান ও নেপালের সঙ্গে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সংযোগ স্থাপিত হবে। সেতুর উভয় পাড়ে অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্ক ও প্রাইভেট শিল্পনগরী গড়ে উঠবে। বিনিয়োগ বাড়বে এবং বাড়বে কর্মসংস্থান। মোংলা ও পায়ারা সমুদ্রবন্দর সচল হবে। পর্যটনশিল্পের প্রসার ঘটবে এবং দক্ষিণ বাংলার কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত, সুন্দরবন, ষাট গমুজ মসজিদ, টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজার, মাওয়া ও জাজিরা পাড়ের রিসোর্টসহ নতুন পুরনো পর্যটনকেন্দ্র দেশি-বিদেশি পর্যটকদের পদ্ধতারে মুখরিত হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় ও দারুণ প্রভাব রাখতে সক্ষম হবে। পদ্মা সেতুর দরুণ রাজধানীর সাথে সহজেই স্থায়িভাবে যোগাযোগ সম্ভব হওয়ার কারণে যোগ্যতা সম্পন্ন অনেক শিক্ষক পাবে দক্ষিণ অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়ে।

তাছাড়া দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা শিক্ষার্থীদের ভিড় লক্ষ্য করা যাবে তখন। শিক্ষার্থীদের মাঝে দক্ষিণ অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার প্রবণতা অবিশ্বাস্য ভাবে বৃদ্ধি পাবে। যাশিক্ষা ক্ষেত্রে দারুণ পরিবর্তন সাধন করবে।

পদ্মা সেতু যেমন দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের প্রায় ৫ কোটি মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক সুবাতাস বয়ে আনবে, তেমনই কমপক্ষে এক দশমিক পাঁচ শতাংশ জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও নিশ্চিত করবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। ফলে, লাভবান হবে পুরো দেশের মানুষ। প্রসার হবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও পর্যটনে। ভবিষ্যতের বাংলাদেশ নির্মাণে এই সেতুর প্রভাব হবে অপরিসীম। মোটকথা, যোগাযোগের ক্ষেত্রে পদ্মা সেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পদ্মা সেতু উন্মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জেলার যোগাযোগ অত্যন্ত সহজতর হবে। সকল জলপনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে পদ্মা সেতু আজকে বাংলাদেশের একটি বাস্তবতা। এটি শুধু বাংলাদেশের জন্যই গর্বের বিষয় নয়, এটি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জন্য একটি শিক্ষণীয় উন্নয়ন প্রকল্প হয়ে থাকবে।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।



# বিলুপ্ত প্রায় ‘শের শাহ সড়ক’- এর খোঁজে এস এ এইচ ওয়ালিউল্লাহ

সড়ক-ই-আজম বা শের শাহ সড়ক। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে সোনারগাঁ হয়ে ফরিদপুর, মাঞ্জুরা, যশোরের ওপর দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া হয়ে পাকিস্তানের পেশোয়ারের ওপর দিয়ে আফগানিস্তানের কাবুল পর্যন্ত প্রায় তিনি হাজার কিলোমিটারের এক দীর্ঘ সড়কপথ, নির্মাণ করেন উপমহাদেশে আফগান সুরি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শের শাহ সুরি। রাস্তাটি এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন ও দীর্ঘতম সড়কপথ। সড়কটির বর্তমান অবস্থা নিয়ে কথা বলার আগে এই সড়ক নির্মাণের মহানায়ক এবং সড়কের আগের অবস্থা জানতে পাঠকদের সঙ্গে একটুখানি ইতিহাসের রাজ্য উকি দিতে চাই।

শের শাহ ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশে সুরি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং দলিল সিংহাসনের অধিপতি। তিনি প্রথমে ছিলেন বিহারের

সুলতান বাহার খান লোহানীর রাজকর্মচারী। বাহার খানের মৃত্যুর পর তার নাবালক ছেলে জালাল খান উত্তরাধিকার সুন্দর বিহারের সিংহাসনে বসেন। এ সময় শের খান বিহারের নায়ের নিযুক্ত হন। এ সময় ধীরে ধীরে সৈন্যবাহিনীর ওপর কর্তৃত প্রতিষ্ঠা করে শের খান বিহারের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন। ১৫৩৪ সালে সুরক্ষাগড়ের যুদ্ধে বাংলা ও বিহারের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে শের খান বিহারের সুলতান হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। ১৫৩৭ সালে শের খান বাংলা অধিকারের জন্য গৌড় অবরোধ করেন। মোগল সমাট ভূমায়ন তাব বিরুদ্ধে বাংলা অভিযোগে আগস্ত হলে শের খান বাংলা তাগ করেন। এ সময় মোগল সমাট আগায় প্রত্যাবর্তনের

সিন্ধান্ত নেন এবং পথিমধ্যে বন্ধারের কাছাকাছি স্থান চৌসায় ১৫৩৯ সালে শের খানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই যুদ্ধে সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে শের খান বাংলা, বিহার ও আসামের বিস্তৃত অঞ্চলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন এবং ‘শের শাহ’ উপাধি প্রদণ করে নিজ নামে মুদ্রা জারি করেন। পরের বছর ১৫৪০ সালে ফের সম্রাট হুমায়ুন শের শাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে বিলগামের যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে শের শাহ দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, মৌর্য সাম্রাজ্যের সময় থেকেই গঙ্গার মুখ থেকে সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত প্রাচীন একটি রাস্তা ছিল। রাস্তাটিকে ব্যাকরণবিদ পাণিনি ‘উত্তর পথ’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পরে সম্রাট অশোক এই রাস্তার পুনর্নির্মাণ করেন। এরপর শের শাহের শাসনামলে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে শুরু করে একেবারে আফগানিস্তানের কাবুল পর্যন্ত রাস্তাটির সম্প্রসারণ এবং ব্যাপক সংস্কার করা হয়। এই সময়ই ‘শের শাহ সড়ক’ নামে রাস্তাটির নামকরণ করা হয়। যুগে যুগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাসক সড়কটির সংস্কার করেন। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে উত্তর ভারতে এই সড়কের দূরত্ব পরিমাপের জন্য দুই মাইল পরপর ‘কস মিনার’ নির্মাণ করা হয়। সর্বশেষ ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৩৩-১৮৬০ সালের মধ্যে এই সড়কের সংস্কার করে ‘গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড’ নামে নামকরণ করা হয়।

এই দীর্ঘ সড়ক নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনিক কাজের গতি বৃদ্ধি করা। পাশাপাশি সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষার কৌশলগত দিক সামনে রেখে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা। শের শাহের শাসনামলে এটিই ছিল প্রধান সড়ক। সড়কটিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বহু নগর, জনপদ, বাজার ও ব্যবসাকেন্দ্র। এই সড়কের দুই ধারে তিনি ছায়া দানকারী বৃক্ষরোপণ করা হয়। নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর স্থাপন করেন সরাইখানা। এগুলো ডাকচোকি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। দ্রুত সরকারি নির্দেশ ও সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য ঘোড়া বদলের কেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহৃত হতো এসব সরাইখানা।

বর্তমানে ভারত, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানে সড়কটি এশিয়ান হাইওয়ে হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশগুলো গুরুত্বের সঙ্গে সংরক্ষণ করছে ঐতিহাসিক এ সড়কের নানা স্মৃতিচিহ্ন। কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাংলাদেশ অংশে সড়কটির অস্তিত্ব আজ প্রায় বিলীন হওয়ার পথে। চট্টগ্রাম থেকে শুরু করে সোনারগাঁ হয়ে যশোরের বেনাপোল পর্যন্ত বাংলাদেশ অংশে বিস্তৃত এই সড়কের অস্তিত্ব রয়েছে এখন শুধু যশোরের বাঘারপাড়া এবং মাগুরার শালিখা উপজেলার সামান্য একটু অংশে। ব্যবহৃত হচ্ছে আঘেলিক সড়ক হিসেবে। স্মৃতিচিহ্ন বলতে যশোর এবং মাগুরার সীমান্তবর্তী এলাকা দয়রামপুর গ্রামে রাস্তার একটি নামফলক মাত্র। যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার দয়রামপুর গ্রামের মধ্য দিয়ে মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলার শতপাড়া, শরকণ্ডা, দেশমুখপাড়া, বুনাগাতী গ্রামের মধ্য দিয়ে মহম্মদপুর উপজেলার নহাটা গ্রাম হয়ে ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার মধ্য দিয়ে ঢাকার অদূরে সোনারগাঁ অভিমুখে সড়কটির রুট ছিল। ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার হাটখোলাচর গ্রামে এই শের শাহ সড়কের স্মৃতিচিহ্ন ইট-চুন-সুরকি নির্মিত অর্ধচন্দ্রাকৃতির একটি সেতু অবশিষ্ট ছিল। সম্প্রতি উন্নয়নের নামে ভেঙে ফেলা হয়েছে ৫০০ বছরের ঐতিহাসিক স্থাপনাটিকে।

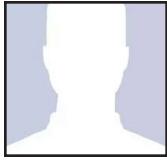
শের শাহ সড়কের স্মৃতিচিহ্ন অনুসন্ধানে গিয়ে মাগুরার শালিখা উপজেলার জয়রামপুর গ্রামের বর্ষীয়ান আবুল খালেকের সঙ্গে দেখা হয় আমাদের। তাকে শের শাহ সড়কের কথা জিজ্ঞাসা করতেই জানান, ‘পাকিস্তান শাসনামল তো বটেই, স্বাধীনতার পরও শের শাহ সড়কটি এই অঞ্চলের স্তলপথে যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সড়কের প্রতি এক কিলোমিটার পরপর ব্রিটিশ শাসনামলে মাইলফলক হিসেবে গোলাকার বিশেষ এক ধরনের পিলার বসানো হয়েছিল। ম্যাগনেটের গুজবে চোরাকারবারিরা পিলারগুলো তুলে নিয়ে গেছে বেশ কিছুকাল আগেই।’

লেখক: শিক্ষার্থী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও সভাপতি, বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

প্রকাশ তথ্যঃ

পত্রিকাঃ সমকাল।

তারিখঃ ২৮ আগস্ট ২০২১।



# দয়জায় নোটিস ও একটি আত্মহত্যা মোহাম্মদ নেজাম উদ্দিন

ইংরেজি বর্ষপঞ্জীর খুব চমৎকার একটি তারিখ ২-২-২০২২। এমন একটি তারিখকে দুনিয়ার কত আদম সন্তান জীবনে কতশত শ্রেষ্ঠ উপলক্ষ্য বানিয়ে নতুন করে শুরু করেছে তা হয়তো আমাদের গণনার বাইরে। হয়তো কারো এই দিনে সন্তান জন্মেছে, কারো যুগলবন্দী জীবন শুরু হয়েছে, কিংবা দীর্ঘ বেকার জীবন ঘূঢ়িয়ে একটা চাকরি পেয়েছে, যাতে পরিবারের হালটা ধরতে পারবে, কিংবা কারো কারো এই ধরাধামই ত্যাগ দিতে হয়েছে। অর্থাৎ তারিখটি কারো শুরু, আবার কারো শেষ। কিন্তু এমনসব বাহারি পদের শুরু কিংবা শেষ চাপিয়ে ইতিহাসের পাতায় কলঙ্কের এক অধ্যায় রচিত হলো পৃথিবীর জীবনীতে। আর অধ্যায়টি একটি ফেইসবুক লাইভ! অতঃপর একটি আত্মহত্যা।

২ৱা ফেব্রুয়ারি রাত ৯টার দিকে লাইভে এসে প্রায় ১৬.২৫ মিনিটের মাথায় চিত্রনায়ক রিয়াজের শঙ্গড় ব্যবসায়ী আবু মুহসিন খান (৫৮) নিজ নামে লাইসেন্সকৃত অঙ্গের ট্রিগার মাথায় চেপে নিজের মূল্যবান জীবনটা শেষ করে দেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন ঘটনা এর পূর্বে ঘটেছে কি না জানিনা। তিনি চলে গেলেন ওই ১৬.২৫ মিনিটের বিষ্ফোরক লাইভটি রেখে। চলে গেলেন জীবনটাকে তুচ্ছ করে একাকীভূত জীবনের অসহায়ত্বের ইতি টেনে আরেক একাকী কবর জীবনে। কিন্তু সমাজ কিংবা এই রাষ্ট্রের নাগরিকের কাছে অথবা মানুষে মানুষের আপনের পানে রেখে গেলেন বেশ কিছু প্রশ্ন। যার মাঝে সবচেয়ে বড় প্রশ্নটা “মানুষ আসলে একটা জীবনে কি এমন চাই?” কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ, ব্যাংক ব্যালেন্স, ধনসম্পদ, নাকি ভোগবিলাস? মুহসিন খান বলে গেলেন তার কিছুই নয়। মানুষ শুধু চাই জীবনে ভালবাসা, নিঃসঙ্গতার সঙ্গী, একটা ভরসার হাত, একটা অভয় দেবার মানুষ। তিনি এও প্রমাণ করে গেলেন এই সমাজ কতটা পশ্চত্ত বরণ করে আছে। কতটা স্বার্থপরতায় ডুবে আছে। কেমন ভোগবিলাসে মেতে আছে। এই লোকটি লাইভ চলাকালীন ওই ১৬.২৫ মিনিটের কথাগুলোতে যা বলেছেন তা এই মায়াভরা পৃথিবীর প্রতিটা আদমির জন্য ভাবনার খোরাক। তার লাইভের ওই সময়ে দেশের রাজধানী, যাকে আমরা বলতে পারি সবচেয়ে উন্নত সুযোগ-সুবিধার শহর, সেই শহরের আরো উন্নত ব্যবস্থাপনার ধানমন্ডি, ঘোল মিনিট পর দুনিয়া ছেড়ে যাচ্ছে এমন মানুষকে আটকাতে পারেনি। এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নাকি মানুষের সহজ ও দ্রুত যোগাযোগ মাধ্যম। কিন্তু দীর্ঘ ঘোলটা মিনিট চলে যাব, যাচ্ছ বলে মৃত্যুর কথা বলা মানুষটা হাজার হাজার লাইভ দর্শক পেয়েছে, মন্তব্যকারী পেয়েছে, রিয়েষ্টকারী পেয়েছে, শেয়ার করে তার মৃত্যু সংবাদটা প্রচারকারী পেয়েছে, একজনও কি তার পাশে দাঁড়াতে পেরেছে? তার পরিবার কি করেছে, কি কারণে সে চলে গেলো সেটা না হয় পরে ভাবা যাক, কিন্তু আল্লাহতো তার জীবনের ঘোলটা মিনিট আমাদেরকে দিয়েছিল, সমাজের মানুষকে দিয়েছিলো, দেশের মানুষ পেয়েছিলো, তার উপর দ্রুতগতির ইন্টারনেটের দুনিয়া, কই মুহসিন খানের এই দেশ, এই সমাজ পেরেছে কি তার পাশে দাঁড়াতে, তাকে আটকাতে?

মানুষটা তার ঘরে প্রবেশের দরজাটাও কিন্তু বন্ধ করেনি। বরং কেউ যেন আসলে তাকে না জানিয়েও ডুকতে পারে সেই নোটিশও দরজায় টাঙ্গিয়ে দিয়েছেন—”মামা, দরজা খোলা, হাতল চেপে ডুকতে পারেন।” আবার লাইভে এ-ও তিনি বলেছেন আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকে এখানে আমার আপনজন আমার লাইভটি দেখছেন, আপনারা আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। কই তারা ওই লাইভে কমেন্ট করা ছাড়া আর কি করেছে? মানুষটার মাথায় গুলি মারার সাথে সাথে দেখি ওনার ফোন বেজে উঠে, এর আগের ১৬ মিনিটে একবারও না, তাহলে এই সমাজ কি চলে যাবার অপেক্ষা করে? আবার তার ওই লাইভে পুরো ৫০ মিনিট তিনি লাশ হয়ে স্থিনে ছিলেন, কেউ যায়নি। কিছু হলেই পুলিশকে খবর দিতে হবে, একজন মানুষ মরে যাচ্ছে সেটা আটকানোও কি পুলিশের কাজ? আমি মানুষ হয়ে কি কোন দায় নেই? প্রশ্নগুলো আমাদের ভাবনার আমাদের বর্তমান আর ভবিষ্যত সমাজ পরিস্থিতির প্রমাণ দিচ্ছে। ও দুনিয়ার মানুষ এবারতো সংবিহ্ন্ত ফেরাও।

এদিকে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০২১ সালে ১০১ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আঁচল ফাউন্ডেশনের গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। গবেষণায় দেখা যায়, আত্মহত্যাকারীদের ৬১ শতাংশের বেশি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। আর আত্মহত্যার প্রবণতা ছাত্রীদের চেয়ে ছাত্রদের বেশি। একটু তাবুনতো হয় সন্তান নয় সন্তানের কষ্টে বাবা। তবুও কি আমাদের বিবেক, এই সমাজ, এই রাষ্ট্র জাহ্নত হবে না?

দেখুন একজন আত্মহত্যাকারীর প্রতি না চাইতেই সমবেদনা ও দৃঢ় চলে আসে আমাদের। সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু তাই বলে এমনটা স্বাভাবিক হওয়া উচিত নয়, যে সমবেদনা প্রকাশ একজন আত্মহত্যাকারীর মৃত্যুকে সঠিক বলার পর্যায়ে চলে যায়, বরং এমন মৃত্যুর সমবেদনাকে মনে চেপে প্রচণ্ড ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যানের সুরে আত্মহত্যার মতো জঘন্য পাপকে নিকৃষ্টতরভাবে প্রচার করা উচিত। যেন আশেপাশের আর দশজন দেখে শিক্ষা নেয়, যেন আত্মহত্যা করা দূরে থাক ভাবতেই ভয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা করে।

আমি কিংবা আপনি ততক্ষণ মুমিন বলে দাবি করতে পারি না, যতক্ষণ না আল্লাহর মনোনীত রাসূল (স.) এর আদর্শকে জীবনে পূর্ণসভাবে অনুসরণ করতে পারি। তাই আসুন একজন আত্মহত্যাকারীর জীবন বিনাশকে সমবেদনার চোখে নয়, ঘৃণাভরে আর দশজনের জন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আল্লাহর দান মূল্যবান নেয়ামত হায়াতকে নিজের জন্য, নিজের নাজাতের কাজে ব্যয় করি। জীবনকে সবকিছুর উর্ধ্বে ভালবাসতে শিখি।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকাশ তথ্যঃ

পত্রিকাঃ প্রতিদিনের সংবাদ।

তারিখঃ ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২।



# জুনিয়র-সিনিয়র সংকটের শেষ কোথায়? গুমায়রা আন্জুম

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস শিক্ষার্থীদের মুক্ত বিচরণ কেন্দ্র। দেশের প্রতিটা অঞ্চল থেকে এমনকি দেশের গাছি পেরিয়ে দেশের বাইরে থেকেও অনেক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে তাদের মেধা, সুজনশীলতা বিকাশ ঘটিয়ে নিজেকে সফলতার শীর্ষে নিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু এক শ্রেণীর শিক্ষার্থীই থাকেন না। এখানে থাকেন বিভিন্ন শ্রেণী, বিভিন্ন মানসিকতার শিক্ষার্থী। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ মানেই হাতে “সোনার হরিণ পাওয়া”। বন্ধুদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, সিনিয়র জুনিয়র সখ্যতা, ভাই-বোন, বন্ধুর মত সম্পর্ক, শিক্ষকের সঙ্গে পিত্ৰ-মাতৃত্বল্য সম্পর্ক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটা অবকাঠামো, কোণার সাথে সুহৃদ সম্পর্কই তো একজন শিক্ষার্থীর ছাত্র জীবনের একটা বড় অংশ হয়ে থাকে।

প্রতিবছর দেশের ভিন্ন অঞ্চল, ভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ভিন্ন পরিবেশ, ভিন্ন অবস্থান থেকে আসা হাজার হাজার শিক্ষার্থীর সবাই যে সমমনা হবে এমনটা নয়। তারা সবরকম শিক্ষা পরিবার বা পরিবেশ থেকে নিয়ে আসবে এটা ও আশা করা নিতান্তই বোকামি। সহপাঠী, সিনিয়র-জুনিয়র, অন্যান্য বিভাগের শিক্ষার্থীর সাথে ভালো সম্পর্ক থাকবে, একটু আধটু খুনশুটি হবে, ভাই বোনের দুষ্টু-মিষ্টি সম্পর্ক গড়ে উঠবে, সবাই মিলে দোষে-ভুলে একটা পরিবার হয়ে উঠে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনটা কাটিয়ে দেবে এটাই থাকে অধিকাংশের প্রত্যাশা। ছোট ভাই-বোনদের

আচরণে ,  
ভুল থাকবেই, বড়  
আচরণেও ভুল  
কারণ প্রতিটি  
করে। তবে  
করা, ভুল ধরিয়ে  
পৰ ব তী তে  
কোনো আচরণ  
বলার সামান্য  
থাকাটা বর্তমানে  
সিনিয়রদের  
সংকটের কারণ  
সকলের সাথে

চলাফেরাতে  
ভাই-বোনদের  
হয়েই থাকে।  
মানুষই ভুল  
তাদের শাসন  
দেওয়া কিংবা  
আপত্তি জনক  
করতে না  
অধিকারটুকু না  
অধিক কাঁশ  
জন্য অস্তিত্ব  
হয়ে দাঁড়িয়েছে।  
সকলের সখ্যতা

গড়ে ওঠে না। তা বলে যার সাথে ভালো সম্পর্ক তাকে সম্মান করে বাকিদের অসম্মান করা কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের শিক্ষার্থীর কাজ না। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে “র্যাগিং নিয়ন্ত্রণ”। আমারও এটাকে সমর্থন করি। ভদ্রতা শিখানোর নামে নির্যাতন বন্ধ থাকবে এটাই সকলের চাওয়া কিন্তু র্যাগিং বন্ধ ঘোষণার পরও কি গেষ্ট রুমের নির্যাতন বন্ধ আছে? না, পত্রিকার পাতা খুললে মাঝে মাঝেই দেশের সনামধন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে হলের গেষ্ট রুমের নির্যাতনের খবর আমরা দেখতে পাই। এর কিছু ঘটনার বিচার হলেও বাকিগুলোর কোনো সুরহা হয় না। কিন্তু পরিস্থিতি এমন অবস্থানে দাঁড়িয়েছে জুনিয়রদের থেকে সামান্য নাম পরিচয় জানতে চাওয়াটাও এখন র্যাগের আওতাতে পড়ে এবং এরজন্য সিনিয়র জুনিয়রের ভালো সম্পর্কটাও সঠিক ভাবে বেড়ে ওঠে না।

আর কিছু সিনিয়র শিক্ষার্থীর ছত্রায় অনেক নবীন শিক্ষার্থী এতোটাই বেপরোয়া হয়ে ওঠে যে তারা সম্মান তো দেয় ই না, পারলে যেচে এসে অপমান করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর থেকে স্নাতক শেষবর্ষে অবস্থানরত শিক্ষার্থীকেও শুনতে হয় “সিনিয়রদের গোগার টাইম নেই”। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে পরিচালিত বিভিন্ন “ক্রাশ এন্ড কলফেশন” পেইজ গুলোতে সিনিয়রদের নিয়ে লিখা হয় যা তা উক্তি। নারী শিক্ষার্থী এক্ষেত্রে সবথেকে বেশি সম্মানহানির স্বীকার হয়ে থাকে। নিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে অন্যান্য সকল সংগঠন, জেলার পরিচিতসহ অন্য যেকোনোভাবে পরিচিত শিক্ষার্থী ফেসবুক প্রোফাইলে যুক্ত হতে তাদের পরিচয় ব্যবহার করে। এবং কিছুদিন যেতে না যেতেই শুরু হয় তাদের অসম্মানজনক আচরণের। প্রথমে আপু এরপর অন্যাকিছু। এদের কাছে বয়স, শ্রেণী, সিনিয়র-জুনিয়র বিষয় না। এদের থামানোর সাধ্য কারো নেই। এদের কিছু বলার উপায় নেই, এদের শাসন করার উপায় নেই। কারণ এরা তথাকথিত কিছু বড় ভাই এর ছত্র ছায়ায় থাকে। আবার এর প্রতিবাদ করলেও ভিন্ন ভাবে র্যাগিং বলে প্রচার করে। এবং হেনস্টার শিকার হয় সাধারণ শিক্ষার্থী।

এমন আচরণে কোনো নারী শিক্ষার্থী অসম্মানিত হলে, নিরাপত্তাহীনতায় ভুগলে সে নিরূপায়। কিছু বলতে গেলেই যে লিখিত অভিযোগ যাবে সিনিয়র কর্তৃক জুনিয়র লাঞ্ছিত। অথচ জুনিয়র কর্তৃক সিনিয়রের এরকম লাঞ্ছনার কোনো বিচার নেই, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও শুধু অভিযোগ পত্র নিয়ে নির্বিকার। পরবর্তী কোনো পদক্ষেপও নাই, অপরাধের বিচারও হয় না। বাধ্য হয়েই মান সম্মানের কথা ভেবে মুখ বন্ধ রাখতে হয় নারী শিক্ষার্থীকে।

অথচ পূর্বের অপরাধ গুলোর বিচার এবং অপরাধীর সঠিক শাস্তি হলে হয়তো জুনিয়রদের উপ্র আচরণের স্বীকার হতে হতো না কোনো শিক্ষার্থীকে, অসম্মানিত হওয়ার সুযোগ হতো না কোনো নারী শিক্ষার্থীর।

আমরা অনেকেই র্যাগিং/ র্যাগিং মানেই বুঝি টর্চার সেল, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। তবে বাস্তবিক অর্থে বিষয়গুলো সম্পূর্ণই ভিন্ন। র্যাগিং বা র্যাগ সকল শিক্ষার্থীকে একটা শৃঙ্খলের মধ্যে রাখার সিস্টেম, সিনিয়র জুনিয়র চেইন রক্ষা করার সিস্টেম, জুনিয়র



কর্তৃক কোনো সিনিয়র সালাম বা ভালো ব্যবহার না পেলেও যেন অসম্মানিত না হয় সেটা নিশ্চিত করার সিস্টেম। র্যাগিং বক্সের পরেও তো গেষ্ট রুমের নির্যাতন বক্স হয়নি। বিষয়টা এমন যে পিছন থেকে বস্তা বস্তা চিনি চুরি হয়ে যাচ্ছে তাতে কোনো ভ্রক্ষেপ নাই কিন্তু সামনে থেকে পিংপড়া একটা চিনির দানাও সরাতে পারবে না।

চলতি পথে শিক্ষককে ধাক্কা দেওয়া, তাদের সামনে তাদেরই অশালীন ভাষাতে মন্তব্য ছুড়ে দেওয়া এমনকি “ক্রাশ এন্ড কনফেশন” নামক পেইজগুলোতে শিক্ষকদের নিয়েই নোংরা অনুভূতি ব্যক্ত করাটাই আজকালকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বেপরোয়া শিক্ষার্থীদের ট্রেন্ড হয়ে দাঢ়িয়েছে। সিনিয়র ক্রাশ এবং তাকে এপ্রোচ করাটা কোনো অন্যায় বা অভদ্রতা নয় বরং স্মার্টনেস।

এতকিছুর পরেও কোনো সিনিয়র নিজ সম্মান রক্ষার্থে কিছুই করতে পারবে না। আপসোস করবে এমন অনুজদের পেয়ে। নীরবে ডিপ্রেশনে ভুগবে নারী শিক্ষার্থী। এরপর জুনিয়রদের এমন এপ্রোচের প্রতিবাদ বা প্রতিকার কোনোটায় না পেয়ে আত্মহত্যা করলে লোক দেখানো শোক প্রকাশ করবে বিশ্ববিদ্যালয়। তবুও থামবে না এদের উগ্রতা, নিভীক এপ্রোচ। কেননা এরা খুব ভালো মতই জানে এদের কিছুই হবে না, কেউ কিছু বলবে না এদের। কারণ পূর্বের বিচারহীনতার সংস্কৃতি।

শিক্ষকের সম্মান রক্ষার্থে, সিনিয়র-জুনিয়র চেইন রক্ষার্থে, নিজ বিভাগের সম্পর্ক ঠিক রাখতে, নারী শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এখন উচিত সিনিয়রদের জুনিয়রকে তাদের উগ্র আচরণ প্রতিক্রিয়া করতে কর্তৃপক্ষের অতিসত্ত্ব ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তা নাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ সুন্দর পরিবেশটা দ্রুষ্টি হয়ে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ঠিক রাখতে, কতিপয় বেপরোয়া শিক্ষার্থীর থেকে অন্য শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের সম্মান রক্ষার্থে কর্তৃপক্ষের কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

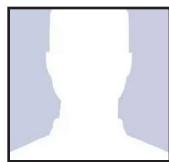
লেখকঃ

সদস্য; বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

প্রকাশ তথ্যঃ

পত্রিকাঃ দৈনিক সংবাদ।

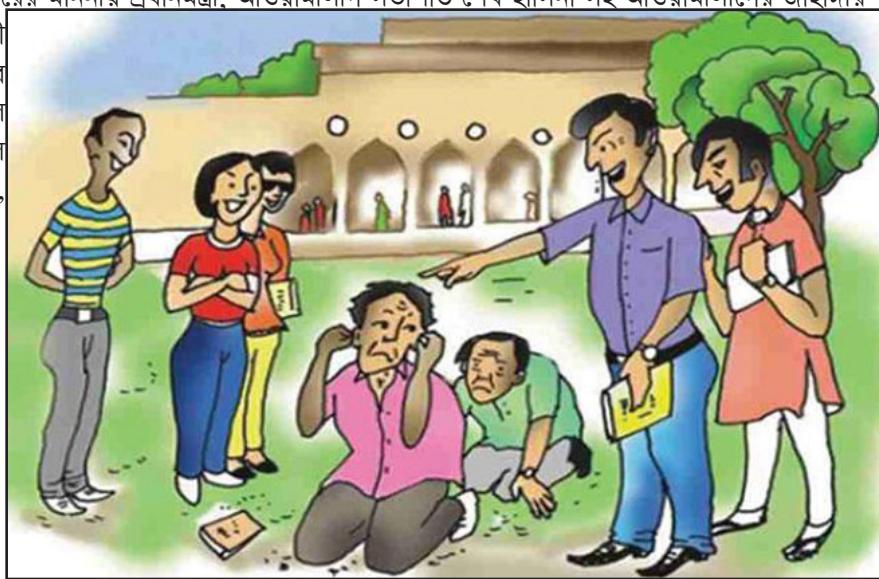
তারিখঃ ০৬ জুলাই ২০২২।



# অস্তিত্ব সংকটে ছাত্র রাজনীতিৎ কিন্তু কেন?

## শাহ জাহান

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর দীর্ঘ নয় মাস মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের অনুপ্রেণা হিসেবে '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন,'৬২ এর শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন,'৬৬ সালের ছয় দফা,'৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের মতো আরো অনেক আন্দোলন সংগ্রাম সংঘটিত হয় তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে। আর এসব আন্দোলন-সংগ্রামে অগণী ভূমিকা পালন করেন তৎকালীন ছাত্র সমাজ। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্মৃতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ঘটে কলকাতা ইসলামীয়া কলেজের ছাত্র খাকাকালীন সময়ে। এমনকি বর্তমান দেশবরণ্য রাজনীতিবিদ, বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আওয়ামীলীগ সভাপতি শেখ হাসিনা সহ আওয়ামীলীগের জাহাঙ্গীর কবির নানক, সাবেক ক্ষিম স্ত্রী আওয়ামীলীগের তোফায়েল নেতা রফিল রিজভী,



মতিয়া চৌধুরী,  
বর্ষীয়ান নেতা  
এবং বিএনপি  
কিবৰ  
আমান উল্লাহ

আমান, শামসুজ্জামান দুদু, ঐক্যফ্রন্টের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্নাসহ আরো অনেক প্রবীন রাজনীতিবিদরা এই ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমেই বর্তমানে জাতীয় নেতা হিসেবে দেশব্যাপী পরিচিত।

বাঙালী জাতিকে বাংলা ভাষার অধিকার ফিরিয়ে দিতে গিয়ে ১৯৫২ সালে শহীদ হন তরুণ ছাত্র সালাম, রফিক, শফিক, জব্বারসহ আরো অনেকেই। এভাবেই '৬২ এর সৈর শাষন বিরোধী গণ-অভ্যুত্থানের সময় তরুণ ছাত্র নূর হোসেন শহীদ হন। আন্দোলনের এই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর একটা বিরাট অংশ ছাত্র সমাজ নিয়েই গঠিত হয়েছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশ সৃষ্টির সূচনা থেকেই ছাত্র সমাজ এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত।

সেই ছাত্র রাজনীতির ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য স্বাধীনতার পর দেশের চারটি প্রধান স্বায়ত্ত্বাস্তিত বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে ছাত্র সংসদ প্রতিষ্ঠা করা হয়। শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয় দেশের মফস্বল এলাকায় অবস্থিত ডিগ্রি ও অনার্স কলেজগুলোতেও ছাত্র সংসদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ছাত্র রাজনীতির চর্চাকে ধরে রাখার প্রয়াস চলতে থাকে। স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন সময়ে আরো অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কোনটিতে ছাত্র সংসদের বিধান রাখা হয়, আবার কোনটিতে রাখা হয় না। পরবর্তীতে দেশের শাসন ক্ষমতায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন সময়ে অবতারণা হয় এবং সেসব রাজনৈতিক দলগুলোর নিজস্ব ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠে। বাংলাদেশের দুটি প্রধান রাজনৈতিল দল আওয়ামীলীগ ও বিএনপি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হয়। এছাড়াও জাতীয় পার্টি সহ বিভিন্ন সামরিক সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসে। আর দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল অর্থাৎ আওয়ামীলীগ ও বিএনপি'র ছাত্র সংগঠন হিসেবে যথাক্রমে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের সৃষ্টি হয়। এছাড়াও পরবর্তী সময়ে ছাত্রশিবির, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফন্ট, ছাত্রমেট্রীসহ নানা ছাত্র সংগঠন সৃষ্টি হতে থাকে। তখন সাধারণ ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলোর মাঝে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে ছাত্র সংসদ চলতে থাকে।

কিন্তু একসময় নানা অজানা কারনে ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ করার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরির প্রয়াসকে গলা টিপে হত্যা করা হয়। অর্থাৎ '১০ এর দশকে এরশাদ সরকারের আমলে সর্বশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ(ডাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও সর্বশেষ ২০১৯ সালে নানা চড়াই- উংরাই পেরিয়ে দীর্ঘ ২৭ বছর পর আওয়ামীলীগ সরকারের অধীনে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু অন্যসব বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ গুলোর ছাত্র সংসদ নির্বাচন আজ অবধি অনুষ্ঠিত হয়নি। শুধু তাই নয় সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক দল সমর্থিত ছাত্রসংগঠনগুলোর বিভিন্ন অপকর্মের কারনে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একে একে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষিত হচ্ছে যা এই দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরির প্রধান অন্তরায় এবং সুশীল সমাজ ও সাবেক ছাত্র নেতাদের সমর্থন বহির্ভূত সিদ্ধান্ত। আবার, এই ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার কারণ এবং ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের কারণ

সম্পর্কে বিশ্লেষণ করলে আজকের এই ছাত্র রাজনীতির জীর্ণদশাই কথা বলতে শুরু করবে। ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার পেছনে প্রধানত দুটি কারনকেই দায়ী করা হয়। এক; বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র সংগঠনের নির্বাচনে ভরাডুবির আশঙ্কা; দ্রুই; বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অনীহা এবং অসহযোগিতা।

এই দুটি কথার পেছনে যথেষ্ট ঘোষিত রয়েছে।

প্রথম কারনটির বিশ্লেষণ করলে আওয়ামীলীগ, বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠনগুলোর পূর্বের এবং বর্তমান অপকর্মগুলোর দিকে নজর দিলেই স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

২০০২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের দাবী আদায় আন্দোলনে তৎকালীন সমর্থিত ছাত্রদল পুলিশের সাথে সম্মিলিতভাবে রাতের অন্ধকারে সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর হামলা করে। এছাড়াও ভিন্ন মতাবলম্বী শিক্ষার্থী ছাত্রলীগ কর্মী বুয়েটের সানি হত্যাসহ ক্ষমতাসীন সরকারের বিভিন্ন এজেন্ট বাস্তবায়নের জন্য নানা ধরনের অপকর্মে লিঙ্গ থাকে। জামায়ত সমর্থিত ছাত্রশিবিরের নামেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পায়ের রগকাটা সহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। আবার আওয়ামীলীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধেও সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু অপকর্মের চিহ্ন উঠে এসেছে। যার মধ্যে ২০১৯ সালের বুয়েটের শিক্ষার্থী আবারার ফাহাদ হত্যা। অতি সাম্প্রতিক সময়ে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের মৃত্যুর দায়ে ক্যাম্পাসের ছাত্রলীগের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং চার জন শিক্ষার্থীকে আজীবনের জন্য বহিকার যারা প্রত্যেকেই ছাত্রলীগের কর্মী।

দ্বিতীয় কারনটির বিশ্লেষণে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের স্বেচ্ছারিতা। বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ প্রশাসনের বিরুদ্ধে মোটা অক্ষের দূর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এছাড়াও দায়িত্বে অবহেলাসহ নানা অনিয়মের কথা। এমনকি এসব ঘটনার জন্য শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে অনেকেই পদত্যাগ করতেও বাধ্য হয়েছেন। এসব আন্দোলনগুলোতে ছাত্র সংসদের প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি হলে আন্দোলন আরো বেগবান হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো। আর এজন্যই হয়তো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনগুলোও ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে অনীহা প্রকাশ করে। গত কয়েকদিন আগে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হল প্রাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের এক পর্যায়ে ক্যাম্পাসের ক্লাস-পরীক্ষা অনিদিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেছে প্রশাসন।

এভাবে ক্রমবর্ধমানভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সমর্থিত ছাত্র সংগঠনগুলোর অপকর্মের অজুহাতে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ছাত্র রাজনীতিকে ক্যাম্পাসের অস্ত্রিতার কারন মনে করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পায়তারা চলছে এবং ইতোমধ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণাও করা হয়েছে। আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করা হয়েছে।

এমন সিদ্ধান্তের ফলে হিতে বিপরীত হবে। একদিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের স্বেচ্ছারিতা বাড়বে অপরদিকে জাতিকে নেতৃত্ব শূন্য করার প্রচেষ্টা চলবে। তাই ছাত্র রাজনীতি বন্ধ না করে অপরাজনীতি বন্ধ করে এবং ছাত্র সংগঠনগুলোর গঠনতত্ত্বের পরিবর্তন ঘটিয়ে গনতান্ত্রিক পছায় নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন আয়োজনের মাধ্যমে দেশকে ভবিষ্যতে পরিচালনার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন নেতৃত্ব তৈরির মাধ্যমে ছাত্র রাজনীতিকে বাঁচিয়ে রাখা এবং স্বার্থক করা এখন সময়ের দাবি।

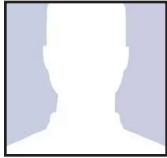
লেখকঃ

সদস্য; বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

প্রকাশ তথ্যঃ

পত্রিকাঃ আলোকিত বাংলাদেশ।

তারিখঃ ২২-০১ ২০২২।



## ভালো থাকার ৮ সূত্র আজাহারুল ইসলাম

জীবন। ৩ বর্ণের এই শব্দে রয়েছে অনেক উত্থান-পতন। আনন্দ-বেদনা, দুঃখ-কষ্ট, আশা-হতাশা, যার নিত্যসঙ্গী। তবু জীবন নৌকায় বসে বৈঠা হাতে পারি দিতে অকুল দরিয়া। যেই দরিয়ার কোনো কুল কিনারা নেই। যেকেনো সময় আছত্তে পড়তে পারে বড় বড় চেউ। আক্রমণ করতে পারে বড়। বড়-চেউয়ের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে এ নৌকায় টিকে থাকতে হয়। সাথে বৈঠা হিসেবে থাকে কিছু সূত্র। কিছু সমীকরণ।

জীবনের অর্থ ও ব্যাপ্তি অনেক। জীবনের সমীকরণ সহজ আবার জটিলও। সবাইকে কষ্ট দেওয়া যেমন সন্তুষ্ট নয়। আরেকদিকে সবাইকে খুশি রাখাও কষ্টসাধ্য। এই দেনা-পাওনার হিসাব চুকিয়ে চলার নাম জীবন। পাশাপাশি নিজের জীবনকে সুন্দর রাখার দায়িত্ব নিজেরই। সঠিক সূত্রে অংক কমলেই জীবন হবে আরো রঙিন। জীবনকে উপভোগ্য ও সুন্দর করতে জেনে নিন ৮টি সূত্র।

১. উচ্চাকাঙ্ক্ষা কমান : যা আছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন। যা নেই তা নিয়ে আফসোস করবেন না। উচ্চাকাঙ্ক্ষা কমলেই জীবনের ৭০ ভাগ কষ্ট লাঘব কবে। জীবনের সমীকরণ সরল হয়ে উঠবে। এছাড়া কারো থেকে কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও এক প্রকার যন্ত্রণা। হোক সে আপনজন, আকাঙ্ক্ষা যত কমাতে পারবেন যন্ত্রণা থেকে তত মুক্তি পাবেন।

২. নিজেকে ভালোবাসুন : আত্মপ্রশান্তিই বড় সফলতা। যে নিজেকে ভালোবাসতে জানে না তার দ্বারা জীবনে সফলতা অর্জন করা দুঃসাধ্য। নিজেকে ভালো রাখতে না পারলে অন্যদের ভালো রাখার তো প্রশ্নই আসে না। তাই বিশ্বকে অন্ধেষণ করার আগে নিজেকে অনুসন্ধান করুন। নিজেকে জানুন, নিজেকে চিনুন। তবেই বিশ্ব আপনার মুঠোয় চলে আসবে।

৩. ব্যস্ত থাকুন : অলস মস্তিষ্ক শয়তানের আড়তাখানা। ব্যস্ত থাকলে হতাশাও আঁকড়ে ধরতে ভয় পায়। কাজ না থাকলে সারাক্ষণ আজে বাজে চিন্তা মস্তিষ্ককে থাস করে ফেলে। ব্যস্ত থাকা ভালো থাকার আরেকটি অন্যতম সূত্র।

৪. অবসর সময়ে পছন্দের কাজ করুন : কেউ দ্যুরতে ভালোবাসে। কেউ ঘরে শুয়ে কিংবা বসে কাটাতে পছন্দ করে। কেউ গাছ লাগাতে ভালোবাসে। কারো পছন্দ বই পড়া। কেউ আবার কানে হেডফোন গুঁজে নির্জনে গান শুনতে ভালোবাসে। প্রত্যেকের ভালো লাগার কাজ ভিন্ন। নিজের পছন্দের কাজ নিজেকেই সন্তুষ্ট করতে হবে। আর অবসরে পছন্দের কাজ করলে মন খারাপের কোনো সুযোগ নেই।

৫. স্বপ্নপানে এগিয়ে চলুন : প্রত্যেকের জীবনে লক্ষ্য নির্ধারণ করা খুবই জরুরি। এটাও হতাশার পিছনে অনেক বড় একটা কারণ। সময় নিয়ে নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করে ফেলুন। প্রয়োজনে এক সপ্তাহ, এক মাস বা আরো বেশি সময় নিতে পারেন। তবুও লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। একইসাথে স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে চলুন সর্বোচ্চ চেষ্টার মাধ্যমে।

৬. সহযোগিতা করুন : সাধ্যের মধ্যে কাউকে সহযোগিতা করতে পারলে নিজের মধ্যে একটা ভালোলাগা কাজ করে। যতটুকু সন্তুষ্ট অপরকে সহায়তা করুন। তবে নিজের কাজ রেখে নয়। বিশেষ করে সামর্থ্য থাকলে অসহায় মানুষকে সহায়তার মাধ্যমে বেশি আত্মত্বষ্টি কাজ করে।

৭. ক্ষমা করতে শিখুন : ক্ষমা একটি মহৎ গুণ। জীবনে চলার পথে অনেকে অনেক ভুল করে। ভুল করে না এমন একজন মানুষও প্রয়োজন ক্ষমা পাওয়া যাবে না। তাই অপরের দোষ ক্ষমা করুন। এর মাধ্যমেও আত্মত্বষ্টি আসবে। আর আগেও বলেছি, আত্মত্বষ্টি সফলতা।

৮. না বলতে শিখুন : জীবনকে সহজ সমীকরণে পরিচালিত করতে ও উপভোগ্য করতে প্রয়োজনীয় আরেকটি সূত্র না বলতে শিখুন। না বলা মানে খারাপ আচরণ করা বা সবাইকে না বলা নয়। যারা আপনার থেকে শুধু সুবিধা খোঁজে তাদের ক্ষেত্রে সহজলভ্যতা কমিয়ে দিন। সন্তুষ্ট হলে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করুন। সাধ্যের মধ্যে নিজের জন্য সময় রেখে বাকি সময়ে কারো কাজ করতে পারলে করুন নতুবা সরাসরি না বলে দিন। না বলা যদিও অনেক কঠিন কাজ তবুও আস্তে আস্তে চৰ্চা করুন। জীবন হয়ে উঠবে আরো সহজ।

লেখকঃ

সদস্য; বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

প্রকাশ তথ্যঃ

পত্রিকাঃ দৈনিক যুগান্তর।

তারিখঃ ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২১।

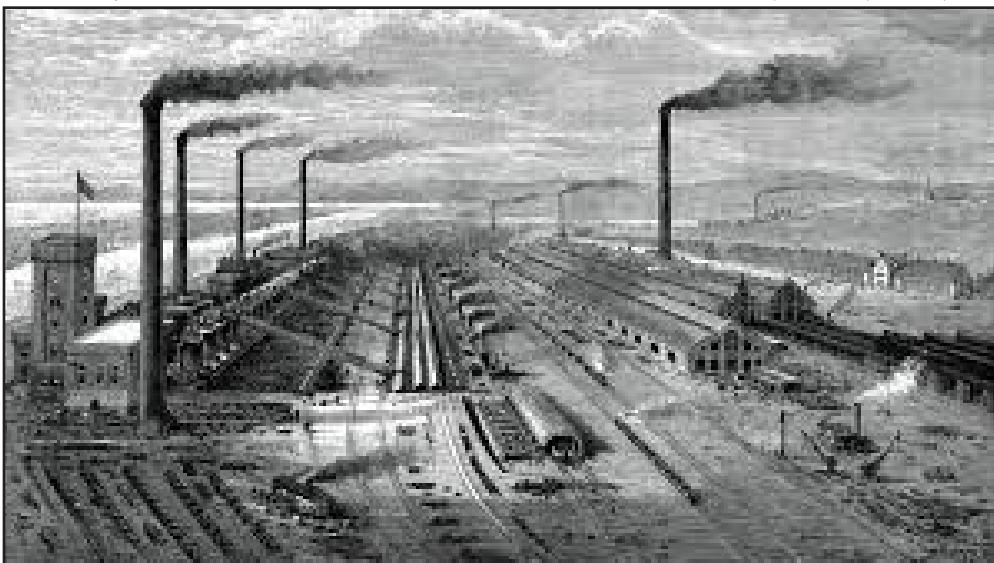


# চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও বাংলাদেশ

## জয়দেব রায়

শিল্পবিপ্লব কথাটির সঙ্গে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রথমে ইংল্যান্ডে এবং পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি কাজে লাগিয়ে উৎপাদনব্যবস্থায় যে আমূল পরিবর্তন ঘটানো হয়, তা-ই শিল্প বিপ্লব নামে পরিচিত। শিল্পবিপ্লব অর্থনীতির গতিপথ বদলে দেয়। আমাদের বিশ্ব টিকে আছে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির ওপরে। এ পর্যন্ত যে শিল্পবিপ্লবগুলো সংঘটিত হয়েছে সবগুলো অর্থনীতিতে নতুন গতিধারা এনে দিয়েছে। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব একটা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। জার্মানির একটা হাইটেক প্রকল্পের পর থেকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব শব্দটা আমাদের সামনে আসে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মূলত তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল বিপ্লব। এ বিপ্লবের ফলে নানামুখী সম্ভাবনার সৃষ্টি হবে সমগ্র দেশজুড়ে যেমন- কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি হ্রাস, উৎপাদন শিল্পে নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে বড় পরিবর্তন, বিশেষায়িত পেশার চাহিদা বৃদ্ধি, সামগ্রিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

বাংলাদেশকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুযোগ গ্রহণ করতে হলে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আইওটি, ব্লকচেইন ও রোবটিক্স ইত্যাদির ব্যবহার করতে দ্রুত কৌশলগত পরিকল্পনা করতে হবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে কাজে লাগিয়ে আমাদের অর্থনীতিকে দ্রুত পরিবর্তন করতে হলে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে হবে। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো যেমন- আমেরিকা, ইংল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান,



চীন, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর তাদের নিজেদের শিক্ষাব্যবস্থায় চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উপাদানগুলো নিয়ে এসেছে। নিজেদের কারিকুলাম ওই অনুযায়ী বিন্যস্ত করেছে, এমনকি আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। সব মিলিয়ে সবাই যেন এক প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এ প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকলেই একটা দেশ অন্য দেশের থেকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে থাকবে। এই দৌড়ে আমরা কতটুকু যেতে পারব বা আমাদের অবস্থান কেমন হবে, তা বলে দেবে সময়। আমরা যদি এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে চাই, তা হলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আবশ্যক। বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সিলেবাসে গতানুগতিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং আমাদের শিক্ষার্থীগণ পঠিত বিষয়গুলোর বাইরে তেমন জ্ঞান অর্জন করেনা। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষার্থীগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন চাকরির প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে। আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে তাদের খুবই কম ধারণা থাকে। শিক্ষাকে চাকরিমুখী না করে ডিজিটাল প্রযুক্তিগত শিক্ষার মাধ্যমে এবং উদ্যোগামুখী করার কর্মকোশল ও পরিবেশ সৃষ্টি করে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মডেল হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুবিধা তাগে করতে চাইলে প্রাতিষ্ঠানিক প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষায় বাংলাদেশ যত এগিয়ে যাবে, বাংলাদেশের অগ্রগতি ততই ত্রুট্যত হবে। যদি শুধু উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের কথাই ধরি, তাহলে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুবিধা নিতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলাতে নিড বেজড নানা বিভাগ ও ল্যাব তৈরি করতে হবে যেখানে শিক্ষার্থীর হাতেকলমে কাজ শেখার সুবিধা থাকবে। আমরা জানি শিল্পবিপ্লবের শিক্ষায় চারটি ধাপ থাকে। সেগুলো হলো লেকচার মেমোরাইজেশন, নলেজ প্রডিউশিং এডুকেশন, ইন্টারনেট ইনেবলড লার্নিং এবং ইনাডেশন প্রডিউশিং এডুকেশন। ইনাডেশন প্রডিউশিং এডুকেশন চালু রাখতে হলে আমাদের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষগুলাকে প্রযুক্তি শিক্ষার উপর্যাগী করে তুলতে হবে যেখানে শেখানাহে ন্যানাটেকনালজি, বায়াটেকনালজি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হ্যান্ডেলিং নানা বিষয়।

বাংলাদেশেও ইতিমধ্যেই চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এর ছোঁয়া লাগতে শুরু করেছে। বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তি থাতে অনেক অগ্রগতি করেছে। বিশ্বের আধুনিক সব তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে মানিয়ে নিতে বাংলাদেশে কাজ করে যাচ্ছে। আগামী দিনের প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে কাজে লাগিয়ে আমাদের অর্থনীতিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে হবে। চতুর্থ

শিল্পবিপ্লবকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানোর জন্য আমাদের রয়েছে অফুরন্ট সন্তাবনা। বাংলাদেশে এখন জনসংখ্যার একটা বড় অংশ তরণ ও কর্মক্ষম। এর সুবাদে বাংলাদেশকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই চতুর্থ বিপ্লবের কৃপাত্তির প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে দিয়ে কিংবা এর প্রভাববলয়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হবে। এ জন্য দরকার বহুমুখী কৌশলগত, কারিগরি ও অবকাঠামোগত প্রস্তুতি। এ নতুন শিল্পবিপ্লব থেকে বাংলাদেশকে উৎপাদনশৈলতার সুফল নিতে হবে, বৈদেশিক রপ্তানি আয় বাড়ানোর সুযোগ নিতে হবে, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে, রেমিট্যাল প্রবাহ বাড়াতে হবে। এসব দিকে পিছিয়ে পড়া মানে সুফলগুলো ম্লান হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ সুযোগটা নিয়ে যাবে অন্য কোনো দেশ আর আমরাও হারাবো আমাদের গতানুগতিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগুলো। সুতরাং সুফল ঘরে নিতে চাইলে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনাকে কৌশলগতভাবে এগিয়ে নিতে হবে। অর্থাৎ বিদ্যমান স্বল্প দক্ষ শ্রমবাজারকে নতুন দক্ষতার শ্রমবাজার ও কর্মসংস্থানের উপযোগী করে গড়ে নিতে হবে। এই চ্যালেঞ্জ উত্তরাতে না পারলে নতুন শিল্পবিপ্লব আমাদের ফেলেই এগিয়ে যাবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে ডিজিটালাইজেশন এর কোনো বিকল্প নেই। দেশে অনেকগুলো হাইটেক পার্ক গড়ে তোলা হয়েছে এবং আরো হাইটেক পার্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি তথা আইটিসংক্রান্ত সব ধরনের কাজ সম্পাদন করা, আইটিকে ব্যবসা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা, আইটি সেষ্টেরে সব সুযোগ-সুবিধা তৈরি, তথ্যপ্রযুক্তিসংক্রান্ত সব আমদানি, রফতানির সুবিধা নিশ্চিত করা হবে হাইটেক পার্কের কাজ। তথ্যপ্রযুক্তিক্রিনির্ভর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো এসব পার্কে কোম্পানি খুলে তাদের কাজ করতে পারবে। প্রযুক্তিক্রিনির্ভর এসব হাইটেক পার্ক প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পায়ন, তরঙ্গদের কর্মসংস্থান এবং হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার শিল্পের উন্নত ও বিকাশে সুযোগ সৃষ্টি করবে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব যেমন একদিকে বাংলাদেশে সন্তাবনার সৃষ্টি করবে তেমনি এটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে শুরু করবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে একদিকে যেমন নতুন কর্মসংস্থান হবে তেমনি অন্য মানুষের চাকরি হারানারে সন্তাবনাও তৈরি হবে। স্মার্ট যন্ত্র বাংলাদেশের জন্য দুঃসংবাদের কারণ হতে পারে বিশেষ করে গার্মেন্টস খাতে। প্রায় ৬০ লাখ লাকে কাজ করে এ খাতে। রাবেট ও স্মার্ট যন্ত্রের ব্যবহারে শ্রমের ওপর নির্ভরতা কমে যাবে। অনেক শ্রমিক বেকার হয়ে যাবে। শুধু গার্মেন্টস নয়, আরাম অনেক পেশা, যেমনঃ হিসাবরক্ষক, আইন পরামর্শক, পরীক্ষক, রেস্টুরেন্টে সেবা প্রদানকারী ক্যাশিয়ার প্রভৃতি পেশায় মানুষের ভূমিকা অনেকটাই কমে যাবে। চালকবিহুন গাঢ়ি চালু হলে চালক অপ্রয়াজেনীয় হয়ে দাঢ়াবে। অর্থনৈতিক বিদ্যগ্রান মনে করছেন চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এর ফলে দারিদ্র্যতা আরো প্রকট হবে। তাই বলা যায়, এ বিপ্লব বাংলাদেশের দারিদ্র্যতাকেও প্রকট করে তুলবে। এ বিপ্লবের সাথে তাল মিলিয়ে দেশের তরণ সমাজকে দক্ষ করতে না পারলে এবং দেশের প্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন ঘটাতে না পারলে প্রত্যেকটি সেষ্টের বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত প্রযুক্তির আওতায় এনে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা; শিক্ষা ও গবেষণায় উন্নাবনী কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা, স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য ও প্রযুক্তির মান বৃদ্ধি করা, দেশের প্রতিটি খাতে ডিজিটালাইজেশন করা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও প্রযুক্তির বিকাশে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করা, ডিজিটাল আইন জোরদার করা, দক্ষ মানবসম্পদ গঠনে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা, দেশীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রভৃতি। একই সাথে গবেষণা খাতে বরাদ্দ টাকার পরিমাণ বাড়াতে হবে। গবেষণার মাধ্যমে নিয়ন্তুন জিনিস আবিষ্কার হয়। এভাবেই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে বিশ্বের বুকে নতুন করে আবির্ভূত হবে লাল সবুজের বাংলাদেশ।

লেখকঃ

সদস্য; বাংলাদেশ তরণ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।



# সড়ক দুর্ঘটনা এখন মহামারি রাতিক হাসান রাজীব

সড়ক দুর্ঘটনা এখন নিভৈমিতিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। তবুও যেন এতে কারোর মাথা ব্যথা নেই। নেই সচেতনা, নেই আইনের কঠোরতা। কত শত প্রাণ হারাচ্ছে। মা হচ্ছে সন্তান হারা, সন্তান হারাচ্ছে বাবা। যার যায় সেই বুঝো আপনজন হারানোর দুঃখ।

পরিবারের অন্ন জোটাতে সকাল সকাল মানুষ ব্যস্ত হয়ে যায় তার কর্মে। কেউ কেউ পাড়ি দেয় শত মাইল পথ। পড়তে হয় নানা দুর্ঘটনায়। নিরাপদ জীবনযাপনের জন্য সড়ক দুর্ঘটনা সবসময় ভূমিকপ্ররূপ। এতে প্রাণ হারায় কত শত প্রাণ বা পঙ্কু হয়ে কঠোরতে হয় তাদের বাকিটা জীবন। প্রাণ হারানো বা পঙ্কু হওয়া লোকটি যদি পরিবারের একমাত্র কর্মক্ষম ব্যক্তি হয়ে থাকেন, তাহলে সেই পরিবারের অবস্থা কী, তা সহজেই অনুমেয়। প্রকৃতপক্ষে সড়ক দুর্ঘটনা শুধু একটু দুর্ঘটনা নয়; এটি একটি পরিবারের সারাজীবনের কান্না।

সম্পত্তি, বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির তথ্য মতে, ২০২১ সালে করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ৮৫ দিন গণপরিবহন বন্ধ থাকার পরেও ৫ হাজার ৬২৯ টি দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ৭ হাজার ৮০৯ জন নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন ৯ হাজার ৩৯ জন। সড়ক পথের পাশাপাশি রেল পথে ৪০২ টি দুর্ঘটনায় ৩৯৬ জন নিহত ও আহত হয় ১৩৪ জন। নৌ-পথে ১৮২ টি দুর্ঘটনায় ৩১১ জন নিহত, আহত ৫৭৮ জন এবং ৫৪৪ জন নির্ধোঁজ হয়েছেন। সড়ক, রেল, নৌ-পথে মোট ৬ হাজার ২১৩ টি দুর্ঘটনায় ৮ হাজার ৫১৬ জন নিহত ও ৯ হাজার ৭৫১ জন আহত হয়েছেন। গত বছর ৪ হাজার ৮৯১ টি সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে ৬ হাজার ৬৮৬ জন এবং আহত হয়েছে ৮ হাজার ৬০০ জন।

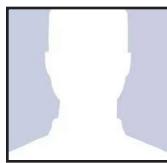
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনসিটিউটের গবেষণা মতে, দেশের সড়ক দুর্ঘটনা এবং এর প্রভাবে সৃষ্টি ক্ষয়ক্ষতির আর্থিক পরিমাণ বছরে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা। এসব দুর্ঘটনার কারণে বছরে জিডিপির ২-৩ শতাংশ হারাচ্ছে দেশ। উল্লেখ্য যে, ওয়াল্ড হেলথ রয়াল্সিং অনুসারে সবচেয়ে বেশি সড়ক দুর্ঘটনাজনিত ১৮৩ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৬ তম। প্রতিদিনই সড়ক দুর্ঘটনায় কেড়ে নিচ্ছে তরাতাজা প্রাণ। অনেকেই আবার পঙ্কু হয়ে বেঁচে থাকছে। একটি দুর্ঘটনা একটি পরিবারের অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া এই দুর্ঘটনার অনেক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো যানবাহনের অতিরিক্ত গতি এবং চালকের বেপরোয়া মনোভাব। এছাড়া ক্রটিপূর্ণ যানবাহন, সড়কের পাশে হাটবাজার বসা, গাড়ির ধারণক্ষমতার বেশি যাত্রী বহন করা, ভাঙ্গা ও অপ্রশংস্ত রাস্তাঘাট, লাইসেন্সবিহীন ও অদক্ষচালক, মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন চলাচল, তরুণ ও যুবদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানো, জনসাধারণের মধ্যে ট্রাফিক আইন না জানা ও না মানার প্রবণতা, বিপজ্জনক ওভারটেকিং। তাছাড়া মহাসড়কে অপরিকল্পিত স্পিডব্রেকার বা গতিরোধকগুলোও দুর্ঘটনার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

দুর্ঘটনা যেভাবেই হোক না কেন এর ফলাফল সবসময় ভয়াবহ হয়। এর ফলে ক্ষতি অপূরণীয়। কোনভাবেই কাটিয়ে ওঠা সন্তুষ্ট হয় না। সড়ক দুর্ঘটনা এখন আমাদের দেশে প্রকট আকার ধারণ করেছে। যদি সবাই সর্তকতার সাথে চলাচল করি তাহলে কিছুটা হলেও রেহাই পাওয়া যেতে পারে। যেমন: বেপরোয়া ভাবে গাড়ি না চালানো, ওভারটেকিং এর সময় সাবধানতা অবলম্বন করা, ক্রটিপূর্ণ যানবাহন রাস্তা থেকে তুলে নেওয়া, গাড়ির ধারণক্ষমতার মধ্যে যাত্রী তুলা, নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর রাস্তা মেরামত করা, চালকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং প্রকৃত লাইসেন্সধারী গাড়ি চালাই কি-না যাচাই করা, অতি ব্যস্ততম জায়গায় ফুটওভার ব্রিজ বা নিরাপত্তা জোরাদার করা, মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন চলাচল বন্ধ করা কিংবা এদের জন্য আলাদা পাশ্ববর্তী রাস্তা করা এবং সবাইকে বাধ্যতামূলক ট্রাফিক আইন মেনে চলা। উল্লেখ্য সড়ক আইনের সবচেয়ে কঠোর ধারা হচ্ছে ৮৪,৯৮ ও ১০৫ নং। ৯৮ ধারায় নির্ধারিত গতির অতিরিক্ত গতিতে যানবাহন চালালে, ঝুঁকিপূর্ণ ওভারটেকিং, ওভারলেডিংয়ের কারণে দুর্ঘটনা হলে এর জন্য চালক, কন্ডাকটর বা সহায়তাকারীর তিনি বছর কারাদণ্ড কিংবা তিনি লাখ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনা রোধ যতই জিল হোক না কেন, সবাই এর সমাধানে এগিয়ে আসলে দুর্ঘটনা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সন্তুষ্ট। মনে রাখতে হবে “একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না”। সবাই যদি থাকি সর্তক এবং সচেতন, তবেই সড়ক হয়ে উঠবে নিরাপদ।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।



# প্রযুক্তির সম্বন্ধবহারে সন্তানের প্রতি নজর দিন

## মোঃ মঙ্গল হক খান

আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার সবচেয়ে বেশি জরুরী। সেইক্ষেত্রে আমরা কতটা পিছিয়ে আছি সেটা তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু এই প্রযুক্তি নির্ভরতা অনেকাংশেই সহজ করে দিয়েছে আমাদের জীবনযাত্রা। মহামারির অস্ত্রিত এই সময়টা সেই নির্ভরশীলতাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা সকলেই বুঝতে পেরেছি আমার চাইলেই দূরে থেকেও কাছাকাছি থাকতে পারি। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, টেকনোলজি, পড়াশোনা, দাঙ্গারিক কাজকর্ম সহ সকল ক্ষেত্রেই সফলতা, প্রশংসা কুড়িয়েছে প্রযুক্তির ব্যবহার। খুব নির্দিষ্ট করে বললে অনলাইনে অডিও-ভিডিও কলিং প্ল্যাটফর্মগুলো বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। গুগল ক্লাসরুম, গুগল মিট, জুম, স্কাইপে সহ অনেক অ্যাপস এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এদের কল্যাণে অন্যান্য সেবার মতো শিক্ষাব্যবস্থাও অনেকাংশেই সচল রয়েছে। করোনা মহামারির এই সময়টা বেশ দীর্ঘায়িত হওয়ায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক সহ সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরাও যুক্ত হয়েছে অনলাইনে। এই শিক্ষা কার্যক্রমে। পড়াশোনার সুবিধার্থে অভিবাবকরা বাধ্য হচ্ছেন সন্তানদের হাতে স্মার্টফোন, ট্যাব, ল্যাপটপ ও ইন্টারনেটে তুলে দিতে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন-বিটিআরসির ২০১৬ তথ্যমতে, বাংলাদেশ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ৩৫ শতাংশ হচ্ছে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী। মানে এদের বেশিরভাগই শিশু-কিশোর। এই করোনা পরিস্থিতি সেই সংখ্যাটা হ্রাস করে বাড়িয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা। থী

এই তে

পর্যন্ত।

আমাদের



শিশুকিশোররা এসবের সম্বন্ধবহার করতে পারছে কি? সেটা নিয়ে ভাবার এবং বিকল্প কিছু ভাবার সময় এসেছে। প্রযুক্তির প্রতি আমাদের নির্ভরতায় সুফলের কথা বলতে গেলে বেশকিছু ক্ষেত্রের কথাই বলা সন্তুষ্ট। কিন্তু আমরা খুব সন্তুষ্ট দীর্ঘমেয়াদি বড় এক বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে চলেছি। শিশু-কিশোরদের নিকট মোবাইল, ইন্টারনেটের এই সহজপ্রাপ্যতা তাদেরকে শুধু পড়াশোনাতেই সীমাবদ্ধ রাখেনি। ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা তাদের হাত পাকাতে সাহায্য করছে স্মার্টফোনের নানাবিধি ব্যবহারে। এরই বহিঃপ্রকাশ টিকটক, লাইকি নামক অ্যাপসগুলোতে তাদের পদচারণা। অশ্লীল অঙ্গভঙ্গ, বিষয়বস্তু আর সবচেয়ে ভয়ংকর কিশোর গ্যাংয়ের ছড়াচড়ি। এসবের আড়ালে যৌনতা আর মাদকের ভয়াবহতার কথা সামনে আসছে। তাতে অতি অল্প বয়সেই তারা বুকে পড়ছে অপরাধ জগতে একথা নির্ধার্য বলা যায়। এদের একটা অংশ আশংকাজনক হারে বুকে পড়ছে পর্নোগ্রাফিতেও। আর এইসবেরই অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার দরুণ বিবাদ, প্রতিশোধপরায়ণতা, হত্যার মতো ঘটনা নিত্যনেতৃত্বিক হয়ে দাঢ়িয়েছে। এতে নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ সবচেয়ে বেশি হ্রাসকির মুখে।

এছাড়াও বিভিন্ন গেমিং অ্যাপসগুলোতে তাদের আসক্তি দুর্চিন্তার কারণ হয়ে দাঢ়িয়েছে। করোনাকালীন লম্বা ছুটিতে অফুরন্ত সময় তাদের হাতে যার অধিকাংশ ই ব্যয় হচ্ছে মোবাইল, ট্যাব আর ল্যাপটপে। যাদেরকে খেলার মাঠে যাদের পাওয়া যেত, তাদেরই এখন পাওয়া যাচ্ছে খেলার মাঠের পাশের রাস্তায়। যেখানে সারিবদ্ধ বা গোল হয়ে বসে তারা মোবাইল গেমসে নিমগ্ন। ক্রি ফায়ার অথবা পাবজি নিয়ে ব্যস্ত তারা। তাদের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলে আপনি “এই মার মার....., হেল্প হেল্প....., জলদি কর জলদি কর....” এমন বাক্য শুনতে পাবেন। কিন্তু এসবের সবই এই গেইমগুলোকে কেন্দ্র করে। দলবদ্ধ হয়ে মাঠের খেলাধুলায় শারীরিক, মানসিক সুস্থিতার বিষয়টি এখন অনলাইন গেমসের হিংস্রতায় বন্দ। ফলে এই শিশুকিশোররা সুস্থ বিনোদনের ঘাটতি নিয়ে বেড়ে উঠেছে বলে বিশেষজ্ঞ মত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও বলছে ভিডিও গেমসের প্রতি আসক্তি একটা মানসিক অসুখ। বিশেষজ্ঞরাও বলছেন অনলাইন গেমসের প্রভাবে তাদের মধ্যে হঠাতই অতিরিক্ত রেগে যাওয়া, মারমুখী হয়ে উঠা, প্রতিশোধপরায়ণতা, উদ্ভট অঙ্গভঙ্গ সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিশোর গ্যাংয়ের ভয়াবহতা সামনে আসার পর এইসব ভিডিও গেমসের প্রভাব আলোচনায়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কথা বলতেই আমরা ফেসবুক-ম্যাসেঞ্জার, ট্রাইটার, ইন্সটাগ্রাম এসবই বুঝি। এসব মাধ্যম আমাদের একে অপরের সাথে যোগাযোগ সহজতর করেছে। কিন্তু আমাদের আবেগ, অনুভূতির সঠিক প্রকাশও সীমিত করে দিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা সকলেই প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে নিমগ্ন থাকছি। সর্বক্ষণই এসব মাধ্যম হতে নতুন কিছু জানার তাগিদ আমাদের মধ্যে কাজ করছে। যেটা এই করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে আশংকাজনক হারে বেড়েছে। সেক্ষেত্রে বেড়েছে

গুজব রটনার পরিমাণ। গণপরিবহনে চড়ার সময়, রাস্তাঘাটে হাঁটার সময়ে আমরা ফোন হাতে সেসব নিয়েই ব্যস্ত হয়ে যাই। এর ফলে আমরা রাস্তাঘাটে চলাচল করার সময় প্রায়ই নানাবিধি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছি। ঘরোয়া, সামাজিক কিংবা বন্ধুবান্ধবের সাথে আড়ায়ও আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিমগ্ন থাকি। এসবকিছু হতে শিশু কিশোরেরাও মুক্ত নয়। তারাও অধিক পরিমাণে সময় ব্যয় করছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে। মা-বাবারাও অনেক সময় ধরে ইন্টারনেটে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মগ্ন থাকছেন। যার প্রভাব সন্তানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলশ্রুতিতে মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। অধিক পরিমাণে ফোনের ক্ষেত্রে তাকিয়ে থাকার ফলে ঢোকের নানা সমস্যায়ও জর্জরিত হচ্ছে অনেকে।

এইসকল ক্ষেত্রেই অভিবাবকদের সচেতনতা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মা-বাবারা সন্তানদের হাতে ফোন তুলে দেওয়ার আগে কিছু বিষয়ে যথেষ্ট ধারণা থাকা উচিত। যেমন কোন কোন গেমস সন্তানের কৌতৃহল থেকে নেশায় পরিণত হতে পারে সে-সম্পর্কিত ধারণা রাখা। স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, ট্যাব সে কতটা ব্যবহার করছে, কতটা তার জন্য নিরাপদ সে-সম্পর্কে সবসময় অবগত থাকা। সন্তানের সংসঙ্গ নিশ্চিত করা এবং সে সম্পর্কিত ব্যপারে সচেতন থাকা। সন্তান ও পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যপারে খেয়াল রাখা। সে আসলে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত কি না, সেদিকে বিশেষ লক্ষ রাখতে হবে। কেউ যদি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়, তাকে সঙ্গ দিতে হবে। আমাদের সচেতনতা, যত্নশীল আচরণই কমাতে পারে প্রযুক্তির অপব্যবহার। প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার পারে আমাদের আগামী প্রজন্মকে সমৃদ্ধ করতে এই ই আমাদের সকলের কাম্য।

লেখকঃ

সদস্য; বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

প্রকাশ তথ্যঃ

পত্রিকাঃ বাংলাদেশের খবর।

তারিখঃ ২২ জুন ২০২১।



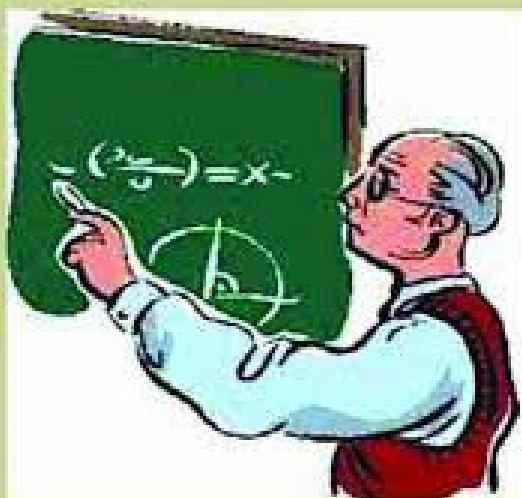
# Teachers deserve respect and security

## Md. Murad Hoshen

There are very few educated people in the country who have not read this poem titled ‘Teacher’s Dignity’ by Kazi Quader Nawaz. The statement of the poem- Not only pouring water at the feet of the teacher, but the student should also wash the feet of the teacher with his hands. Through this poem, the position of the teacher in society has become clear. Education is the backbone of the nation and teachers are the artisans of building people.

Almost everyone knows that it is the moral responsibility of everyone to respect and honor the teachers.

ing at the  
that have  
place with  
in Bangla-  
the last few  
a different  
can be seen  
respect and  
education  
The dis-  
image of  
abuse rais-  
question of  
the digni-  
profession



But look-  
incidents  
t a k e n  
teachers  
desh in  
years,  
picture  
of the  
safety of  
gurus.  
gusting  
teacher  
es the  
whether  
ty of the  
is verbal.

So it’s time for us to think about it. In this country, teachers are tortured in two ways - socio-economic torture and psycho-physical torture. Socio-economic oppression is the degrading of social opportunities by reducing financial opportunities. Failure to pay the dues of private teachers on time also leads to socio-economic oppression. And psycho-physical torture means mental and physical torture. As per the news published in various newspapers recently, teacher Utpal Kumar Sarkar has died due to the cricket stump of 10th class student Ashraful Islam Jitu. Which has become the focus of discussion at all levels. What could be the reason for the constant harassment of teachers? One of the main reasons is the lack of justice and indifference of the authorities in these incidents organized by the teachers.

There are two special reasons behind the bad deeds that are organized by the teachers again and again. 1. The learning environment in schools. That is the classroom environment of the school, the sincere cooperative attitude of the teachers, and the failure of proper supervision of the students. Students need to understand that educational institutions are there to help them, to listen to them, and to tell stories. Students should not be disappointed if they do not read in class or do not achieve the expected results in the exam. Rather it should mean that we are all here to learn from the teachers. By developing tolerance habits, students will feel safe in school and will not develop a violent attitude in young minds.

2. Irresponsibility of the family. For example, in the murder of teacher Utpal Kumar, it is known that the killer is the son of Ujjwal Haji, the nephew of the owner of the student educational institution. After the attack, teachers and students detained him, but his family managed to escape.

Then he fled. So those of us who are guardians refrain from ruling their children unjustly in the name of more affection. If anyone, including teachers, governs their unjust activities, I also question them in various ways. Just as children do not feel remorse for their wrongdoing, so they become more reckless in the future by indulging in criminal activities. In this, various types of social crimes are on the rise. The family situation of the abusers of teachers also needs to be monitored. Because the responsibility for the children's actions also falls on their family.

Reviewing the overall situation, it is seen that at present the teachers are being harassed, humiliated, insulted, and physically injured by the members of the institution committee, or by any political leader, the so-called student leaders, the parents, or even their students.

Everyone assumes that teachers are not only financially weak but also weak in all respects. The issue of teacher abuse is constantly becoming a series. If the punishment for any crime is implemented quickly, the tendency of crime in society will decrease.

Strict laws are needed to prevent teacher abuse. Those who insult and humiliate these honorable people of the country will have to face severe punishment. If the teaching community is being humiliated in this way, the meritorious students will not want to take it as a profession. The district-Upazila teachers' association, the National Teachers' Federation, and the Ministry of Education have to play a strong role in ensuring the dignity and security of teachers.

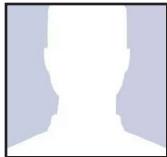
The responsible ministry or association can take action if a teacher makes a mistake. But no one has the right to judge them everywhere. On the other hand, as the educational qualifications of the members of the managing committee / governing body of the educational institution have not been determined, there are various problems in the management of the educational institution and the individual independence of the teachers.

It is necessary to ensure financial well-being by increasing the salaries and allowances of teachers. Financial well-being enhances social status as well as stimulates new creative action in the human mind. Which will play a valuable role in building a developed nation.

A. P. J. Abdul Kalam said, "If a country is free from corruption and a good mindset is developed among all, I firmly believe that there will be three types of people in social life who can make a difference." They are fathers, mothers, and teachers. "Therefore, there is no alternative to ensure the social status and financial security of teachers in building a developed and corruption-free Bangladesh.

Student, University of Chittagong, Organizing Secretary, Bangladesh Young Columnist Forum, Chittagong University

Published: The Daily Observed - 02 July 2022



# সংস্কৃতিক আগ্রাসনে আক্রান্ত বাংলাদেশ

## মো: আব্দুল হাকিম জুবাইর

বর্তমান যুগকে বলা হয় আধুনিক ও বিশ্বায়নের যুগ। বিশ্বায়নের এ যুগে সারা পৃথিবী এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। সমাজ সভ্যতার অনেক বিকাশ ঘটেছে। মানুষের বুদ্ধিগতি চর্চার ক্ষেত্রে অনেক প্রসারিত হয়েছে। অজানাকে জানার অনেক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞান তথ্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বা অবাধ তথ্য প্রবাহের বদেশে লতে। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে মানুষ ঘরে বসেই পৃথিবীকে আয়ত্ত করছে। বিজ্ঞানের এ অভূতপূর্ব সাফল্য মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অনাবিল প্রশাস্তি যেমন এনে দিয়েছে, তেমনি এ প্রযুক্তি মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধগুলো এবং নৈতিকতাকে দিন দিন অঙ্ককারের অতলগহরে তলিয়ে দিচ্ছে। বিজাতীয় অপসংস্কৃতির তাঁওবলীলায় হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ। প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান বিকাশের ফলে বিশ্বায়নের এই যুগে হৃষকির মুখে পড়েছে সমাজব্যবস্থা ও পরিবার।

বাংলাদেশ আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীন মাতৃভূমি। আমাদের এ স্বাধীনতা বহু মূল্যে অর্জিত হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে এক রক্তক্ষয়ী ইতিহাস,

এক জীবন্ত

কিন্তু আজকে

দেশটি বিভিন্নস্থী

বিজাতীয় সংস্কৃতির

জর্জরিত। সংস্কৃতি

জাতির পরিচিতির

উপাদান। এর

জাতির জাতিসম্মতা

পরিস্ফুটিত হয়।

□. □. □□□-

বলেন,

“সংস্কৃতি একটি

আয়না, কিন্তু সেই

যদি সমাজের

ফুটে, সমাজের

ফুটে উঠে তবে সমাজের অসঙ্গতি দেখা দিবে”। আত্মার মৃত্যু ঘটিয়ে অসুন্দরের উপাসনা করে, অকল্যাণের হাত ধরে বেঁচে থাকাই অপসংস্কৃতি। কোন জাতির স্বকীয়তা, জাতীয়তা, সামাজিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ তার সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে। তেমনি সংস্কৃতিতে বিজাতীয় আগ্রাসন একটি জাতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জন ফষ্টার

ডালেস বলেছিলেন, ‘কোন জাতিকে ধ্বংস

করতে হলে, আগে সে জাতির সংস্কৃতিকে

ধ্বংস করে দাও।

জাতির উন্নয়নে শিক্ষা আমদানি করা যায় বটে কিন্তু সংস্কৃতি আমদানি করলে জাতিসম্মতা হারিয়ে যায়। আজকে স্যাটেলাইটের যুগে কোন জাতিকে পঙ্কু করে দেয়ার জন্য তার অর্থনীতি, রাজনীতি এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের বিলোপ সাধনের জন্য সাংস্কৃতিক আগ্রাসনই যথেষ্ট; যা ওপেন সিক্রেট।

সংস্কৃতি মানুষের বাহ্যিক রূপ। মূলতঃ মানুষের ভিতরকার অনুশীলিত কৃষ্ণির বাহ্যিক পরিশীলিত রূপকে সংস্কৃতি বলা হয়। সংস্কৃতি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, যা মানুষের সার্বিক জীবনাচারকে শামিল করে। যখন কোনো সমাজের সাংস্কৃতিক প্রভাব পাশাপাশি কোনো সমাজের চাইতে বেশি হয়ে পড়ে, তখনই সে সংস্কৃতি ঐ সমাজের উপর প্রভাব ফেলতে থাকে। পরিভাষায় যাকে বলে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন।

বাংলাদেশের উপর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চলছে। এটি নৈতিক চরিত্র হরণের পাশাপাশি এতিহ্যবাহী ও কল্যাণকর মূল্যবোধ ও সামাজিক কাঠামোকে ভেঙে দিচ্ছে, উৎপাদনব্যবস্থাকে ধ্বংস করছে। তার প্রভাব ও ব্যাপ্তি অত্যন্ত বিস্তৃত। বাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে প্রধানত ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমসমূহ। বিশেষ করে ভিন্নদেশী চ্যানেলে আমাদের সমাজব্যবস্থার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে বিজাতীয় অপসংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার সহজ সুযোগ মিলছে তরুণ প্রজন্মে।

পশ্চিমা ও ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান আধিপত্যে বাংলাদেশের সংস্কৃতি আজ হৃষকির মুখে! গণমাধ্যম থেকে শুরু করে চলচ্চিত্র ভার্চুয়াল মিডিয়া, সংগীত এমনকি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিজাতীয় সাংস্কৃতির আধিপত্য প্রচার করছে। ভারতীয় সিরিয়ালের ভয়াল থাবা যেন পুরো দেশকে গ্রাস করে ফেলেছে। প্রায় প্রতিটা ঘরেই বাড়ছে ভারতীয় সিরিয়াল দেখার আস্তি। বিশেষ করে এ নেশায় জড়িয়ে পড়ছেন নারীরা। আর তাদের সাথে থাকা শিশুরাও অনেকক্ষেত্রে এসব সিরিয়ালের ভক্ত হয়ে উঠেছে। স্টার জলসা,



মুক্তি যুদ্ধ।

এই স্বাধীন

সমস্যা এবং

আগ্রাসনে

একটি

মৌলিক

মাধ্যমে কোন

আলাদারূপে

সমাজবিজ্ঞানী

□ □ □

সমাজের

আঘনায়

চিত্র না

বিপরীত কিছু

ষ্টার প্লাস, জি বাংলা, জি টিভি, সনি- এসব চ্যানেল যেন এখন রমনীদের কাছে নিত্যদিনের কাজের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রান্না কিংবা খাওয়া হোক বা না হোক, এসব চ্যানেলে অনুষ্ঠিত নাটক তাদের দেখা চাই-ই চাই। প্রতিটা সিরিয়ালেরই বিষয়বস্তু পরিকীয়া, স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস, নারী-পুরুষের অবাধ মিলন, তুচ্ছ কারণে খুন, নির্যাতন, পরচর্চা ইত্যাদি। এসব চ্যানেলের চাকচিক্য, পুরু মেকাপের প্রলেপ, খোলামেলা আর আভিজাত্যের দর্শনে বাঙালির মাঝে একধরনের বিলাসিতার বাসনা সৃষ্টি করেছে। দামি পোশাক সাধারণ পরিবারগুলো কিনতে না পারার কারণে তৈরি হচ্ছে অসহিষ্ণুতা আর ঘটছে নিত্য নতুন অপরাধ। ভারতীয় সিরিয়ালের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে থাকে বৌ-শাশুড়ি, কিংবা নন্দ-ভাবি অথবা জা-জায়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, চুলোচুলি আর প্যাঁচ লাগিয়ে একে অপরের ঘর ভাঙ্গা কিংবা পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি। শাশুড়িকে চোখের বিষ হিসেবে উপস্থাপন করায় এসব সিরিয়ালের মূল বিষয়। ফলে পারিবারিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে। দু-দশক আগেও এমন চিত্র ছিল না। সকলে যৌথ পরিবারে বসবাস করার ফলে একে অপরের মাঝে ভাতৃত্ববোধ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হতো। বাবা-মা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি সকলে মিলে যেন তৈরি হতো এক সুখের সাম্রাজ্য। কালের বিবর্তনে যৌথ পরিবারের বিষয়টি বর্তমান প্রজন্মের কাছে নিছকই অমূলক। গ্রামেও যৌথ পরিবারগুলো এখন সংকটের মুখে পতিত। যা মূলত পশ্চিমা ও ভারতীয় সিরিয়ালের মাধ্যমে দেওয়া এক উপহার!

এসব সিরিয়ালের প্রভাবে দেশে বিগত বছরগুলোতে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে গেছে। বেসরকারি এক জরিপে বলা হয়েছে, ‘ভারতীয় টিভি চ্যানেলগুলোয় প্রচারিত অপসংস্কৃতিতে ভরা নাটক-সিরিয়ালে উদ্বৃদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের শতকরা ৮০ শতাংশ বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে’। ফেডারেশন অব টেলিভিশন প্রফেশনালস অর্গানাইজেশনের (এফটিপিও) এই সভাপতি বলেন, ‘ইদানিংকালে দেশে শতকরা ৮০ শতাংশ বিবাহ বিচ্ছেদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কারণ হলো ভারতীয় সিরিয়াল’। ভারতীয় সিরিয়াল দেখাকে কেন্দ্র করে আত্মহত্যার ঘটনাও কম নয়। গত ২৩ জুন ষ্টার জলসার নাটক দেখতে না দেয়ায় মাঝের ওপর অভিমান করে সাভারে আত্মহত্যা করে সুমাইয়া নামের পনেরো বছরের এক কিশোরী। এমন ঘটনা পত্র-পত্রিকায় এখন প্রায়শই চোখে পড়ে। পরিসংখ্যান বলছে, “ভারতীয় সিরিয়াল দেখাকে কেন্দ্র করে ২০১৭ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৪৭ জন আত্মহত্যা করেছে”।

অপরদিকে আরেকটি জনপ্রিয় সিরিয়াল ‘ক্রাইম পেট্রোল’ (যাকে সহিংসতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বলা হয়) খনের কৌশল রঞ্জ করার অন্যতম মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত মাসের ২১ জুন রাজধানীর কদমতলী এলাকায় বাবা-মা ও বোনকে হত্যা করে মেহজাবীন নামের এক মেয়ে। জানা যায় পারিবারিক টানাপোড়েনের জেড় ধরে ভারতের সিরিয়াল

‘ক্রাইম পেট্রোল’ দেখে সবাইকে হত্যা করার কৌশল শিখে। এসব ঘটনা যেন নিত্যনেমিতিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এসব সিরিজ একজন সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষকে ‘সিরিয়াল কিলারে’ পরিনত করছে। বর্তমান সমাজে নানা অবিচার অনাচার দেখে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আমরা প্রতিনিয়ত বিজাতীয় বা পশ্চিমা সংস্কৃতির আগ্রাসনে দলিত-মরিত হচ্ছি।

বাঙালি জাতির রয়েছে হাজার বছরের গৌরবময় ইতিহাস। সেই ইতিহাস আজ ভুলে গিয়ে তথাকথিত আধুনিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বিলীন করে দিচ্ছি। রক্ত দিয়ে কেনা বাংলা ভাষা আজ আমাদের কাছে অবহেলিত। হিন্দি ভাষার আগ্রাসনে বাংলা ভাষা প্রায় ভুলতে বসেছি। দুর্খজনক হলেও সত্য যে, শিশু-কিশোররা বাংলা ভাষা বলতে যতটা না স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে তার চাইতে বেশী স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে হিন্দি বা ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে।

আমাদের তরুণ সমাজ আজ অপসংস্কৃতির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে জীবন-যাপনে অভ্যন্ত হয়ে পড়েছে। পশ্চিমা বিশ্বের জীবনাচরণ কে মডেল বা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করছে।

সভ্যতার সংস্থাত বা বহু প্রাচীন কালের। এ সংঘাতের মূলে রয়েছে সংস্কৃতির আধিপত্যের লড়াই। ইতিহাসের পাতা খুললে দেখতে পায়, সাংস্কৃতির আগ্রাসনের বলি হয়ে অনেক দেশ ও সভ্যতা বিলীন হয়ে গেছে। ভারতীয় ও পশ্চিমা সাংস্কৃতির আধিপত্য বিস্তার রোধ করতে না পারলে বাংলাদেশেও চরম সংক্ষেপে মুখে পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিজাতীয় সংস্কৃতিকে ছুড়ে ফেলে সুস্থ সাংস্কৃতি চর্চা করতে হবে। যদি নিজেদের সাংস্কৃতিক ভিত মজবুত ও উন্নত হয় এবং নিজেদের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত হয়, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করা খুব কঠিন কাজ নয়। প্রয়োজন শুধু দৃঢ় মানসিকতা আর সংঘবন্ধ শক্তিমত্তা। এই সর্বগ্রাসী আগ্রাসন রোধে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা। সেই সঙ্গে ধর্মীয় অনুশাসনের অনুশীলন, পরমতসহিষ্ণুতা, পারম্পরিক শুদ্ধাবোধ জাগ্রত করাসহ সর্বক্ষেত্রে অশ্বলাভাকে শুধু বর্জনই নয়; প্রতিরোধ করা আজ আমাদের সবার দায়িত্ব হয়ে পড়েছে। যার শুরুটা হতে হবে গৃহাভ্যন্তর থেকেই। প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঢ়াতে হবে।

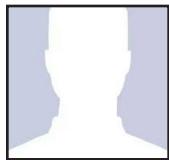
#### লেখকঃ

সদস্য; বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

প্রকাশ তথ্যঃ

পত্রিকাঃ প্রতিদিনের সংবাদ।

তারিখঃ ১৭ জুলাই ২০২১।



# অপার সন্তানার ক্ষেত্র - পর্যটন শিল্প

## রঞ্জুল আমিন

২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে সারা বিশ্বব্যাপী ‘বিশ্ব পর্যটন দিবস’ পালিত হয়। ১৯৮০ সাল থেকে জাতিসংঘের অধীনস্থ বিশ্ব পর্যটন সংস্থার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সকল সদস্য দেশে এই দিনটি পালিত হয়ে আসছে। বরাবরের ন্যায় এবছরেও পালিত হচ্ছে দিবসটি। এবাবের মূল প্রতিপাদ্য হলো “সর্বব্যাপী উন্নয়নের জন্য পর্যটন”। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপরূপ লীলাভূমি। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে যুগে যুগে বহু পরিব্রাজক ও ভ্রমণকারী মুক্তি হয়েছেন। আমাদের রয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত, পাহাড়-পর্বত, অরণ্য ঘেরা জলপ্রপাত, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন, বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ঐতিহাসিক মসজিদ এবং মিনার। সুন্দরবন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনভূমি। ইউনেস্কোর ঘোষণায় ১৯৯৭ সালে বিশ্ব ঐতিহ্যের স্থান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। কর্বুবাজারে আছে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত যা ১২০ কি.মি দীর্ঘ। কর্বুবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত সাগর পাড়ে ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ মেরিন ড্রাইভ নির্মিত হয়েছে। যার ফলে পর্যটকদের কাছে পর্যটন নগরী কর্বুবাজারের প্রতি আকর্ষণ বেড়েছে কয়েকগুণ। বাংলাদেশের হাওর অঞ্চলগুলি পর্যটন খাতের বিকাশে অপার সন্তানার দুয়ায় উন্মোচন করেছে। হাওর অঞ্চলের সাগর সদৃশ জলরাশি তার অপরূপ মহিমায় ভ্রমণবিলাসীদের তৃপ্তি করেছে। হাওর, বিলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পর্যটকরা নৌকায় চড়ে বিস্তীর্ণ নীল জলরাশির মধ্যে ভেসে বেড়ায়।

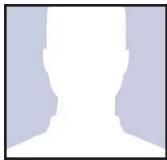
বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং ঐতিহাসিক স্থানকে কাজে লাগিয়ে আমরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছি। বিশ্বে প্রতিটি দেশে পর্যটন একটি শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বিবেচনায় সেরা ৫ টি খাতের মধ্যে পর্যটন খাত অন্যতম। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের পর্যটন খাত অনেক পিছিয়ে। আমাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং ঐতিহাসিক স্থানগুলোকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহারের ব্যর্থতাই এর মূল কারণ। বর্তমানে লক্ষ্যধর্মী মানুষের কর্মসংস্থান তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে উদীয়মান এই শিল্প। হোটেল, মোটেল, রিসোর্ট, পরিবহন, পর্যটন স্পটে দোকান, বিনোদনমূলক বিভিন্ন আয়োজন ও রাইড ইত্যাকার পছাড়া লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। পর্যটন শিল্পের সাথে জড়িত এসকল সেক্টর থেকে একদিকে উন্নয়ন হচ্ছে সাধারণ মানুষের জীবনধারার, অপরদিকে সরকারি কোষাগারে জমা হচ্ছে প্রচুর রাজস্ব।

দেশের এসকল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং ঐতিহাসিক নিদর্শনকে সংরক্ষণ ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে সরকার এবং বেসরকারি সংস্থার সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সরকার পক্ষ থেকে পর্যটন খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। সেই সাথে পর্যটকদের আবাসিক প্রয়োজন পূরণে হোটেল-মোটেল ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে, নিশ্চিত করতে হবে নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থা। আমাদের পর্যটন স্পট গুলোকে দেশ ও দেশের বাইরে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করতে হবে। প্রত্যাশিত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক প্রচার-প্রচারণা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করতে হবে। এই খাতের দুর্বল এবং সবল দুইটি দিকই চিহ্নিত করে পরিকল্পনা মাফিক এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে নবদিগন্তের শুভ সূচনা ঘটাতে হবে। আমাদের পর্যটন স্পটগুলোতে নিরাপত্তা বাড়ানো প্রয়োজন। নৌকায় ভ্রমনের সময় জলদস্যুদের আক্রমণ এবং স্থলে বিভিন্নভাবে হামলায় পর্যটকদের নগদ টাকা, মেবাইল ফোনসহ মূল্যবান সম্পদ সন্ত্রাসীরা ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কখনো কখনো প্রাণ হারাতে হচ্ছে। নিরাপত্তা বাড়লে দেশী ও বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা বাড়বে উল্লেখযোগ্য হারে। পর্যটন স্পট গুলোতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং খাবার মূল্য লাগামহীন হয়ে পড়েছে। সরকারের কঠোর নজরদারিতে পর্যটন এলাকায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং খাবারে দাম যেন নিয়ন্ত্রণে থাকে সে বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পর্যটন এলাকায় বেশি মানুষের সমাগম হওয়ার কারণে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। ফলে পর্যটকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ার সন্তানা বেড়েই চলছে। প্রশাসনের উদ্যোগে পর্যটন স্পটগুলোতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থাও থাকা আবশ্যিক। সেই সাথে পর্যটকরা যেন ময়লা যত্নত না ফেলে নির্ধারিত স্থানে ফেলে সেটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তাছাড়া আমাদের পর্যটন খাতের উন্নয়ন টেকসই হবে না। এছাড়া হোটেল-মোটেল, রেস্টুরেন্টের বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ভ্রমন পিপাসুদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন সুবিধা নিশ্চিতকরণে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। পর্যটন কেন্দ্রগুলোর যথাযথ মান উন্নয়ন করতে পারলে দেশী-বিদেশী উভয় পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব। আর এভাবেই বাংলাদেশের পর্যটন খাতের উন্নয়ন সাধিত হবে।

লেখকঃ

সদস্য; বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।



# কলমের কান্না কি শুনতে পাও?

## আশিকুর রহমান

আমরা হাতের কলমটি দিয়ে প্রতিদিন কত কথা লিখি; সুখ, দুঃখ, হাসি-আনন্দ, কান্না ও বেদনার কথা। কিন্তু আমরা কখনো বুঝতে চাইনা কলমের ও রয়েছে নিজস্ব কিছু কথা, কিছু প্রত্যাশা। আমরা কি কখনো ভাবি সেই কলমের কথা? কিসে কলমের আনন্দ, কিসে কলমের বেদনা? কলমের যে সাধক, কলম চায় সে তাকে সমাদরে, পরম মর্মতায় যেন সত্যের পথে পরিচালিত করে। কিন্তু আমরা কলমের সাধকরা কি পারি কলমের যথার্থ মর্যাদা রক্ষা করতে? কোন লেখক যখন কলমের কথা অনুভব করে ও প্রত্যাশা পূরণ করে কলমের তখন হাসি ফুটে, আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। লেখকের হৃদয়েও যে তখন আনন্দের রেখা বয় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কলমের প্রতিটি শব্দ একেকটা ফুল। আর কলমের রেখা তো একেকটা আলোকরেখা। কলমই পারে একটি অন্ধকার জীবনকে আলোর পথে আনতে, পারে সমাজকে সত্যের পথ দেখাতে, পারে ন্যায় ও কল্যাণের পথে অবিচল থাকতে। একটি কথার মূল্য হতে পারে সমাজের জন্য আদর্শস্থরূপ। কলমের দ্বারাই পরিবার, সমাজ তথা দেশের অপসংস্কৃতি রূখতে পারে। সমাজের অন্যায়, অত্যাচার ও দূর্নীতি তুলে ধরে সমাজের গতিধারা পরিবর্তন করতে পারে। প্রতিটি কলম যোদ্ধা চাইলেই সমাজের পরিবর্তন নিয়ে আসা সম্ভব। তবে কলম যোদ্ধাকে অবশ্যই কলমের যোগ্যতা অর্জনে সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কলম অন্ত্র চালাতে হবে। কলমের একটি লেখা জীবনে বিপুর সৃষ্টি করতে পারে। পারে সমাজের গভীর অতলে তলিয়ে থাকা কোন জীবন সংগ্রামীর ঘটনা ফুটিয়ে তুলতে। পথশিশুদের বাসস্থানের অভাব, প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাব, শহরের বসবাস অযোগ্য জায়গায় বস্তিবাসীর অসহায়ত্ব। তাদের হাতে কলম তুলে দেয়ার সময়ই তারা খাদ্যের খোঁজে পথে বের হয়। শিক্ষা ও কলমই পারে তাদের উন্নত জীবন দিতে। মৌলিক চাহিদা গুলো যেন তাদের বিলাসিতা। অথচ কলমের ঢোঁটে এই দুর্দশা তুলে ধরে তাদের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। দূর্নীতি, দুঃখাসন, সুন্দ-ঘৃষ যেন বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রাত্যহিক জীবনের একটা বড় অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এসবের বিরুদ্ধেও কলম কথা বলতে পারে। পারে আক্রান্ত সমাজের ফুসফুসকে পয়ঃনিঙ্কাশন করে সুস্থ করে তুলতে। পূর্বযুগে যারা কলমকে সত্য ও ন্যায়ের পথে ব্যবহার করেছেন তারা বর্তমান কলম যোদ্ধাদের জন্য চলার পথে পাথেয় যোগায়। কলমের ঢোঁটে জায়গা করে নেওয়া গল্প, কবিতা কিংবা উপন্যাসের পাতায় সমাজের দুর্দশা ফুটিয়ে তুলতে পারে। সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে সাহসিকতার সাথে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলার সৎসাহস নিয়ে মানুষকে কল্যাণের পথ দেখাতে পারে। লেখকের লেখায় অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম ও মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ ধ্বনিত হয়। এসব লেখার প্রভাবে সমাজে পরিবর্তন ও যুব সমাজের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার প্রতিবাদী কবিতা গুলোয় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন উসকে দিয়েছিলেন: এ দেশ ছাড়বি কিনা বল, নইলে কিলের ঢোঁটে হাড় করিবো জল। অন্যায়ের সাথে আপোষহীন এই কবি দেশ ও মানুষের চিন্তা করে কলমকে বানিয়েছিলেন অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে শান্তিত অন্ত্র। সমাজ থেকে কি দুঃখ-বেদনা, কুসংস্কার, অপসংস্কৃতি, শোষণ উঠে গেছে? এসব সমসাময়িক বিষয় তুলে ধরে সমাজের তরঙ্গের মাঝে প্রতিফলন ঘটাতে পারে। কিন্তু কলম যখন কারো হাতে লাঞ্ছিত, অন্যায় অত্যাচারের অধীন তখন কলম থাকে শিকলবদ্ধ। সেই কলমে সমাজের দুর্দশার প্রতিফলন ঘটেনা। আমরা কেন ভাবিনা কলমের কথা? কেন কলমের কান্না শুনতে পাইনা আমরা? নাকি বোধগম্য হয়না? প্রতিটি কলমের ঢোঁট নিঃস্ত কালিই যে কলমের বেদনার বহিঃপ্রকাশ তা উপলব্ধি করি কখনো? করিনা। প্রতিটি পৃষ্ঠায়, প্রতিটি শব্দে আমরা তার অপব্যবহারের সাক্ষী রাখছি। যে কালিতে সমাজের দুর্দশার প্রতিফলন ঘটানোর কথা সেই কালিই এখন কানার জল। যে কলম সমাজ সংস্কারের অন্ত্র হওয়ার কথা সেই কলম হচ্ছে ব্যবহার্য সামগ্ৰী মাত্ৰ। কলমের দাম পাঁচ টাকা হলেও এর মূল্য অপরিসীম। কিন্তু আমরা এর মূল্য অনুভব করতে পারিনা, পারিনা কান্নার শব্দ শুনতে। কলম হয়ে আছে চাতকের মতো পিপাসিত, অনাহারী শিশুর মতো ক্ষুধার্ত। কলম চায় সুর্যের মত দেদীপ্যমান হতে, চায় সমাজের উজ্জ্বল অন্ত্র হতে। এই মূল্যহীন কলমের এক সমুদ্র কালি দিয়ে কি সমাজের এক বিদ্যু পরিবর্তন সম্ভব? না সম্ভব না। কলমের যখন এই শোচনীয় অবঙ্গ, যথার্থ ব্যবহার হয়না তখন আমরা কলমের সঠিক চৰ্চা থেকে পিছিয়ে আছি। লেখকরা সঠিক চৰ্চা না করলে সমাজ থেকে অন্ধকার দুর হবেনা। দুর হবেনা কলমের কান্না। আমরা চাইলেই পারি কলমের হাসি-কান্না অনুভব করে কলমের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে। সমাজকে অন্ধকারাছছন থেকে আলোয় নিয়ে আসা এবং সকল অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ, নির্যাতন, গুম, খুনসহ সকল সমসাময়িক বিষয় গুলোর দর্পণ হিসেবে ব্যবহার করতে।

হে লেখক! এখনই সময় কলমের কান্না অনুভব করার, কলমকে কাজে লাগানোর, সময় কলমকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে শান্তিত করার। লেখকের লেখনীতে কলম হয়ে উঠুক সমাজের আয়না এটাই প্রত্যাশা।

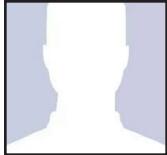
লেখকঃ

সদস্য: বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

প্রকাশ তথ্যঃ

পত্রিকাঃ দৈনিক জনতা।

তারিখঃ ২৭-০৭-২০২২।



## ‘চল ঘুরতে যাই’ সুরাইয়া ইয়াসমিন

দিনটা ছিলো ৪ জুন, ২০২২।

আগের রাতে বান্ধবী শ্যামলী বললো, “চল ঘুরতে যাই”।

কোথায় যাওয়া যায় এই প্লান করতে করতে শেষমেষ আমাদের যাওয়া হয় না কোথাও। তাই এবার কোনো প্লান ছাড়াই আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি।

শ্যামলী বললো “চল বের হই, বাসে উঠে ঠিক করবো কোথায় যাওয়া যায়।”

গন্তব্য ক্যাম্পাস, সেখান থেকে কুষ্টিয়া ;তারপর যেদিকে ইচ্ছে যাবো।

যেই ভাবনা সেই কাজ। ভোরে রিকতার ফোনে স্মৃত ভাঙলো। স্মৃত থেকে উঠে রেডি হয়ে বের হয়ে গেলাম। বাসায় থাকার কারনে আমার পৌঁছাতে দেরি হলো। যথারীতি ক্যাম্পাস বাস মিস করলাম।

শ্যামলী আর রিকতা ক্যাম্পাস বাসে আগেই পৌঁছে গিয়েছিলো চৌড়হাস মোড়, কুষ্টিয়া। পরে বন্যাও বাস মিস করাতে আলাদা বাসে চৌড়হাস এসেছিলো। চৌড়হাস থেকে আমি, শ্যামলী, রিকতা, বন্যা আমরা ৪ জন একত্র হলাম। তারপর ৪টা টিকিট কেটে বাসে উঠে রওনা দিলাম কুমারখালির উদ্দেশ্যে। বাসস্ট্যান্ডে নেমে ভ্যান যোগে গেলাম ‘সাংবাদিক কাঞ্জাল হরিনাথ জাদুঘরে’। জায়গাটা বেশ সুন্দর ও মনোরম লেগেছিলো আমাদের কাছে।

ছাপার যন্ত্র সহ সেই সময়ের নানা যন্ত্রাদি ও ফলক জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে; আছে কাঞ্জাল হরিনাথের লেখা কবিতা সহ আরো বেশ কিছু লেখনী।

এছাড়াও জাদুঘরে লাইব্রেরি ছিলো, সেখানে অনেক বইয়ের কালেকশন লক্ষ্য করি আমরা।

বেলা ১ টার দিকে জাহুঘর থেকে বের হয়ে ভ্যানযোগে রওনা হই, গন্তব্য ছিলো পদ্মার পাড় ও শিলাইদহ কুঠিবাড়ি। ভ্যানে ওঠার সময় শ্যামলী ভ্যানওয়ালা মামাকে বললো “মামা পথের মধ্যে সুন্দর জায়গা দেখলে একটু দাঁড়াবেন আমরা ছবি তুলবো” মামাও বেশ অমায়িক

হলো।

দেখা মিললো

বাড়ির।

বিশিষ্ট কাঠের

দূর দূর ত

দশর্ণা থীরা

চারজনের ছবি

ভ্যানওয়ালা

এ বা র

পদ্মা র

রোদ। মনে

এ ক ম া ত

ন দী প্রে মী।

কিছুক্ষণ পা

থা ক ল া ম।



মানুষ মনে  
পথি মধ্যে  
কাঠ পর  
পাঁচ তালা  
বাড়ি দেখতে  
থেকে  
এসে থাকেন।  
তুলে দিলো  
মামা।  
পৌঁছালাম  
পাড়ে। প্রচন্ড  
হলো জগতে  
আমরা চারজন  
নদীর পানিতে  
ডুবিয়ে বসে  
ইচ্ছা ছিলো

নৌকায় ঘোরার, তবে হাতে সময় ছিলো কম। কম সময়ের মধ্যে আমাদের আরো কিছু স্পট দেখতে হবে।

পরে সেই একই ভ্যানে চলে আসলাম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে। মনোরম পরিবেশ আর সবুজ গাছগাছালির সমারোহ।

টিকিট কাউন্টারে জনপ্রতি ২০ টাকা দিয়ে প্রবেশ করলাম কুঠিবাড়ি। ইতোমধ্যে আমরা বেশ ক্লান্ত, ত্রুট্য এবং ক্ষুধার্ত। টিউবওয়েল থেকে মুখ হাত ধুয়ে, পানি খেয়ে, বসলাম রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত পুকুর পাড়ে। যে পুকুরের পাড়ে বসে তিনি রচনা করেছেন তার বিখ্যাত সব কবিতা, উপন্যাস।

পুকুর পাড়ে বিরিবিরি বাতাসে মনে আলাদা প্রশান্তি জাগালো। আমি ব্যাগ থেকে টিফিন বক্স বের করতেই ওরা বলে উঠলো “বক্সে  
কি এনেছিস? এতক্ষণ কেনো বলিসনি?”

আসলে বক্সে ছিলো নুডলস, যেটা আমি স্মৃত থেকে উঠেই রাখা করেছিলাম, যার জন্য আমার বাস মিস হয়ে যায়।

সবাই নুডলস খেয়ে কিছুটা ক্ষুধা নিবারণ করে নিলাম। তারপর পুরো জায়গাটা ঘূরেঘূরে দেখে নিলাম। আর ছবি তুলতে ভুল হলো না  
কারো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত আম গাছ আছে বেশ কিছু, সেখান থেকে আমও কিনে খেলাম আমরা।

কুঠিবাড়িতে মূলত রবীন্দ্র স্মৃতিবিজড়িত নানা ধরনের জিনিস আমরা দেখতে পাই, সাথে রবীন্দ্রনাথের কিছু লেখা এবং ছবিও দেওয়ালে  
দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত পালঙ্ক, নৌকা সহ বিভিন্ন জিনিস আছে সংরক্ষিত আছে কুঠিবাড়িতে।

দুপুর পর ইজিবাইক যোগে আমরা পৌঁছায় গড়াই ব্রিজে। গড়াই নদীর উপর অবস্থিত রেল ব্রিজে যাই আমরা। ব্রিজের উপর উঠার অনুভূতি ছিলো বেশ রোমাঞ্চকর, একটু একটু ভয়ও লাগছিলো। কেউ ই ব্রিজের উপর হাঁটতে পারিনি, শ্যামলী অনেকটা দূর হেঁটে গিয়েছিলো। বড় লাট লর্ড মেয়ো ছিলেন ব্রিটিশ শাসনামলের একজন সুযোগ্য শাসনকর্তা। তাঁর সময়ে নির্মিত হয় এই গড়াই রেলব্রিজ। ব্রিজটিতে লংগেজ এবং স্টার্টগেজ আছে, তবে শুধুমাত্র লংগেজ ট্রেনই চলাচল করে থাকে।

একইদিনে পদ্মা আর গড়াই দুইটা নদীর পাড়ে ঘুরলাম। রেলব্রিজ থেকে নেমে চলে আসি পাশের সাধারণ যানচলাচলের ব্রিজে, সেখান থেকে অটোযোগে কুষ্টিয়া শহরের দিকে। ততক্ষণে দুপুর গড়িয়ে বিকেল। গেলাম একটি রেস্টুরেন্টে, সেখানে খেয়ে যেনো সারাদিনের ক্ষুধা মিটালাম ‘পেট ঠান্ডা তো জগৎ ঠান্ডা’। তবে আরো দুরাঘুরি করার ইচ্ছা থাকলেও প্রচন্ড ক্লান্ত আর সময় স্বল্পতার কারণে তা সন্তুষ্ট হয়নি।

লেঙ্গনায়োগে রওনা হই যে যার বাড়ির উদ্দেশ্যে।

চাইলে আপনারাও কাজে লাগাতে পারেন এই গরমের ছুটিটা। দূরে কোথাও না গিয়ে ধারেকাছে কোথাও ঘুরে আসুন না বন্দুদের সাথে, বেশ ভালো সময় কাটিবে আশা করি।

এরকম পূর্বপরিকল্পনা ছাড়া বের হওয়ার অনুভূতি আসলেই ভিন্ন।

লেখকঃ

সদস্য বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, ইবি শাখা।

প্রকাশ তথ্যঃ

পত্রিকাঃ ক্যাম্পাস লাইভ।

তারিখঃ ১৬-০৬-২০২২।



# মুসলিম উম্মাহর ইবাদতের মৌসুম রমজান

## মাসুম বিল্লাহ

আল্লাহ তাআলা মানুষকে কল্যাণের জন্য ভালো কাজের একটি মৌসুম উপহার দিয়েছেন। যে মৌসুমে মানুষের ভালো কাজের প্রাণ্টি বেড়ে যায় আবার মন্দ কাজের প্রভাব একেবারেই কমে যায়। বান্দার সম্মান ও মর্যাদা বেড়ে যায়। আতঙ্গন্ধির পথ দেখায় মুসলিম উম্মাহর জড়জীর্ণ জীবনের, উজ্জীবিত করে মুমিন মুসলমানের শরীর- মনে সজীবতা ও পরিশুদ্ধতার। ইঙ্গিত করে রবে সান্নিধ্যে যাবার , সুযোগ করে দেয় মুমিন মুত্তাকী মানসে রূপান্তরিত হবার। ভালো কাজের এই অন্যতম মৌসুমটি হলো পবিত্র রমজান মাস।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন, হে মুমিনগণ ! তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে যেমনিভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগনের উপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো ( সূরা বাকারা -১৮৩) চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আরবী মাসের গণণা হয়। পবিত্র রমজান ও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই প্রিয় নবি করিম ( স:) রমজান শুরুর দুই মাস আগে তথা রজব মাস থেকেই রমজানের ইবাদত-বন্দেগি ও হকুম-আহকাম পালনে নিজেকে তৈরি করতেন। সাহাবায়ে কেরামকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলতেন। হাদিস শরীফে এসেছে, রসুলুল্লাহ ( স:) দোয়া করতেন “হে আল্লাহ ! আমাদের জন্য রজব ও শাবান মাসে বারাকাহ দান করুন এবং রমজান পর্যন্ত পৌছিয়ে দিন” ( মুসনাদে আহমাদ -২৫৯ ) ।

এ মাসটি কত বরকতময় যে তা পাবার জন্য আল্লাহর রাসুল ( স:) পর্যন্ত দোয়া করতেন। পবিত্র রমজানের পরিচয়, ফজিলত, উপকারিতা, পরিণাম অনেক বেশি। তার সাথে সাথে মুমিনের কিছু করণীয় ও বর্জণীয় দিক আছে যা একজন মুমিনের পালন করা অবশ্য পালনীয়। মূলত রমজান বলতে রমজান মাসকে বোঝানো হয়। এই মাস আরবি বারো মাসের মধ্যে নবম মাস। এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সশ্঵ান্ত মাস। রমজান শব্দটি আরবি ‘রামজুন’ থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ হচ্ছে, উত্তপ্ত হওয়া, দক্ষ হওয়া, পুড়ে যাওয়া ইত্যাদি। রোজার মাধ্যমে যেরূপ মানুষের কুপ্রবৃত্তি জুলে-পুড়ে যায় তেমনি ক্ষুধা বা পিপাসার জ্বালায় তার পেট উত্তপ্ত ও দক্ষ হয়ে যায়, তাই একে রমজান বলা হয়। আর রোজা ফারসি শব্দ। এর আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে ‘সাওম’। আর ‘সাওম’-এর অর্থ হচ্ছে, বিরত থাকা, কঠোর সাধনা করা, আত্মসংয়ৰ্মোহণ হওয়া। আর ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায়, ‘সাওম’ তথা রোজা হলো সুবহে সাদেক থেকে সূর্যান্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা। রমজান মাসের অনেক বেশি তাৎপর্য ও ফজিলত রয়েছে। এই মাসে যে রহমত নাজিল হয় তার তুলনায় অন্যান্য মাসের নাজিলকৃত রহমত, সমুদ্রের তুলনায় এক ফোটা পানির মতো। আমরা জানি রমজান কোরআন নাজিলের মাস। এই মাসে রয়েছে এমন এক মহামান্বিত রাত যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এই মাসে কোনো নফল আদায় করলে সেটা ফরজের সমান সওয়াব, আর কোনো ফরজ আদায় করলে সেটা ৭০ গুণ সওয়াব

রোজার বিনিময় স্বয়ং আল্লাহ দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। হাদিসে কুদসিতে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, মানুষের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য, কিন্তু রোজা এর ব্যতিক্রম। রোজা শুধু আমার জন্য, আমিই এর প্রতিদান দেব। (মুসলিম: ২৭৬০) হ্যরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স:) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও পর্যালোচনাসহ রমজান মাসের সিয়াম পালন করবে, তার পূর্ববর্তী গুণাহ মাফ করে দেওয়া হবে। (সহীহ বুখারী: ৩৮, সহীহ মুসলিম: ৭৬০)

আর রোজাদারদের জন্য রাইয়ান নামক একটি বিশেষ প্রবেশদ্বার থাকবে যেখানে অন্য কারো আগমন ঘটবে না। (মুসনাদে বাজার রমজান মাস শুধু ফজিলতের মাস না; ফজিলতের পাশাপাশি রমজানের অনেক উপকারিতাও রয়েছে।

বিশুজ্গতের মহান চিকিৎসক হজরত মোহাম্মদ

(স:) বলেছেন, প্রতিটি বস্তর জাকাত আছে, শরীরের জাকাত রোজা ( সুনানে ইবনে মাজাহ -১৭৪৫ )। অতএব, আমাদের রোজা রাখা উচিত। রোজা রাখার ক্ষেত্রে কয়েকটি সহজ ফর্মুলা যদি অনুসরণ করা হয়, তাহলে রোজার সমস্ত উপকার এবং কল্যাণ অর্জন করা সম্ভব।

আমরা জানি, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শিরা-উপশিরাগুলো সচল রাখতে খাবারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই খাবারই যদি নিয়মিত এবং পরিমিত না হয়, তাহলে শরীরের শক্তি জোগানোর পরিবর্তে রোগ সৃষ্টি করে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও রমজানের অনেক উপকারিতা রয়েছে। যা মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খুবই উপকারি। অসময়ে, অসম ভক্ষণ, হজম প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে একমত যে, শরীরের অধিকাংশ রোগ সৃষ্টি হয় অস্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণের কারণে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আরো বলেন, রোগের কেন্দ্রবিন্দু হল পেট, অতিরিক্ত খাদ্যাভ্যাস এড়িয়ে চলা রোগের আরোগ্যতা।

ইতালির বিখ্যাত শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলো ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। ৯০ বছর পার হবার পরও তিনি কর্মক্ষম ও কর্মঠ ছিলেন। এর রহস্য জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ‘আমি বহু বছর আগে থেকে মাঝে মাঝে রোজা রেখে এসেছি। আমি প্রত্যেক বছর এক মাস ও প্রতি মাসে এক সপ্তাহ রোজা পালন করতাম।’

এমন অনেক উদাহরণ আছে যারা রোজার মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন। এইরকম বুদ্ধিজীবী , ডাক্তার, গবেষকরা ভালো করেই জানেন মহান স্মষ্টা অকারণে রোজাকে ফরজ করেন নি। কারণ তারা কুরআন ও ইসলামের নিয়ম কানুন নিয়ে রীতিমত পড়াশুনা ও গবেষণা করেন।

রমজানের অনেক পরিণাম রয়েছে যা অবশ্য পালনীয়।

একদা তায়েফে নবী করীম (স:) যখন দীন প্রচার করতে গেলেন তখন তায়েফবাসী পাথর মেরে উনাকে রক্তাক্ত করে দিলেন। হ্যরত জীবরাস্তে (আ:) দুপাহাড়কে একত্রিত করে তায়েফবাসীকে ধংস করে দেয়ার অনুমতি চাইলেন। রাসুলুল্লাহ (স:) বললেন, “হে আল্লাহ ! তাদেরকে হেদায়েত দান করুন”। আর একবার হ্যরত জীবরাস্তে (আ:) বললেন “যে ব্যক্তি রমজান মাস পেয়েও তার গোনাহ ক্ষমা করে নিতে পারল না সে ধংস হোক”। এটা শুনে রাসুলুল্লাহ (স:) বললেন “আমীন”।

তায়েফবাসী যারা ছিল কাফের, তাদের জন্য রাসুলুল্লাহ (স:) বদদোয়া করলেন না, অথচ মুসলমানদের জন্য রাসুলুল্লাহ (স:) বদদোয়া করলেন। এটা কেনো? একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝা যাক - মনে করুন একটি ১৫/১৬ বছরের ছেলেকে আপনি ৫ + ৫ কত হ্য প্রশ্ন করলেন, সে যদি সঠিক উত্তর দিতে না পারে তখন আপনি অবশ্যই আশ্চর্য হবেন ! এবং তাকে তিরক্ষার করবেন, এমন সহজ একটি যোগ না পারার কারণে। রমজান মাসের এমন ফজীলত এবং আল্লাহর এত অসীম রহমত নাজীল হ্য যে, এরপরও কেউ যদি তার গোনাহ মাফ করে নিতে না পারে, তাহলে সে-ও তেমন তিরক্ষার যোগ্য।

রমজানের অনেক গুলো করণীয় দিক যেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো : পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করা, বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা, অধিক পরিমাণে দান সাদাকাহ করা, রোজাদারকে ইফতার করানো, বেশি বেশি দোয়া ও জিকির করা, শেষ দশকে ইতিকাফ করা এবং লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করা।

রমজানের করণীয় দিকের সাথে সাথে কিছু বর্জনীয় দিকও আছে। বর্জনীয় দিকগুলোর মধ্যে হলো রোজাকে বোঝা কিংবা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর না ভাবা, সব ধরনের হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা, মিথ্যা পরিত্যাগ করা, বাগড়া-বিবাদে লিঙ্গ না হওয়া, গিবত না করা, হিংসা করা থেকে বিরত থাকা।

সর্বোপরি বলা যায় রোজা ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনে সাহায্য করে। রোজায় যে আনন্দ, অনুভূতি, আত্মিক পরিত্বষ্টির সাথে সংযম, কুপ্রবৃত্তি দমন, লোভ-লালসা, হিংসা, প্রতিহিংসা ইত্যাদি ত্যাগ করার যে আলোকোজ্জ্বল অনুভূতির চর্চা হয় তা রমজানের রোজা ছাড়া অন্য কোনভাবে লাভ করা যায় না।

তবে আমরা রোজা পালন করি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। সেই সাথে রোজার বৈজ্ঞানিক উপকারিতা আমাদের এক্সট্রা বোনাস। আর রোজার যে মহৎ উদ্দেশ্য; তাকওয়া, ধৈর্য-সংযম ও মাগফিরাত তা যদি অর্জন হয় তবেই আমাদের জীবনে রমজানের আগমন সার্থক। অন্যথায় রাসুল (সা.) এর সেই বাণী কতই না যথার্থ! ‘কত রোজাদার আছে যাদের রোজার বিনিময়ে ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই জোটে না। কত সালাত আদায়কারী আছে, যাদের রাত জাগরণ ছাড়া আর কিছুই জোটে না।’ (ইবনে মাজাহ : ১৬৯০)

লেখকঃ শিক্ষার্থী,

ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়। কুষ্টিয়া।

ও সদস্য, বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম। ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

প্রকাশ তথ্যঃ

পত্রিকাঃ প্রতিদিনের সংবাদ।

তারিখঃ ০৪ এপ্রিল ২০২২।



## বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন সফল হলো আয়েশা সিদ্বিকা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন যেন সত্যিকারে রূপ নিল পদ্মাসেতু নির্মাণের মাধ্যমে। পদ্মা সেতু বাংলাদেশের মানুষের কাছে স্বপ্নের হাতছানির মত ধরা দিয়েছে। স্বপ্ন হয়তো ক্ষণিকের জন্য, কিন্তু সেই স্বপ্ন যখন বাস্তবে রূপ নেয়, তা সত্য বিশ্বাসকর। বাংলাদেশের জননী এবং বঙ্গবন্ধুর কন্যা, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলার মানুষের সেই স্বপ্নের হাতছানিকে বাস্তবে রূপ দিল পদ্মা সেতু তৈরির মাধ্যমে।

পদ্মা সেতু হচ্ছে বাংলাদেশের পদ্মা নদীর উপর নির্মিত একটি বহুমুখী সড়ক ও রেল সেতু। এর মাধ্যমে মুস্তাগজ্জের লৌহজংয়ের সাথে শরীয়তপুর ও মাদারীপুর জেলা যুক্ত হয়েছে। সেতুটি ২০২২ সালের ২৫ জুন উদ্বোধন করা হয়। এই দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজে মাওয়া প্রান্ত দিয়ে টোল প্রদান করে প্রথমবারের মত আনুষ্ঠানিকভাবে পদ্মা সেতুতে আরোহন করেন এবং এর মাধ্যমে সেতুটি উন্মুক্ত করা হয়। দুই শ্রেণী বিশিষ্ট স্টিল ও কংক্রিট নির্মিত ট্রাসের এই সেতুর উপরের স্তরে চার লেনের সড়ক পথ এবং নিচের স্তরে একটি একক রেলপথ রয়েছে। পদ্মা-বৰ্ষাপুত্র-মেঘনা নদীর অববাহিকায় ৪২টি পিলার ও ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের ৪১টি স্প্যানের মাধ্যমে মূল অবকাঠামো তৈরি করা হয়। সেতুটির দৈর্ঘ্য ৬.১৫০ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ১৮.১০ মিটার। পদ্মাসেতু নির্মাণ শুরু হয়েছিলো ২০১৪সালের ২৬ নভেম্বর। নির্মাণকারী কোম্পানি ছিলো চায়না মেজর ব্রিজ ইন্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড। নির্মাণ ব্যয় ছিলো ৩০,১৯৩কোটি ৩৯ লক্ষ। নকশাকার ছিলো এইসিওএম এবং রক্ষণাবেক্ষণ ছিলেন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ। নির্মাণ শেষ হয় ২৩ জুন ২০২২ সালে।

এই পদ্মাসেতু নির্মাণের মাধ্যমে বাংলার মানুষ আজ গর্বিত। এই সেতুর মাধ্যমে যাতাযাত ব্যবহাৰ সুবিধা হয়েছে, আগে যেখানে নদীপথে চলাচল করতে হতো, আজ তার অবসান হয়েছে। এই সেতুর যেন কোন ক্ষয়ক্ষতি না হয় তারজন্য শুধু প্রশাসন বা সেতু কর্তৃপক্ষ সচেতন থাকবে তা না বরং একটি সচেতন দেশের নাগরিক হিসেবে সবাইকে সচেতন থাকা উচিত।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়



# অপরিকল্পিত উন্ময়ন ও পরিবেশ বিপর্যয়ে বায়ুদূষণ বাড়ছে

## রোকাইয়া আকতার তিথি

ক্রমাবন্ত দূষণের ফলে বিপর্যয়ে বাংলাদেশ। প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে দূষণের মাত্রা। ২২ মার্চ ২০২২ রঞ্টার্স কর্তৃক প্রকাশিত একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশের ৬ হাজার ৪৭৫টি শহরের দূষণের তথ্যভিত্তিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, একটি দেশও ২০২১ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডিইউএইচও) প্রত্যাশিত বায়ুমানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারেনি।

বাংলাদেশ আগের বছরের মতো ২০২১ সালেও সবচেয়ে দৃষ্টিত দেশের স্বীকৃতি পেয়েছে। এ ছাড়া, ঢাকা বিশের দ্বিতীয় দৃষ্টিত রাজধানী হিসেবে তালিকায় উঠে এসেছে। দেশে বায়ুদূষণ এখন মারাত্মক পর্যায়ে পেঁচাঁচাঁচে গেছে। বায়ুদূষণে আক্রান্ত সারা দেশ। প্রতিটি জেলাতেই বায়ুদূষণের হার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে অন্তত তিনগুণ বেশি। গ্রামাঞ্চলের চেয়ে শহরাঞ্চলে বায়ুর মান তুলনামূলকভাবে খারাপ অবস্থায় রয়েছে। রাজধানী ঢাকার বায়ুর মান সবচেয়ে বেশি অস্বাস্থ্যকর।

একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা বিশের প্রধান প্রধান শহরের বায়ুর মান নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে থাকে। এ সংস্থা গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) রেকর্ড করেছে, তার তথ্য মতে ঢাকার ক্ষেত্রে ছিল ২৪২। বিশের প্রধান শহরগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ এ ক্ষেত্র। ঢাকার পরেই ছিল যৌথভাবে কাজাখস্তানের নূর-সুলতান নগরী ও পাকিস্তানের লাহোর। এ দুই শহরের একিউআই ক্ষেত্রে ওইদিন ছিল ১৮৭। একিউআই ক্ষেত্র ২০১ থেকে ৩০০ হলে ‘অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর’ বলা হয়। এর উপরে গেলে ‘বুঁকিপূর্ণ’ বলে বিবেচিত হয়, যা মানুষের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্যবুঁকি সৃষ্টি করে।

বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দূষণ ও পরিবেশগত ঝুঁকির কারণে যেসব দেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত তার একটি বাংলাদেশ।

দেশের ৬৪ জেলার বায়ুর মান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, গাজীপুর জেলার বাতাস সবচেয়ে দৃষ্টিত। স্টামফোর্ড বায়ুমন্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (ক্যাপস) এর গবেষণায় জানা গেছে এ তথ্য।

গবেষণা থেকে দেখা যায়, ২০২১ সালে বাংলাদেশের ৬৪ জেলার সর্বমোট ৩১৬৩টি স্থানের গড় অতিক্ষুদ্র বস্তুকণা ছিল প্রতি ঘনমিটারে ১০২.৪১ মাইক্রোগ্রাম। দৈনিক আদর্শ মানের (৬৫ মাইক্রোগ্রাম) চেয়ে প্রায় ১.৫৭ গুণ বেশি এটি।

পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ৬৪ জেলার মধ্যে গাজীপুর জেলায় সবচেয়ে বেশি দূষণ পরিলক্ষিত হয়। গাজীপুরের বাতাসে প্রতি ঘনমিটারে ক্ষুদ্র বস্তুকণা ছিল ২৬৩.৫১ মাইক্রোগ্রাম।

গাজীপুরের পরেই রয়েছে পার্শ্ববর্তী জেলা ঢাকা (২য়) ও নারায়ণগঞ্জ (৩য়)। ঢাকার বায়ুতে বস্তুকণা ছিল ২৫২.৯৩ মাইক্রোগ্রাম। নারায়ণগঞ্জের বায়ুতে ছিল ২২২.৪৫ মাইক্রোগ্রাম।

উল্লেখিত সবচেয়ে দৃষ্টিত তিনটি শহরের বায়ুতে বস্তুকণার পরিমাণ বাংলাদেশের আদর্শমানের চেয়ে প্রায় ৪-৫ গুণ বেশি। বাংলাদেশে প্রতি বছর যতো মানুষের মৃত্যু হয় তার ২৮ শতাংশই মারা যায় পরিবেশ দূষণ জনিত অসুখবিসুখের কারণে। কিন্তু সারা বিশ্বে এধরনের মৃত্যুর গড় মাত্র ১৬ শতাংশ।

বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, নদীদূষণ, পরিবেশ দূষণ, আর্সেনিকদূষণ, পানি দূষণ ইত্যাদি। ক্রমান্বয়ে বাড়তে বাড়তে পেঁচাঁচাঁচে চরম পর্যায়ে।

পরিবেশদূষণের ক্ষেত্রে বায়ুর পরেই রয়েছে পানিদূষণ। পানিদূষণের ক্ষেত্রে রাজধানীর বুড়িগঙ্গা নদী অন্যতম উদাহরণ। যে নদীতে বর্জ্য সহ সব কিছুই নির্গমন করা হয়, ফল শ্রতিতে বুড়িগঙ্গার দুর্গন্ধে তার পাশে টিকা দায় হয়ে যায়। ঢাকা ওয়াসা বুড়িগঙ্গার দৃষ্টিপানিতে আর্সেনিক এর আশক্তা রয়েছে।

ইউএনইপির ‘ফ্রন্টিয়ার ২০২২: নয়েজ, ব্লেজেস অ্যান্ড মিসম্যাচেস’ শীর্ষক প্রতিবেদন মতে, শব্দদূষণে বিশ্বের শীর্ষ বাংলাদেশের ঢাকা ও চতুর্থ রাজশাহী! বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী, মানুষের জন্য ঘরের ভেতর শব্দের গ্রহণযোগ্য মাত্রা ৫৫ ডেসিবল, বাণিজ্যিক এলাকার জন্য ৭০ ডেসিবল। ঢাকায় এই মাত্রা ১১৯ ডেসিবল ও রাজশাহীতে ১০৩ ডেসিবল। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, সারা দেশে ২০ শতাংশ মানুষ বধিরতায় আক্রান্ত। এই ২০ শতাংশের মধ্যে ৩০ শতাংশই শিশু। যারা ট্রাফিক পুলিশ, রাস্তায় ডিউচি করেন, তাদের ১১ শতাংশের শ্বরণ সমস্যা আছে। আরেক রিপোর্টে দেখা যায়, ঢাকা শহরের ৬১ শতাংশ মানুষ শব্দদূষণের জন্য হতাশা ও উদ্বেগের মতো মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। শব্দদূষণের কারণে এখন ২০ শতাংশ মানুষ বধিরতায় আক্রান্ত। শব্দদূষণ পরিস্থিতি যদি অপরিবর্তিত ও অনিয়ন্ত্রিত থাকে, তাহলে তো দেশের ১০০ শতাংশ মানুষেরই বধির হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। শব্দদূষণ প্রতিরোধে শুধু সামাজিক সচেতনতা নয়, কঠোর আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

প্লাস্টিকের অতিমাত্রায় ব্যাবহার দেশের পরিবেশ দূষণের সহায়ক। উন্নত দেশ গুলো পুনঃব্যবহার উপযোগী প্লাস্টিক ব্যাবহার করা হয়, ফলে সেখানে দূষণের মাত্রা কমাক্ষেত্রে বাংলাদেশ এ এমন নয়। প্লাস্টিক পচে না বা গলে যায় না। ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়, মাটির উর্বরা শক্তি কমায়, খাল বা নদীর তলদেশে জমা হয়ে মারাত্মক ধরনের দূষণ সৃষ্টি করে। সভ্যতার অবদান প্লাস্টিক আমাদের দেশে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অপরিকল্পিত উন্নয়ন ও পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে দিন দিন বায়ুদূষণ বেড়েই চলছে।

পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ অপরিকল্পিত নগরায়ন, শিল্পকারখানার বর্জ্য যেখানে সেখানে নিষ্কাশন, যানবাহন থেকে নির্গত ধোয়া, অধিক পরিমাণ কীটনাশক এর ব্যাবহার, বনভূমি উজাড় করা, বৃক্ষরোপণ না করা, ওজন স্তরের ক্ষয়, পেট্রোল ডিজেল গাড়ির অতিরিক্ত ব্যাবহার, প্লাস্টিকের উৎপাদন ও নির্বিচারে ব্যাবহার করা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

প্রতিনিয়ত দূষণের ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে মানবদেহে রোগ সংক্রমণ। দূষণের ফলস্বরূপ ক্যাস্টার, শ্বাস যন্ত্রের বিভিন্ন রোগ (যেমন ব্রংকাইটিস, এলার্জি, হাপানি), চর্মরোগ সংক্রান্ত, কার্ডিওভাসকুলার, বাচাদের বিকাশে ব্যাধি ও স্নায়বিক ক্ষতি, শব্দ দূষণের ফলে বধিরতা, জেনেটিক পরিবর্তন সহ বিভিন্ন ধরনের জটিল ও কঠিন রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া ও পরিবেশ দূষণের ফলে অ্যাসিড বৃষ্টি, পোলার ক্যাপ গুলো গলে যাওয়া বাস্ততন্ত্রের ভারসাম্যহীনতা, গ্রিন হাউস গ্যাসের সৃষ্টি, প্লোবাল ওয়ার্মিং সহ বিভিন্ন ধরনের প্রাক্তিক দুর্ঘাগের শিকার হতে হচ্ছে।

অবৈধ ইটভাটা বন্ধ করে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বিকল্প ইট হিসেবে স্যান্ড ব্লকের প্রচলন বাড়াতে হবে;

ব্যক্তিগত গাড়ি এবং ফিটনেস বিহীন গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক তৎপরতা বৃদ্ধি। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বেশি পরিমাণ গাছ লাগানো এবং ছাদ বাগান করতে উৎসাহিত করা,

সিটি গভর্নেন্সের প্রচলনের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের সমন্বয় সাধন করতে হবে।

প্রস্তাবিত নির্মল বায়ু আইন-২০১৯ যতদ্রুত সন্তুষ্ট বাস্তবায়ন করা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও সচেতনতা তৈরির জন্য পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো, বায়ু দূষণের পূর্বাভাস দেওয়ার প্রচলন করা। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশ নীতি প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন করা। শিল্পবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। অধিক পরিমাণ বৃক্ষ রোপন করা। উচ্চ শব্দ যুক্ত হর্ন ব্যাবহার নিষিদ্ধ করা। কীটনাশক এর মাত্রা কমানো। সর্বোপরি প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তি সচেতনতা পরিবেশ দূষণ রোধে কার্যকর করা। এখন থেকে ব্যক্তি সচেতনতা সৃষ্টি ও যথাযথ প্রয়োগ না ঘটলেই অচিরেই মানব জীবন বিপন্ন হয়ে যাবে। তাই, প্রত্যেকের উচিত নিজ নিন অবস্থান থেকে দূষণ রোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশ তথ্যঃ  
পত্রিকাঃ শেয়ার বিজ।  
তারিখঃ ২৩ মে ২০২২।



# বগুড়ার ঐতিহ্যবাহী পোড়াদহ মেলা মাহমুদা টুম্পা

মেলা নামটি শুনলেই মনে এক ধরনের অভূতপূর্ব আনন্দের উচ্ছ্঵াস জেগে উঠে। আর পোড়াদহ মেলাটি সেই আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের আরো একধাপ যেন বাড়িয়ে দেয়। বগুড়া জেলায় বা আশেপাশের এমন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না, যারা পোড়াদহ মেলার নাম শুনে নি। প্রায় ৪০০ বছর ধরে পুরাতন ঐতিহ্য নিয়ে সঙ্গীরবে ঢিকে আছে উত্তরবঙ্গের রাজধানী খ্যাত বগুড়ার ‘পোড়াদহ মেলা’। লোকজ মেলাটি বগুড়া জেলা শহর হতে ১১ কিলোমিটার পূর্বদিকে ইছামতি নদীর তীরে গাবতলী উপজেলার মহিষাবান ইউনিয়নের পোড়াদহ নামক স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবছর মাঘ মাসের শেষ বুধবারে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে বগুড়ার ঐতিহ্যবাহী পোড়াদহ মেলা। এটিকে মাছের মেলাও বলা হয়ে থাকে। বিশাল আকৃতির বাঘাইড়, ঝই- কাতলা, মৃগেল, বিগেড, চিতল, সিলভার কার্পসহ নানা প্রজাতির মাছ উঠে এই মেলায়। যা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। আবার অনেকেই জামাই মেলাও বলে থাকেন। মূলত জামাইদের বরণ করে মেলা শুরু হয়। মেলা উপলক্ষে আশেপাশের গ্রামের যেসব মেয়েদের বিয়ে হয়েছে তারা জামাই নিয়ে বাপের বাড়িতে আসেন। মেলায় যেমন মাছের আকর্ষণ, তেমনি বাড়ি বাড়ি জামাই আকর্ষণ। কোন জামাই কত বড় মাছ কিনেছে, তা নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা। উৎসবে মাতোয়ারা সবাই। এলাকায় আনন্দের ধূম পড়ে যায়। ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সবাই উৎসবে মেতে ওঠেন।

মেলা উপলক্ষে প্রতিটি বাড়িতে আত্মীয় স্বজনরা এসে জড়ে হয়। চারিদিকে উৎসব মুখের অবস্থা বিবাজ করে। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে এ উৎসব চলতে থাকে। সেদিন দূরদূরাত্মের মানুষ মেলায় আসে। সূর্যোদয়ের পর থেকেই মেলামুখী সব সড়কে মানুষের ঢল বাড়তেই থাকে। শুধু বগুড়াই নয়, আশেপাশের জেলা থেকেও মেলায় আসেন শত শত মানুষ। তাজবুর ব্যাপার হলো- মেলা উপলক্ষে জামাইদের দাওয়াত দেওয়া বাধ্যতামূলক। দুদে দাওয়াত না করলেও জামাইরা মন খারাপ করে না; তবে মেলায় না ডাকলে তারা কষ্ট পায়। মেলার পরদিন বৃহস্পতিবার একই স্থানে এবং আশেপাশের গ্রামে গ্রামে চলে ছোট আকারের বউ মেলা। গ্রামের যেসব মহিলা কাজের চাপে অথবা সামাজিক রক্ষণশীলতার কারণে মূল মেলায় যেতে পারেন না তাদের জন্যই বিশেষ করে এই আয়োজন করা হয়। বউ মেলার একটি বিশেষত্ব হলো এখানে বিবাহিত এবং অবিবাহিত নারীরা প্রবেশ করতে এবং কেনাকাটা করতে পারেন। হৈ-হল্লোড়ে মাতে সবাই। গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আগে থেকেই মেলার খরচ করার জন্য তাদের পিতার নিকট থেকে টাকা পঃসা জমা করতে থাকেন। গ্রামের বউরা একই ধরনের কাজ করে থাকেন।

পোড়াদহ মেলা যেন একটা চলমান ছবি। ভিড়, চেঁচমেচি, হটগোল, ঠেলাঠেলি, হাসি-কান্না, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিশ্বায় বিমুক্ত দৃষ্টি, খুশির উচ্ছ্বাস, রঙ বেরঙের পোশাক আশাক। নাগরদোলা, বাঁশির আওয়াজ, রকমারি খেলনা, মণ্ড মিঠাইয়ের দোকান, জিলিপি খাওয়ার ধূম, পাপড় তেলে ভাজার প্রাণ, জামা-কাপড়, হাঁড়িকুড়ি নানা ধরনের পণ্য পসরা, এমনি একের পর এক আরো এক জীবন্ত চিত্র। মেলায় দূর-দূরাত্ম থেকে বিভিন্ন পণ্য সামগ্ৰী নিয়ে দোকানদাররা আসেন। মেলায় দোকানগুলো সজানো থাকে। মেলায় কোথাও খেলনা, কোথাও কাঠের জিনিসপত্র, কোথাও মাটির জিনিসপত্র, কোথাও ঘৃড়ি এবং কোথাও খাবারের দোকান বসে। এছাড়াও মেলার একপাশে নাগরদোলা, সার্কাস বসে। চলে বানরের নাচ, তার সঙ্গে চলে ছেলে মেয়েদের নাচানাচি।

মেলায় কাঠের, ষিল ও লোহার বিভিন্ন ডিজাইনের আসববাপত্র থাকে। যেগুলো অনেক সূলত মূল্যে পাওয়া যায়। চেয়ার টেবিল, খাট পালক থেকে শুরু করে এমন কিছু নাই যা পাওয়া যাবে না। শিশুদের জন্য রয়েছে শিশু খেলনা যেমনঃ বল, গুলতি, লাটিম, মাৰ্বেল। মেয়েদের প্রসাধন উপকরণের আকর্ষণ যথেষ্ট। চুরি, ফিতা, ক্লিপসহ বিভিন্ন রকমের প্রসাধনী থাকে। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে মুড়ি-মুড়কি, খাজা কদমা, চিনিবাতাসা, জিলেপি, নিমকি, রসগোল্লা নারকেলের নাড়ু ইত্যাদি নানা মুখরোচক খাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মেলার অন্যতম আকর্ষণ বড়ো বড়ো মিষ্টি। একেকটি মিষ্টি দেড় থেকে দুই কেজি ওজনের হয়ে থাকে। তাছাড়া ছুরি, দা, বটিসহ পাওয়া যায় গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

পোড়াদহ মেলার প্রধান আকর্ষণ মাছ। সবার চোখ থাকে মাছপ্তির দিকে। কেউ কেউ বড়ো বড়ো মাছ দেখার জন্যও মেলায় আসেন। হতবাক করে সেসব মাছ। মেলায় পাওয়া যায় বিভিন্ন প্রজাতির বড় মাছ। মেলায় সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় ‘বাঘাইড়’ মাছ। মেলায় দুই মণ থেকে আড়াই মণ ওজনের বাঘা আইড় পাওয়া যায়। যার মূল্য এক লক্ষ টাকারও বেশি হয়। এছাড়া পনের থেকে বিশ কেজি ওজনের ঝই, কাঞ্জলা, পাঞ্জস মাছ পাওয়া যায়। মেলা থেকে মেয়ে জামাইরা বড়ো বড়ো মাছ শুশ্রবাড়িতে কিনে নিয়ে যায়। সারাটি দিন মহোৎসবে কাটে।

পোড়াদহ মেলা নামকরণের ইতিহাস রয়েছে। সন্ধ্যাসী পূজা উপলক্ষে মেলাটি শুরু হয়েছিল তাই এর নাম প্রথম অবস্থায় ছিল সন্ধ্যাসী মেলা। মেলাটি পোড়াদহ নামক স্থানে সংগঠিত তাই এটি পোড়াদহ মেলা। ধারণা করা হয়, চারশত বছর পূর্বে কোন এক সময়ে মেলা সংগঠনের স্থানে একটি বটবৃক্ষ ছিল। একদিন হঠাত করে সেখানে এক সন্ধ্যাসীর আবির্ভাব হয়। তারপর সেখানে দলে দলে সন্ধ্যাসীরা

এসে একটি আশ্রম তৈরি করেন। এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে সেটি একটি পৃণ্য হানে পরিগত হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন সেখানে প্রতিবছর মাঘ মাসের শেষ দিনের কাছের বুধবার সন্ধ্যাসী পূজার আয়োজন করে। দূরদূরাত্ম থেকে ভক্তরা প্রতি বছর সেই দিনটিতে এসে সমাগত হতে থাকে। দিন গড়ানোর সাথে সাথে প্রতিবছর লোকসমাগম বাড়তে থাকে। আস্তে আস্তে পূজার দিনটিতে একটি গ্রাম্য মেলার গোড়াপত্তন হয়। এক সময় সন্ধ্যাসীরা স্থানটি ত্যাগ করে চলে গেলেও সন্ধ্যাসী পূজাটি অব্যাহত থাকে। ধীরে ধীরে মেলাটির পরিচিতি বাড়তে থাকে এবং দূরদূরাত্ম থেকে মেলা দেখতে লোকজন আসে। পূজা-পার্বণ মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসব হলেও মেলাটি ধর্মের গভি পেরিয়ে সব ধর্মের মানুষকে উৎসবে একত্র করে এবং অদ্যাবধি কাল পর্যন্ত এটি সকল ধর্মের হাজার হাজার মানুষের এক বিশাল জনসমাগম। এখনও সন্ধ্যাসী পূজাটি চালু রয়েছে।

গ্রামীণ ‘পোড়াদহ মেলা’ গ্রাম বাংলার চিরায়ত ঐতিহ্য। আবহাওয়া সংস্কৃতির অংশ। মেলায় দূর-দূরাত্ম থেকে লোকজন এসে পণ্য সাজিয়ে মেলাকে আকর্ষণীয় করে তোলে। মেলা শুধু বেচাকেনার স্থান নয়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা ক্রেতা-দর্শনার্থীদের মধ্যে আলাপ-পরিচয়, বন্ধুত্ব এমনকি আত্মায়তার সম্পর্ক গড়ে উঠে। একসঙ্গে গল্পগুজব, খাওয়া-দাওয়া, অনুষ্ঠান উপভোগ করার মধ্যাদিয়ে পারস্পরিক সৌহার্দ্য সম্প্রীতি ভাতৃত্ব বন্ধন দৃঢ় হয়। বাঙালি জীবনের সঙ্গে মেলার যোগ দীর্ঘকালের। এই সম্পর্ক নিবিড় ও আত্মিক। লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির অন্তরঙ্গ পরিচয় মেলাতেই সার্থকভাবে ফুটে উঠে। মেলায় গ্রাম বাংলার অপৰূপ সৌন্দর্য মানুষের মনকে আনন্দ-ফুর্তিতে মেতে উঠতে সাহায্য করে।

পোড়াদহ মেলা বঙ্গভাসীর সংস্কৃতির এক বিশেষ ধর্মনী। এই ধর্মনীর মধ্যেই বেঁচে আছে জীবনের স্পন্দন। এরই মধ্যে বাঙালি খুঁজে পেয়েছে নিজেকে। পোড়াদহ মেলা নিছক আনন্দ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নয়। এর সঙ্গে যুক্ত আছে মানুষের দীর্ঘকালের ধর্ম সাধনা, আছে গ্রামীণ জীবন-লীলার নানা তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত। এরই মধ্যে আছে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তার আশ্বাস, আছে জীবনের অফুরান প্রাণ শক্তির প্রকাশ। পোড়াদহ মেলা যেন এসব মানুষের বেঁচে থাকার প্রতিশ্রুতি, তাদের অস্তিত্ব, তাদের দর্পণ। তাই তো দীর্ঘ চারশ বছরের পুরাতন ঐতিহ্যের মেলাটি একটি বারের জন্যও বন্ধ হয় নি।

লেখকঃ

সদস্য; বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।



## “বেদে পল্লীংজীবনধারা ও প্রান্তিকতা” সুরাইয়া

প্রচলিত কথায়,মানুষ সমাজবন্ধ জীব।সমাজে সকল মানুষ একসাথে মিলেমিশে বসবাস করে। অর্থাৎ,প্রচলিত রীতি অনুযায়ী, সমাজবন্ধ জীব হিসেবে একসাথে বসবাস করায় আমরা একে অন্যের সুখ- দুঃখের ভাগীদার। কিন্তু সভ্যতার উৎকর্ষে আমাদের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর জীবনে হাওয়া বদল ঘটলেও,সংখ্যালঘু বেদে বা বাইদ্য জনগোষ্ঠী সভ্যতার সকল সুবিধা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে না। সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর উন্নত জীবনমানের সাথে বেদে জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতিচর্চা, রীতি-নীতি,জীবনধারা ভিন্ন হওয়ায় তাদেরকে সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদের থেকে আলাদা মনে করে।ফলস্বরূপ,তারা শারীরিকভাবে মনুষ্য জাতি হিসেবে বিবেচিত হলেও একই তাদের বসবাসের স্থান হয় সমাজের উন্নত জীবনধারার মানুষের চেয়ে আলাদা অর্থাৎ,মনুষ্য সমাজের আদলে গড়ে ওঠা সমাজে অন্য বেদে নামক আরেকটি জনগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থা। তাই আমরা উন্নত জীবনধারার মানুষেরা তাদের বসতিস্থলের নামকরণ দিলাম ‘বেদে পল্লী’। বলা যায়,তারা মানুষ নামক প্রাণী হয়ে একই সমাজে থেকেও আলাদা নামে আলাদা জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত।আলাদা নামে পরিচিত পাওয়ায় তারা আর উন্নত জীবনধারার মানুষের মধ্যে পড়ে না। এককথায়,বেদেদের বলা যায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী।

বেদে বা বাইদ্য রা বাংলাদেশ ও ভারতের যায়াবর জনগোষ্ঠী। তারা সাপ খেলা দেখায় বলে সাপুড়ে নামেও পরিচিত।বাংলাদেশ ও ভারত ছাড়াও বাইরের দেশ সিঙ্গাপুরেও সাপুড়েদের সন্ধান পাওয়া যায়।তারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান,পর্যটন কেন্দ্র,লোকসমাগম স্থানে ১৯৬০-১৯৭০ দশকের দিকে সাপের খেলা দেখাতো। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে,আগে তারা ঢাকার সাভারের বংশী নদীর তীর,বরিশাল, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বিনাইদহ, ছাতকসহ দেশের অনেকে জেলাতে নদীর ঘাটে সারি বাঁধা নৌকায় অথবা পতিত জায়গায় অঙ্গুয়াভাবে তারু টাঙিয়ে বসবাস করতো। বেদে বা বেদেনীর ঘর-সংসার,রান্না-বান্ধা সকলকিছু এই নৌকার মধ্যেই সীমাবন্ধ ছিল। তাদের এই বৈচিত্র্য জীবনধারা নিয়ে একসময় রচিত হয়েছিল “মোরো এক ঘাটেতে রাঁধি বাড়ি, আরেক ঘাটেতে খাই” এর মতো কালজয়ী গান,রচিত হয়েছিল ‘বেদের মেয়ে জোছনা’, ‘লখিন্দর’এর মতো বেশিকিছু জনপ্রিয় চলচিত্র। গ্রামাঞ্চলে ঘুরে সাপের খেলা দেখানো, সাপ নাচানো, বীণের সুরে সাপের খেলা দেখানো, সিঙ্গা লাগানো, তাবিজ বিক্রি এবং দাঁতের পোকা ও বিষ-ব্যথা সিংগা দিয়ে নামানো ছিলো বেদে জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহের প্রধান মাধ্যম।

বেদে-বেদেনীরা কাঠের বাক্সে, চট্টের ব্যাগে, বাঁশের ঝুড়িতে ও মাটির পাত্রে নানা ধরনের সাপ রাখতো। বেশির ভাগ সাপুড়েই সাপ ধরে না, পেশাদার সাপ সংগ্রাহকদের কাছ থেকে সাপ কিনে নিতো। তবে সাধারণভাবে প্রায় সব সাপুড়েই নিজেদের সংগ্রহে বেশ কিছু সাপ জমা রাখতো। সেসময় গ্রামাঞ্চলের মেলা গুলোতে বেদেদের সাপের খেলা দেখার জন্য লোকজনের হিড়িক পড়ে যেতো। এছাড়াও সাংগৃহিক বাজারে খোলা জায়গায় লোকসমাগমে বাঁশিসহ অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গান গেয়ে সাপের খেলা দেখিয়ে টাকা উপার্জন করতো বেদেরা। বেদে সমাজ যায়াবর হওয়ায় তাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষাবঞ্চিত হয়েছে। ফলে জীবিকা হিসেবে তারা বেছে নিতো পূর্বপুরুষের “সাপুড়ে “পেশা। এটি ঐতিহ্যগতভাবে পারিবারিক পেশা, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে হস্তান্তরিত হয়। তাদের এই পেশায় মেয়ে বেদেনীরাই বেশি সম্পৃক্ত ছিল। কোনো কোনো বেদে পরিবারে মেয়ে বেদেনীরাই সাপুড়ে পেশায় নিয়োজিত।

তবে,এই চিরচেনা দৃশ্যগুলো এখন আর তেমন চোখে পড়ে না। কেননা আধুনিকতার ছোঁয়ায় বেদেদের জীবনধারায় এসেছে পরিবর্তন। কেউ কেউ বৃংশপরম্পরায়” সাপুড়ে”পেশার ঐতিহ্য ধরে রাখলেও,বেশিরভাগই ছেড়েছেন সাপুড়ে পেশা। আগের মতো তাদের জীবিকানির্বাহের মাধ্যমগুলোর চাহিদা না থাকায় জীবনের তাগিদে নিজেদের জাত পেশা থেকে সরে এসে অনেকেই বিকল্প পেশা বেঁচে নিয়েছেন।কিন্তু আগে মেয়েরা পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী হলেও বর্তমানে ছেলেরাও পরিবারে অর্থনৈতিকভাবে ভূমিকা রাখছে। মূলত আধুনিক জীবনধারার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর গ্রহণকৃত পেশায় নিজেদের নিয়োজিত করছেন যেমনঃব্যবসা-বাণিজ্য,গার্মেন্টস,হস্তশিল্প,চুরি-ফিতা বিক্রি প্রভৃতি। এসকল কাজের মাধ্যমে তারা সাবলম্বী হচ্ছেন। কিন্তু সাভারের পল্লীবিদ্যুৎ এর বিভিন্ন এলাকায় এখনো বেদেদের খোলা ও বিষ-ব্যথা তাড়ানোর সিংগা,তাবিজ নিয়ে বাসায় বাসায় ঘুরতে দেখা যায়।

সরকারি ভাবে সাপ বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়ায় একসময় খারাপ সময় অতিক্রম করতে হয়েছিল বেদেদের। ফলে অনেক বেদে মাদক-ব্যবসায় সম্পৃক্ত হয়ে যায়। বর্তমানেও দেশের কোনো কোনো জেলায় বেদেদের মাদক-ব্যবসায় সম্পৃক্ত থাকার কথা শোনা যায়। তবে গোপনে মাদকপাচার আমাদের দেশীয় শ্রেক্ষণটে চিরচেনারূপ। তাই যেসকল বেদেরা বেকার হয়ে মাদক-ব্যবসার মতো অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে, তাদের সাধারণ জীবনধারায় ফেরাতে আইনী ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগীতা ও বেদেপল্লী মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তাকারী সংগঠনগুলোর কার্যক্রমের তৎপরতা বাড়ানো প্রয়োজন।

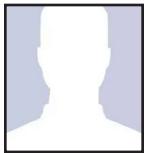
তবে, আশুনিকতার আশীর্বাদে বেদেপল্লীর ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি আগে অপ্রাপ্ত বয়সী মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার রীতি থাকলেও তার প্রবণতা বর্তমানে কম। কিন্তু শিক্ষার আগ্রহ থাকলেও দারিদ্র্যতার ছোবলে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অনেকে। দারিদ্র্যতার সাথে সঙ্গী হয়েছে তাদের থেকে উন্নত জীবনধারার কিছু মানুষের বেদে পল্লীর মানুষের সাথে তাদের প্রাচীন পেশা নিয়ে ব্যঙ্গ করা, তাদের সাথে মিশতে না চাওয়া, একসাথে খেতে না চাওয়া, তাদের দিকে নানান ভঙ্গিতে তাকানোসহ নানা ভাবে উত্ত্বক্ত করা। তাই, বলা যায়, সভ্যতা আমাদের প্রযুক্তিসহ আরও নানাভাবে সভ্য করলেও নৈতিকতা মূল্যবোধ, সহর্মিতাসম্পন্ন সভ্যমানুষ হওয়ার এখনো প্রয়োজন রয়েছে।

বেদেরা পেশা পরিবর্তন কিংবা, পাকা, আধা পাকা-স্থায়ী আবাসস্থল গড়ে তুললেও বেদেপল্লীগুলোতে বিবাহ-রীতিগুলোর কিছুক্ষেত্রে এখনো প্রাচীন ঐতিহ্য ধরে রেখেছে তারা। গতবছর, মাইটিভির “বেদে পল্লী” নিয়ে ইউটিউব সম্প্রচার মাধ্যমের একটি পরিবেশনায় দেখা যায়, এখনো সাভারের বেদে পল্লীতে তাদের প্রচলিত নিয়মেই সর্দাররাই বর-কনের বিবাহ দেন ও সর্দারের কাছেই বিবাহ-বিছেদ হয়ে থাকে। অর্থাৎ, বলা যায় তাদের পরিবারগুলোর মধ্যে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক ও পল্লীতে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এখনও সর্দারের ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া তাদের পল্লীর মধ্যে সাধারণ ঘরে বিয়ে হওয়ার সংখ্যা খুবই কম বিবাহ রীতি অনুযায়ী, বর- বা কনে অন্য বেদে পল্লী থেকেও নির্বাচন করা যায়।

সভ্যতার ছোঁয়ায় বেদে পল্লীতে পরিবর্তন আসলেও তাদের বেশিরভাগই মৌলিক অনেক চাহিদা বয়স্ক ভাতাসহ নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সর্বোপরি, বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সরকারী বেসরকারী সহায়তা আবশ্যক। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায়, উন্নত জীবনচর্চাকারী মানুষের মতো বেশিরভাগ বেদের শিক্ষাদীক্ষা, স্থায়ী আবাসস্থল থাকলেও এখনো মানুষ তাদের ঘৃণার চোখে দেখে। বস্তুত, সমাজসেবা সংগঠন কিংবা সরকারি সহায়তা সকল কিছুর সমন্বয় করে তাদের উন্নত জীবনধারায় ফিরিয়ে নিয়ে আসলেও, সমাজে তাদের মানুষ হিসেবে যোগ্য সম্মান তখনই দিতে সক্ষম হবো যখন আমরা মনুষ্যজাতি হিসেবে আমাদের মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করবো।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়,

প্রকাশ তথ্যঃ  
পত্রিকাঃ অধিকার।  
তারিখঃ ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০২২।



# তরুণরা জেগে উঠবে জয় বাংলা স্নোগানে ইমরান হ্যাইন

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালির স্বপ্নদষ্টা, বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন আজ। যিনি ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। যার জন্মের মাধ্যমেই বাঙালি পেয়েছিল স্বাধীনতা। পেয়েছিল স্বাধীন দেশ, বাংলাদেশ। আজ থেকে শত বছর পূর্বে যদি বাংলার বুকে শেখ মুজিবের জন্ম না হতো তাহলে হয়তো পরাধীনতার অন্ধকারেই থেকে যেতে হতো আমাদের। হইতো শোষণের কারাগারে থাকতে হতো আরো দুইশত বছর। শেখ মুজিবের এমন অবিশ্বাস্য নেতৃত্ব ক্ষমতা, এমন দূরদর্শিতার খণ্ড এই বাংলার মানুষ কখনও শোধ করতে পারবে না।

ইতিহাস সত্যের কথা বলে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কয়েকজনকে পাওয়া বি঱ল যারা তাদের সারাজীবনের কর্মকাণ্ডের দ্বারা দীর্ঘস্থায়ী আসন বেছে নিয়েছে জনসাধারণের মনে। যার দীপ্তায় উজ্জীবিত হয়ে তরুণরা আজও তাদের স্বপ্নগুলোকে লালন করছে। বর্তমান প্রজন্ম বঙবন্ধুকে দেখেনি কিন্তু বঙবন্ধুকে না দেখেই তাকে ভালোবাসে, বঙবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে। এমন ক্ষণজন্মা পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে যাদের কৃতিত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সে দেশের মানুষের সৌভাগ্যের দ্বারা উন্মোচন করে দেয়। তারা পরাধীন দেশবাসীর জীবনে মুক্তি এনে দেন, দুর্বোগের ঘনঘটা দ্রু করে তাদের হাতে স্বাধীনতার সূর্য পতাকা উপহার দেন। আমাদের দেশের একপ একজন সংগ্রামী পুরুষের কথা আমাদের চেতনায় মিশে আছে, মিশে আছে আমাদের রক্ত কণিকায়। তার অবদান মিশে আছে বাংলার মাটির প্রতিটা কণায় কণায়।

তরুণদের সঙ্গে বঙবন্ধুর ছিল অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। বঙবন্ধুর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, তার বাণিজ্য, মানুষের প্রতি নিঃস্বার্থহীন ভালোবাসা, সহজেই মানুষের সঙ্গে মেশা, সাহসিকতা প্রভৃতি গুণাবলি তার দিকে তরুণদের আকৃষ্ট করতে বাধ্য করে। ৭ মার্চের ভাষণ, তার অঙ্গুলি হেলানো বজ্রকর্তৃ, শব্দ চয়ন ভীষণ শিখরিত করে তরুণদের। তাই তো তরুণ প্রজন্ম ধারণ করতে চায় বঙবন্ধুকে। বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠায় বঙবন্ধু আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি ছিলেন আপোসাহীন ও সত্যের প্রতি অবিচল। বাল্যকাল থেকেই তিনি কোন অন্যায়ের সাথে আপোস করেননি। শিশুকাল থেকে তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রতিবাদী। মানবতাবাদী এ মহান নেতা ফাঁসির মধ্যে দাঁড়িয়েও আদর্শের সঙ্গে আপোস করেননি। তিনি বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে একটি আত্মর্যাদাশীল উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

বঙবন্ধু নিজেও বিশ্বাস করতেন তরুণরাই দেশের মূল চালিকাশক্তি। তিনি তরুণদের সংগ্রামের বাণী শিখাতেন, রাজনীতি ও সাহিত্যের প্রতি উন্মুক্ত করতেন, অন্যায়ের কাছে আপসাহীন হতে শিখিয়েছেন, শিক্ষা ও শিক্ষার আদর্শগুলো জীবনে ধারণ করতে বলেছেন। অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও কারাগারের রোজনামচায় বঙবন্ধু তারণ্যের প্রতি বিশ্বাস এবং তার নিজের তরুণ জীবনের সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আতিউর রহমানের নেতৃত্বে ‘তারণ্যের চোখে বঙবন্ধু কেমন’ সে বিষয়ে একটি জরিপ করা হয়। যাদের বয়স ১৫-৩০ এবং এদের মধ্যে ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ৭৯ শতাংশ বলেছেন, তারা মনে করেন ৭ মার্চ বঙবন্ধুর বলিষ্ঠ ও দ্যথাহীন বক্তব্য পুরো জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে উন্মুক্ত করেছিল এবং স্বদেশ স্বাধীন হয়েছিল। ৮১ শতাংশ মনে করেন বঙবন্ধুর নিঃস্বার্থ নেতৃত্বের কারণেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। বঙবন্ধুর সাম্যবাদী ভাবনা, উদার রাজনৈতিক দৃষ্টি, শোষণহীন সমাজ গড়ার চেতনা তরুণ সমাজকে প্রলুক্ত করে। তার মানবিকতা এবং সাধারণ মানুষের প্রতি সহমর্মিতার কারণেই তিনি হতে পেরেছেন বাংলার তরুণদের স্বপ্ন সন্তোষ।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই যুদ্ধবিহীন দেশকে তেলে সাজাতে চেয়েছিলেন বঙবন্ধু। বিশেষ করে তরুণদের প্রতি তার দৃষ্টি ছিল কোমল। কারণ তিনি জানতেন, কেবল তরুণরাই তাদের সৃষ্টিশীল মেধা ও অল্প পুঁজি খাটিয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে সক্ষম। অর্থাৎ বর্তমানে আমরা তরুণ হয়ে খুব সহজেই বিভাস্ত হয়ে যাই। মাঝে মাঝে ভুল পথে হেঁটে চলি, ভুলে যাই আমাদের অতীতকে। কিন্তু

আমাদের বঙ্গবন্ধু প্রতিটা ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

প্রতিটা ক্ষেত্রে তিনি অসীম সাহসিকতার সাথে পথ চলেছেন। দুর্গম পথে আত্মবিশ্বাস নিয়ে একাই পাড়ি দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমান তরংণদের মাঝে একধরনের বিচলিত ভাব লক্ষ্য করা যায়। অল্পতেই হতাশ ও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। তাই নিজেদেরকে উজ্জীবিত করতে বঙ্গবন্ধুকে জানা খুব প্রয়োজন। বিশেষ করে তরংণসমাজকে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা ও চেতনার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে এগিয়ে যেতে হবে। ২০১৪ সালে বিবিসির একটি জরিপে বঙ্গবন্ধু ‘সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি’ হিসেবে সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত হন। তাই তো অন্নদা শক্তার রায় বলেছেন, ‘যতকাল রবে পদ্মা, মেঘনা, গৌরী বহমান, ততকাল রবে শেখ মুজিব তোমার অবদান।’

তরংণদের চিন্তা ও মননে বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় অবস্থান তৈরির জন্য দরকার বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান। বঙ্গবন্ধুকে আরো বেশি জানতে হবে, বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে, তার জীবনী সম্পর্কে আরো বেশি পড়াশোনা করতে হবে। জানতে হবে সেই মহান মানুষকে। সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে। তাহলেই তৈরি হবে ঘরে ঘরে শেখ মুজিব। তরংণরাই পারে বঙ্গবন্ধুর স্মপ্ত বুকে লালন করে সোনার বাংলা গড়তে যেখানে মা হাসবে আর শিশুরা খেলবে। বাংলা ও বাঙালির হৃদয়ে অনন্তকাল লালিত হোক চিরঞ্জীব মুজিবের আদর্শ। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও তার নির্দেশনায় উজ্জীবিত হোক তরংণরা। তারংণের শক্তি হোক বঙ্গবন্ধু। তারংণের শক্তি হোক জয় বাংলা।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়  
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ তরংণ কলাম লেখক ফোরাম জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

প্রকাশ তথ্যঃ  
পত্রিকাঃ আমার সংবাদ।  
তারিখঃ ১৭ মার্চ ২০২২।



## “করোনায় বাড়ছে বাল্যবিবাহ” শ্যামলী তানজিন অনু

বিবাহ একটি সামাজিক প্রথা। দুজন মানুষ আমৃত্যু একসাথে থাকার জন্য একটি বন্ধনে আবদ্ধ হয় বিবাহের মাধ্যমে। বাংলাদেশে বিয়ের জন্য মেয়েদের নির্ধারিত বয়স ১৮ এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ বছর। কিন্তু আমরা সচরাচর এ নিয়মের বাইরে চলে যায়। কেউ বা নির্ধারিত বয়সের পর বিয়ে করে আবার কাওকে নির্ধারিত বয়সের আগেই জোর জরুরদণ্ডি অথবা তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী বিয়ে দেওয়া হয়। নির্ধারিত বয়সের আগে বিয়ে দেওয়া বা করাকে বাল্যবিবাহ বিবাহ বলে। আবার বলা যায়, বাল্যবিবাহ হলো অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক বিবাহ।

বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক অপরাধ। বাল্যবিবাহ ছেলেমেয়ে উভয়ের উপরেই প্রভাব ফেলে। তবে মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি। এগুলো ঘটে আর্থসামাজিক দুরাবস্থার জন্য।

করোনা মহামারি এসে প্রায় সকল মানুষের জনজীবনে দুর্ভোগ নেমে এসেছে। বিশেষ করে যৌথ পরিবার ও একাধিক সদস্য বিশিষ্ট পরিবারে কালো অধ্যায়ের সূচনা অনেক আগেই হয়েছে। দরিদ্র পরিবারের অভিভাবক মনে করেন মেয়ের বিয়ে দিলেই যেনো মুক্তি মিলবে। বিয়ে মানেই যেনো হাফ ছেড়ে বাঁচা। কিন্তু একবারও সন্তানের ভবিষ্যত, স্বপ্নের কথা ভাবে না। বিয়ে সকল সমাধান নয়, বরং অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে দিলে নানান সমস্যায় পড়তে হয়।

একটা ছোট গল্প বলি, আমার সচক্ষে দেখা বাল্যবিবাহের ঘটনা। এই তো মাস খানিক আগের কথা। মেয়ের বয়স ১৪-১৫ হবে হয়তো। মাত্র বয়ঃসন্ধিতে পা রেখেছে। স্কুল বন্ধ। নেই পড়াশোনা। মেয়ে বড় হয়ে গেছে তাঁদের ধারণা। বিয়ে দিতে হবে শীঘ্ৰই। ছেলেপক্ষ দেখতে এসে মেয়ে পছন্দ হয়েছে। মেয়ের বাবা মা মহা খুশি। বিয়ের দিন তারিখ ও ঠিক হলো। এগুলো আমি শুনেছি মাত্র। শুনে হতবাক!! এতোটুকু মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে কেন!! একদিন টিউশনি থেকে ফেরার পথে মেয়ের মায়ের সাথে দেখা হলো। আমি দেখা মাত্রই জিগ্যেস করলাম “আপনার মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছেন শুনলাম, এতোটুকু মেয়েকে কেন বিয়ে দিচ্ছেন? বিয়ে সম্পর্কে ওর জ্ঞান কতোটুকু?” মেয়ের মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিলেন” বিয়ে না দিয়ে কী করবো বলো! ওর বাবা রাস্তায় কাজ করে, সেই কাজ কয়দিন পরপর লকডাউনে বন্ধ হয়ে যায়, স্কুল কবে খুলবে কে জানে, বিয়ে না দিয়ে কী করবো, আরও দুটো ছেলে মেয়ে আছে আমার, তাদের কথা ও তো ভাবতে হবে!” সত্যি বলতে এর পর আমার আর কিছু বলার ছিলো না। শুধু মনে হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা থাকলে এটা হতো না।

করোনা বাড়ছে, সাথে বাড়ছে সামাজিক ব্যবধি বাল্যবিবাহ। যার পরিবারে ৫ জন সন্তান তারা আগে পাছে কিছু না ভেবেই বিয়ে দিচ্ছেন। লঙ্ঘনে সেভ দ্য চিলড্রেনের লিঙ্গসমতা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ গারিয়েলে সাজাবো বলেন, দুঃখজনক বিষয় যে, মহামারি লিঙ্গ বৈষম্যকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে করোনায় স্কুল বন্ধ, মা-বাবারা চাকরি হারাচ্ছেন, লকডাউনে বাড়ছে সহিংসতা আর ধৰ্ষণা। এসব কারণে কন্যার নিরাপত্তার কথা ভেবে মা-বাবারা তাদের ন্যাবালক মেয়েদের জোর করে বিয়ে দিচ্ছেন। বিয়ে হলে মেয়ে অন্তত ক্ষুধা আর বধ্নি থেকে রক্ষা পাবে বলে তাদের ধারণা। আর এই ঘটনা গুলো বাড়ছে করোনাকালীন সময়ে। দারিদ্র্যতার চরম মাত্রা অভিভাবক কে বাধ্য করছে ছেলে মেয়ে বিয়ে দিতে।

আজ এই একুশ শতকে এসেও দেশের ৬৬% মেয়ে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত তার একটাই কারণ হলো বাল্যবিবাহ। গত ২৫ বছরের তুলনায় করোনাকালীন সময়ে বাল্যবিবাহের হার সবচেয়ে বেশি। ২০২৫ সালে পর্যন্ত বাল্যবিবাহের শিকার হতে পারে আরও ২৫ লক্ষ মেয়ে। (সুত্র: সেভ দ্য চিলড্রেন ফ্লোবাল গার্ল ছড) তাছাড়া আগের তুলনায় এ বছর আরও ১০ লাখ কিশোরীর গর্ভবতী হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। অপরিণত বয়সে বাচ্চা ধারণ মানে জীবন ঝুঁকিতে রাখা। কোভিড -১৯ এর কারণে অতিরিক্ত ১ কোটি মেয়ে বাল্যবিবাহের ঝুঁকিতে রয়েছে(সুত্র: ইউনিসেফ)। গত দশকে প্রায় ২.৫ কোটি বাল্যবিবাহ প্রতিহত করা হলেও ইউনিসেফ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সতর্ক করে বলেছে, এই অর্জন এখন গুরুতর।

বাংলাদেশে করোনাকালীন সময়ে বাল্যবিবাহ ভয়াবহ রূপ নিয়ে যেনো করোনার সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। গ্রামাঞ্চলে বাল্যবিবাহের প্রভাব বেশি। কিছু পরিবার মেয়েকে স্কুলে পাঠ্য নামমাত্র। এর বড় কারণ হলো পাত্রপক্ষ বিয়ের জন্য দেখতে আসলে যেনো বলতে পারে তাদের মেয়ে স্কুলে যায়। মূল কারণ একটু আয় উপর্জনক্ষম ছেলের সাথে যেনো মেয়ের বিয়ে দিতে পারে।

এক্ষেত্রে ছেলের বয়সকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না।

প্রত্যেকের অনেক স্বপ্ন থাকে, ভবিষ্যত নিয়ে পরিকল্পনা থাকে। বাল্যবিবাহের ফলে সবটায় শুরু আগেই থেমে যায়। ধামাচাপা পড়ে অনেক প্রতিভা, অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী। সুন্দর একটা প্রজন্ম এবং উজ্জ্বল কিছু ভবিষ্যত প্রজন্ম হারিয়ে ফেলি আমরা যা দেশ ও জাতির জন্য অনেক দামী সম্পদ হতে পারতো। মহামারি তে সব কিছু হ্রাসের হওয়ায় বাবা মায়ের কথা মেনে নিয়ে বসতে হচ্ছে বিয়ের পিড়িতে। ভুলে যেতে হচ্ছে তিলে তিলে তৈরি হওয়া সুন্দর স্বপ্ন গুলো। বলা যায় গলা টিপে স্বপ্ন হত্যা করা।

বাল্যবিবাহের ফলে ভিট্টিমের শারীরিক ক্ষতির পাশাপাশি মানসিক ক্ষতি ও হয়ে থাকে। ভিট্টিম সংসারের জটিলতায় নিজের চঞ্চলতা, তারুণ্যকে হারায়, ডুবে যায় হতাশার সাগরে। ফলস্বরূপ বেড়ে যায় আত্মহত্যা। এ যেনো ফুল হওয়ার আগেই কড়ি থেকে ঝরে যাওয়া। বয়স অল্পের কারণে বাচ্চার ভালোমন্দ বোঝার জ্ঞান থাকে না মায়ের। ফলে বাচ্চার লালন পালনে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। বাচ্চার বেড়ে ওঠা, ভবিষ্যত পরিকল্পনা, পড়াশোনাতে অনেক প্রভাব পরে, কোনোটায় সঠিকভাবে হয় না। ফলে পরবর্তী প্রজন্ম প্রাথমিকভাবে সঠিক দিকনির্দেশনা পায় না। নেপোলিয়ান এজন্যই হয়তো বলেছিলেন,”আমাকে তোমরা একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটা শিক্ষিত জাতি উপহার দেবো”।

বাল্যবিবাহ কতোটা ক্ষতিকর আর ভয়ানক তা দরিদ্র ও অসচেতন অভিভাবক বোঝে না। দরিদ্রতা যে তাঁদের আরও অঙ্গ করে দিয়েছে। পেটে খাবার না থাকলে সচেতনতা তৈরি হবে কী করে। বিয়ের পর যে সমস্যা গুলো হয় সেগুলো সহ্য করার জন্যও ন্যূনতম বয়স, জ্ঞান দরকার হয়। অল্প বয়সে বিয়ের ফলে শরীরের ম্যাচুরিরিটি আসে না। শারীরিক সম্পর্কের ফলে বিভিন্ন ক্ষতি হতে পারে, অল্প বয়সে বাচ্চা ধারণ এবং প্রসবের ফলে বাচ্চার বিভিন্নরকম সমস্যা দেখা দিতে পারে, মায়ের বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। অনেক সময় সুস্থ বাচ্চা জন্ম দিতে অক্ষম হয়ে, ফলে যে কোনো একজনের(মা অথবা সন্তান) মৃত্যু হয়। বেড়ে যায় মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার।

দেশে বাল্যবিবাহ সম্পৃক্ত আইন থাকলেও এখন আর তার নজির চোখে পড়ে না। মানুষের ভয় ভীতি করে গেছে আগের তুলনায়। খুব সহজেই বাল্যবিবাহের মতো অপরাধ করে ফেলে। ‘বাল্যবিবাহ নিরধক আইন ব্রিটিশ ভারত ২৪ শে সেপ্টেম্বর তারিখে ১৯২৯ সালে পাস করা হয়। এই আইনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হার্বিলাস সারদা। উত্থাপনের ছয় মাস পরে এটি ১ এপ্রিল ১৯৩০ সালে কার্যকর হয় এবং এটি শুধু হিন্দুদের নয়, সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের জন্য প্রযোজ্য’।

এই ব্যাধি নিরাময় করতে সচেতনতা জরুরি। তাছাড়া বাল্যবিবাহের মতো মহামারি উপড়ে ফেলা প্রায় অসম্ভব। পরিবারের মানুষকে বুঝতে হবে বাল্যবিবাহ দেওয়া মানে সন্তানকে মৃত্যুর দিকে এক ধাপ এগিয়ে দেওয়া। সন্তানদের স্বপ্ন গুলো মেরে ফেলা মানে মানুষটাকে হত্যা করা। বাল্যবিবাহ একটি মেয়েকে সুরক্ষা দেয় না বরং তার শৈশব ও জীবনের সুন্দর স্বপ্ন গুলো ধ্বংস করে।

--বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য দারিদ্র্য, কুসংস্কার, নিরাপত্তাহীনতা, যে□□□□□ন হয়রানি, বখাটেদের উৎপাত ইত্যাদি বন্ধ করতে হবে।

--আমাদের স্কুলগুলোয়, সভা-সমাবেশে অভিভাবকদের সবাইকে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে জানাতে হবে।

--১৮ বছরের আগে বিয়ে বাতিল করতে গেলে যেসব সমস্যা হবে, আইনে তা সমাধানের সঠিক নির্দেশনা থাকতে হবে।

বাল্যবিবাহ কে “না” বলুন, সুন্দর জীবন গড়তে সহায়তা করুন।

লেখকঃ

অর্থ সম্পাদক; বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

প্রকাশ তথ্যঃ

পত্রিকাঃ মানবকর্তৃ।

তারিখঃ ১৮ জুলাই ২০২১।



# শিক্ষার্থীদের ঝড়ে পড়া রোধে ব্যবস্থা নিন

## সানজিদা জাহান লোপা

করোনা মহামারিতে অভিভাবকদের আয় কমে যাওয়া কর্মসূল হয়ে শহর ছেড়ে গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য হওয়া এবং দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকাসহ নানা সংকটে

গত দেড় বছরে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী বাবে পড়ছে। বিশেষ করে এ মহাদুর্যোগে দরিদ্র থেকে অভিদরিদের কাতারে এসে দাঁড়ানো বিপুল সংখ্যক পরিবার তাদের সন্তানদের লেখাপড়া থেকে সরিয়ে নিয়ে ছেটখাটে বিভিন্ন কাজে লাগিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। নিন্মবিত্ত পরিবারের অনেক শিশু বই -খাতা ছেড়ে নতুন করে বুকিপূর্ণ কর্মক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে। মেয়ে শিক্ষার্থীদের অনেকেরই বাল্যবিমে হয়ে গেছে। উদ্দেগজনক হারে শিক্ষার্থীদের এই বাবে পড়া ঠেকাতে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এমনকি প্রস্তাবিত বাজেটেও এ খাতে সুনির্দিষ্ট কোনো বরাদ্দ নেই। ফলে নিন্মবিত্ত ও মধ্যবৃত্ত শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় বড় ধরনের ধস নেমেছে। উচ্চবৃত্তের সঙ্গে নিন্মবিত্ত ও মধ্যবৃত্তের পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার যে বৈষম্য বাড়ছে তা আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। যা শিক্ষার হারের ওপর বড় নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলবে। বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের ওপরে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশী। দেশের প্রান্তিক এলাকার প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার নিয়ে সংসয় দেখা দিয়েছে।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেটরি রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) ও ব্রাক ইন্সটিউট অফ গর্ভেন্স অ্যান্ড ডেভেলোপমেন্টের (বিআইজিডি) মৌখ গবেষণায় দেখা গেছে প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯ শতাংশ ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ২৫ শতাংশ শিক্ষার্থী পড়াশোনার বাইরে চলে গেছে। ২০২০ সালের এপ্রিল ২০২১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এ জরিপ পরিচালিত হয়। আগের বছর এর হার ছিল প্রাথমিকে ১৪ শতাংশ ও মাধ্যমিকে ২১ শতাংশ। গত ১২ সেপ্টেম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার দিন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি আশানুরূপ ছিল না। তবে ধারণা করা হয়েছিল যে ধীরে ধীরে উপস্থিতি বাড়বে। কিন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদণ্ডের দেওয়া তথ্য খুবই হতাশজনক। তথ্য অনুযায়ী ১২ সেপ্টেম্বর শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার ছিল ৬৭ শতাংশ, ১৮ সেপ্টেম্বর সেই হার আরও ৫৮ শতাংশ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর সেই হার আরও কমে ৫৬ শতাংশে নেমে এসেছে। দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি হর কমেছে ১৫ শতাংশ, নবম শ্রেণীর ১১ শতাংশ এবং পঞ্চম শ্রেণীর ২ শতাংশ। প্রাথমিক স্তরে উপস্থিতি তুলনামূলক আশাব্যঙ্গক। তবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদণ্ডের তথ্য অনুযায়ী করোনা সংক্রমনের আগে মাধ্যমিক স্তরে উপস্থিতির হার ছিল ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশের মধ্যে। বর্তমান সেটি ৫৬ শতাংশে নেমে আসা উদ্দেগজনক। তবে এখনও সঠিক তথ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায় নাই। বেনবেইজ অক্টোবর থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করবে সম্পূর্ণ তথ্য হয়তো ডিসেম্বরের এর শেষে পাওয়া যাবে বলে মনে করছে শিক্ষা বিশ্বেষকেরা।

অনেক অভিভাবক বলছেন, সপ্তাহে এক দিন ক্লাস হওয়ার কারনে তারা শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন না। এ সমস্যা সমাধানে শ্রেণীকক্ষে পাঠের সময় বাড়াতে হবে। করোনা সংক্রমনের জন্য কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ায় অভিভাবকেরা এখনো ভয়ভিত্তিতে আছেন; তারা ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে পাঠাবে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

সুতরাং এই মুহূর্তে দেশের প্রান্তিক পর্যায় থেকে শুরু করে সব শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখী করা সরকারের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার্থীদের বৃত্তি, উপবৃত্তির পাশাপাশি পারিবারিক উদ্যেগ ও সচেতনতা বাড়াতে হবে। স্কুলে টিভিনের ব্যবস্থা করতে হবে। যে মেয়েদের বাল্যবিমে হয়ে স্কুল থেকে চলে যাচ্ছে তাদের উপবৃত্তি বাড়িয়ে দিতে হবে। এবং যেসব ছেলে শিক্ষার্থী পরিবারের আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য কাজে যেতে বাধ্য হয়েছে তাদের ৪৮ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপিসি) এর আওতায় আনতে হবে। উপবৃত্তি প্রদান করে কারিগরি শিক্ষায় ফেরত আনাতে হবে।

তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, পরিচালনা কমিটি ও অভিভাবকদের ও চেষ্টা করতে হবে। তাই শিক্ষা মন্ত্রনালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে বাস্তবায়ন করতে পারলেই শিক্ষার্থীদের আগের রূপে শিক্ষাস্নে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
জগন্মাথ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশ তথ্যঃ  
পত্রিকাঃ মানবকর্তৃ।  
তারিখঃ ০৮ অক্টোবর ২০২১।



# কেন যাব প্রিয় বইমেলায় আবদিম মুনিব

প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও অনুষ্ঠিত হচ্ছে অমর একুশে বইমেলা। আর বাঙালির কাছে এই বইমেলা হল আবেগ, অনুভূতি এবং ভালোবাসার নাম। কেননা এই বইমেলার সাথেই আমাদের ভাষা মিলে আছে। আমাদের চেতনা জড়িয়ে আছে। বইপ্রমিয়া অধির আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে কবে আসর শুরু হবে এই বই মেলার। এই মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি বইমেলার উদ্বোধন করেন। এরপর থেকে বইমেলা স্বাস্থ্যবিধি মেনে শুরু হয়েছে। এ বছরের বইমেলায় বিভিন্ন বয়সের পাঠকদের ভিড় লক্ষ্যনীয়। বিশেষভাবে তরঙ্গ প্রজন্মের লেখক, পাঠকদের উপরে পরা ভিড়। তারা তাদের পছন্দের প্রিয় বইটি নিতে স্টলে স্টলে ঘুরে বেড়ায়। যা সত্যিই প্রশংসনীয়। পিতামাতা তার সন্তানদেরকে নিয়ে আসেন বইমেলা দেখাতে। যুবক - যুবতীরা নানা বাহারি সাজে সজ্জিত হয়ে মেলায় ঘুরে ঘুরে দেখেন। লেখক-লেখিকা, কবি, সাহিত্যিক, কলামিস্ট, প্রবন্ধকারীরা তাদের প্রকাশিত বইটির অটোগ্রাফ প্রদান করেন। বইয়ের প্রকাশক চমৎকার ডিজাইন করে রাখে তাদের স্টলগুলো। উন্নত, দেশ, জাতি এবং সভ্যতা বিনির্মানে বইয়ের অবদান অনস্বীকার্য। কেননা বইয়ের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জিত হয়। বইয়ের গুরুত্ব নিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, ”ধন বল, আয় বল, অন্যমনক্ষ ব্যক্তির ব্যক্তির ছাতা বল, সংসারে যত কিছু মরণশীল পদার্থ আছে বাংলা বই হচ্ছে সকলের সেরা”। সত্যিই বইয়ের ভূমিকা সর্বজনীন। অনেকে ভাবতে পারে খালি বই কিনে কি হবে তার চেয়ে এই টাকা পয়সা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করিব। কিন্তু এটি হবে তার জন্য একটি ভুল ধারণা কেননা এ বিষয়েই প্রমথ চৌধুরী বলেন, ”বই কিনে কেউ কোনদিন দেউলে হয় না”। বর্তমান যুগ তথ্য ও প্রযুক্তির যুগ। সহজেই যে কোন বইয়ের পিডিএফ কপি মোবাইল, ল্যাবটুপে পড়া যায়। কিন্তু তার পরেও একটা নতুন বই মলাট উল্টিয়ে পড়ার স্বাদ ভিন্ন রকমের। আমাদের সমাজের অনেক ছেলে মেয়েরা শুধু ক্লাসেরই বই পড়ে তাদের চাহিদা অনুযায়ী রেজাল্ট পাওয়ার জন্য। এবং অভিভাবকগনও তাদের সন্তানদেরকে এ+ পাওয়ার জন্য কঢ়ি, বাড়তি টিটার দিয়ে পড়ান। কিন্তু এতে করে তারা শুধু এই বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তাই তাদেরকে এই বইমেলায় নিয়ে আসতে হবে তাদের বিভিন্ন বিষয়ের বই দেখাতে হবে এবং কিনে দিতে হবে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কাপ, পিরিচ, প্লাস, প্লেট উপহার না দিয়ে মহাতৃপ্তিযুক্ত বই দেওয়া উচিত। তাতে সকলে উপকৃত হবে। আমাদের জীবনের দুঃখ কষ্ট লাগব করতে পারে এই বই। যেমনটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, ”বই পড়াকে যথার্থ হিসেবে যে সঙ্গী করে নিতে পারে, তার জীবনের দুঃখ কষ্টের বোৰা অনেক করে যায়”। এজন্য বইয়ের সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত। এই অমর একুশে বইমেলা হতে বাছাই করে বিভিন্ন ধরনের বই আমাদের সংগ্রহ করা রাখা দরকার। এবং এভাবেই আমাদের সকলের নিজস্ব একটি গ্রন্থগার তৈরি হবে। এবং জ্ঞানের বাণী ছড়িয়ে যাবে সর্বত্র। বই দূর করতে পারে একাকিন্ত। এবং বই কোনদিন প্রতারণা করে না কারো সাথো বই হলো চিরযৌবন। অনেকে বইয়ের ব্যবসা করে এবং তাদের মাঝে অনেকে আবার এ পেশা ছেড়ে দেয়। কিন্তু সরদার জয়েনটদীন এ প্রসঙ্গে বলেন, ”বইয়ের ব্যবসা লাভজনক নয় জেনেও যাবা ব্যবসা করেন তাঁরা সত্যি মহৎ”। এজন্য আমাদের বেশি বেশি বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে নিজেকে জানার জন্য। তাহলে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র হবে উন্নত এবং সমৃদ্ধিশালী। তাই এই বইমেলায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে অংশগ্রহণ করা উচিত। অমর একুশে বইমেলা হোক আমাদের জন্য বইয়ের জগতে পরিচিত হওয়ার হাতিয়ার এমনটাই চাওয়া।

লেখকঃ

সদস্যঃ বাংলাদেশ তরঙ্গ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

প্রকাশ তথ্যঃ

পত্রিকাঃ ভোরের কাগজ।

তারিখঃ ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০২২।



# নারীর অধিকার আদায়ে সাম্যবাদ ও তার প্রাসঙ্গিকতা দিলরুম ইসলাম জিনাত

১৯৭৫ সালের ৮ মার্চ দিনটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করে জাতিসংঘ। যার পূর্ব নাম আন্তর্জাতিক কর্মজীবী নারী দিবস। দিনটির পেছনে রয়েছে সাহসী নারীদের সংগ্রামী ইতিহাস। বলা হয়ে থাকে, প্রয়োজনই আবিক্ষারের উদ্ভাবক। ১৮৫৭ সালে নিউইয়র্কে খখন কর্মঘন্টা আর ন্যায্য মজুরি নিয়ে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছিল ঠিক তখনি নারীদের অধিকার চেতনার লড়াইয়ের আবির্ভাব ঘটে। দীর্ঘ সংগ্রামের পর সাড়া পৃথিবী আজ পালিত হচ্ছে ‘নারী দিবস’।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে নারী-পুরুষ উভয়েই মানুষ হওয়া সত্ত্বেও মানব দৃষ্টিতে বৈষম্যের পর্দার আবির্ভাব হওয়ায় সূচনা হয়েছে নারী দিবসের। ফলে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য নির্দিষ্ট দিন নির্ধারণ করতে হয়েছে।

নারী দিবসের এই দিনে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি নারী জাগরণের অগ্রদুত ‘বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন’কে। যিনি বাংলার নারীদের শিক্ষার পথ সুগম করার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করেছিলেন। স্মরণ করছি বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে যিনি স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন। জাতিসংঘ ২০২২ সালের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে ‘নারীর সুস্থান্ত্য ও জাগরণ’। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুপ্রেরণায় নারীরা কোনো ক্ষেত্রেই পিছিয়ে নেই। নারীরা পেয়েছে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং লিঙ্গসমত্বের অধিকার। কিন্তু তবুও প্রশ্নবিদ্ধ আজ বাংলার নারীদের নিরাপত্তার অধিকার।

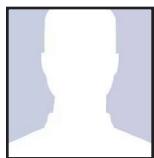
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তথ্যমতে, ২০২০ সালে দেশে ১ হাজার ৩৪৬ জন নারী ও কন্যাশিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র ও গণপরিবহন থেকে শুরু করে সব পরিস্থিতিতেই ভুগছে নিরাপত্তাহীনতায়, শিকার হচ্ছে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের। রেহাই পাছে না সহপাঠী, শিক্ষক, অফিসের কলিগ এবং উর্ধ্বর্তন কর্মকর্তাদের হাত থেকেও। অথচ সংবিধানের ২৮নং অনুচ্ছেদের এক নম্বর দফায় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে ‘নারী-পুরুষভেদে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না।’ একজন ছেলে বাসা থেকে বাইরে বের হলে নিশ্চিত মনে বসে থাকেন বাবা-মা। অথচ বর্তমান বাংলাদেশে একজন মেয়েকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠিয়েও দুর্চিন্তায় ভোগেন অভিভাবকরা। নারীদের কেবল নারী হিসেবেই দেখা হচ্ছে, মানুষ ভাবতে পারছে না সমাজব্যবহৃত্য। দেখা হচ্ছে যৌন কামনার বস্তু হিসেবে। সমাজের এই দৃষ্টি যতদিন না পরিবর্তন হবে ততদিন হয়তো নারীরা নারী হয়েই থেকে যাবে। প্রথমত নারীরা পরিবার থেকেই নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন। আঁচল ফাউন্ডেশনের একটি রিসার্চ থেকে জানা যায়, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত দৈহিক গঠনের কারণে কটাক্ষের শিকার হচ্ছেন নারীরা।

যাদের মাধ্যমে শিকার হন তারা হলেন- আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, পরিবার, পথচারী ও অন্যান্য। ৩৬ দশমিক ৯৫ শতাংশ নারী গায়ের রঙ, ৩৯ দশমিক ৪৯ শতাংশ ওজন ও ১৬ দশমিক ৬৫ শতাংশ নারী অন্যান্য বিষয়ের জন্য কটাক্ষের শিকার হন। বেসরকারি সংস্থা আয়োকশন এইড বাংলাদেশের ২০১৪ সালের এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জনসমাগম স্থলে নারীর ওপর বেশি যৌন হয়রানি হয়ে থাকে। ধামের তুলনায় শহরে বেশি। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, হয়রানি বা নির্যাতন সহ্যের সীমা অতিক্রম না করা পর্যন্ত নারীরা সাধারণত বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলে না। দেশের ৯৫ শতাংশ নারী মনে করেন তাদের পুলিশি সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে হেনস্থার শিকার হতে হয়। ৬৫ শতাংশ নারী মনে করেন পুলিশ অভিযোগকারীকেই দোষারোপ করে।

৫৭ শতাংশ নারীর মতে মামলা নিতে পুলিশ গড়িমসি করে। ৫৩ শতাংশ নারীর মতে অভিযোগ করে কোনো ফল পাওয়া যায় না। ৪১ শতাংশ নারী তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবাদ করতে গিয়ে শিকার হচ্ছে গণধর্ষণেরও। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) তথ্য সংরক্ষণ ইউনিটের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০২১ সালে সারা দেশে ধর্ষণ ও সংঘবন্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন মোট ১ হাজার ৩২১ জন নারী। এর মধ্যে ধর্ষণ পরবর্তী হত্যার শিকার হয়েছেন ৪৭ জন এবং ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেছেন ৯ জন। ‘মানবাধিকার পরিস্থিতি ২০২১’ পর তথ্যটি জানায় সংগঠনটি। আতঙ্কে থাকে নারী সমাজ। তায় যেন এখনকার নিত্যসঙ্গী।

নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে বাড়াতে হবে নারীর প্রতি মূল্যবোধ। মন্তিকে নারীকে মানুষ হিসেবে স্থান দিতে হবে। বর্জন করতে হবে বিকৃত চিন্তাভাবনা সেই সঙ্গে রাষ্ট্রকে আইনের সঠিক প্রয়োগই পারে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। মানুষ হিসেবে মূল্যবোধ-ই পারে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করতে। শুধু নারী দিবস নয়, বছরের প্রতিটা দিনই হয়ে উঠুক নারী দিবস। বিলীন হয়ে যাক নারী-পুরুষের পার্থক্য। নারীকে মানুষ হিসেবে দেখা হোক।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়  
বৃহৎস্পতিবার, ১০মার্চ,



# বিবেকে জাগ্রত করা প্রয়োজন

## মোঃ আশরাফুজ্জামান শাওন

মাদক! এই শব্দটি পরিচিতি লাভ করেছে অনেক আগেই আর তার বিপরীতে কালো আঁধারের গ্রাসে হারিয়ে যেতে বসেছে আমাদের আগামী। ভালোবাসার অটুট বন্ধন রীতিমত ছিঁড়তে বসেছে। তবে পৃথিবী কি তার সোনালী দিনগুলো ভুলে থাকতে পারবে? এই কালো বিষ আমাদের কিভাবে নামাতে হবে! এই নিয়ে অনেক সচেতনতামূলক ও অনেক বিনোদনতুল্য বিষয় আমাদের মাঝ থেকে ঘুরে গেছে। কি বা করেছে তারা! কি উপকার হয়েছে আমাদের, তা আমরা নিজেরাই ভালো জানি। তাহলে মাঝাপথে কি আমাদের তরী থেমে যাবে।

একটা ঘটনা মনে পড়ে যায়। নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না। (সালমানই ধরলাম) ছোটবেলা থেকে অনেক মেধাবী, ১২/১৩ বছর বয়স, মাত্র ২ বছরে হাফেজি পড়া শেষ করলো। তাকে নিয়ে মা-বাবার স্বপ্ন রংধনু আকার ধারণ করলো। তারপর সালমানের বাড়ি ফেরা এভাবেই চলছে। কিন্তু কথায় আছে সত্ত্বেও সর্গ বাস... বাকিটুকু বলার প্রয়োজন নেই আশা করি। সেই সালমান আর তাকে নিয়ে সেই স্বপ্ন কালো বিষ হয়ে ধারণ করলো গাঁজা, তামাক তার দৈনিক সঙ্গী হিসেবে গ্রহণের মাধ্যমে। এভাবে কি হারিয়ে যেতে দেব আমাদের আগামীকে? এই বাহারি রঙের বীজ থেকে বাঁচার উপায় আমাদেরই খুঁজতে হবে।

আপনি আপনার সন্তানকে কিভাবে মানুষ করবেন, কার সঙ্গে চলাচল করতে দেবেন সেটা আপনি ঠিক করবেন। আপনি দিনে কতবার খোঁজ নিচ্ছেন? প্রয়োজন অনুযায়ী কেন সে আপনার কাছে বেশি টাকা চাচ্ছে, কেন সে আপনার সঙ্গে টাকার জন্য খারাপ আচরণ করছে, আর এসবের মূলে কি লুকিয়ে আছে সেটা খুঁজে বের করার দায়িত্ব আপনার।

এত মাদক ধরা পড়ছে তবে কি সেটা কমে যাবে? কখনো না, আপনার আশা আশাই থেকে যাবে। শুধু সন্তানের মৃত্যুটা চেয়ে দেখা ছাড়া আপনার আর কিছু থাকবে না। তাই আপনার উচিত উপযুক্ত বয়সে শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। আপনার সচেতনতাই পারে আপনার সন্তানকে ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনতো। আবারো বলছি- বিবেককে জাগান। এই মাদক শুধু আপনার সন্তানকে নয়, পরিবারকেও ধ্বংস করবে, আর দেশের কথা একটু পরে ভাবলেও হবে।

সর্বোপরি বলবো- আপনার স্বপ্ন আপনার বিবেক আপনার সন্তানের আগামীর সুন্দর-সঠিক পথ দেখাবার দায়িত্ব আপনার। সরকার কিংবা সমাজকে দায়ী করার মধ্যে নয়, নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রতিরোধ ও সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

লেখক: শিক্ষার্থী,  
সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ

প্রকাশ তথ্যঃ  
পত্রিকাঃ ইন্ডেফাক।  
তারিখঃ ০৭ এপ্রিল ২০১৯।



# বিনোদন মাধ্যমে শুন্দির চর্চা চাই

## - আব্দুল্লাহ আলম নূর

সময়টি অনলাইন মাধ্যমের। বর্তমানে তরুণ প্রজন্মের বেশিরভাগের সময় কাটে এই মাধ্যমে। বিশেষত কোভিড-১৯ পরিস্থিতির এই সময়ে বাসায় বসে কিংবা অলস সময় কাটছে অধিকাংশ তরুণের। হাতে থাকা ছোটো ডিভাইসে সার্বক্ষণিক চালু থাকছে সামাজিক মাধ্যম আর ইন্টারনেট। লকডাউন, হোম কোয়ারেন্টাইনের আগে যে শিক্ষার্থীদের হাতে স্মার্ট ফোন কিংবা ল্যাপটপ-পিসি ছিলো না, অনলাইন ক্লাসের অজুহাতে তাদের অধিকাংশও পরিবার থেকে আদায় করে নিয়েছে ব্যক্তিগত ডিভাইস। কিন্তু শুধুই কি অনলাইন ক্লাস? কতজন করছে এই ক্লাস? ক্লাসে যুক্ত হয়ে ভিডিও-মাইক্রোফোন বন্ধ রেখে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ছে গেমস, ইউটিউব কিংবা অনলাইনে। ট্রুল, মিমের নামে রীতিমতো রাষ্ট্রীয় বিষয়, ধর্মীয় বিষয়, সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এমনকি শিক্ষকদের নিয়েও হাসি-ঠাট্টা করছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কিছু গ্রন্তি-পেজ থেকে।

গল্প-উপন্যাস, গোয়েন্দা কাহিনী, কিংবা কবিতার বই থেকে যেন ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে তরুণ প্রজন্ম। রোজ সকালে পত্রিকার পাতা উল্টানো যেন জানে না তারা। সময় কাটানোর একমাত্র মাধ্যমই হয়ে উঠছে হাতে থাকা ছোটো ডিভাইস আর ইন্টারনেট জগৎ। কিন্তু কী পাচ্ছে তারা সেখান থেকে? সংবাদ কিংবা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান তো বহুদূর, অনলাইনের সুবাদে তরুণরা এখন টেলিভিশনে প্রচারিত সিনেমা-নাটকও দেখে না বললেই চলে।

আজকাল রাষ্ট্রাঘাট, বিনোদন কেন্দ্র, পাবলিক প্লেস, গণপরিবহন এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও উঠতি বয়সীদের মুখে হামেশাই শোনা যায় বিভিন্ন গালি, অশালীন শব্দ। ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন সংস্কৃতি থেকে আমদানি করা এসব শব্দ, ট্রেন্ডের নামে খুব সহজেই তুলে দেয়া হয় উঠতি বয়সীদের মুখে। অনলাইনে প্রচারিত বিভিন্ন নাটক বা ভিডিও সংলাপে যার ব্যবহার দেখানো হয় অনেকটা স্বাভাবিকভাবে। মাধ্যমটিতে প্রচারিত কোনো নাটকে অভিনেতার টি-শার্টে দেখা যায় অশ্লীল বাক্য। তাদের মুখে যেন গালি আর অশ্রাব্য ভাষার প্রতিযোগিতা থাকে। নাটকে দেখা যায় নারীদের উদ্দেশ্য করে অশালীন কথবার্তা, বাজে অঙ্গভঙ্গ। শিক্ষক, বয়স্কদের সাথে মজাকরা, তাদের হেট করা, উদ্ভট কথবার্তা অনেকটা এভাবেই যেন এগিয়ে যায় অনলাইন মাধ্যমে প্রচারিত নাটক বা ভিডিওগুলো।

সাম্প্রতিক সময়ে বিনোদন মাধ্যমে আরেকটি সংযোজন ওয়েব সিরিজ। ওয়েব সিরিজ প্রশংসিত করছে দর্শক, পর্যালোচকদের। দেশীয় ওয়েব সিরিজ নিয়ে চলছে নানা বিতর্ক। কিছু ওয়েব সিরিজ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রশংস তুলেছেন অনেকেই। নাটক দেখতে গিয়ে আপত্তিকর দৃশ্য দেখতে হবে, অশ্লীল-অশ্রাব্য শব্দ শুনতে হবে, তা হ্যাত কল্পনা করেনি দর্শক। গত বছরে মুক্তি পাওয়া আলোচিত তিনটি ওয়েব সিরিজ নিয়ে দর্শকদের পাশাপাশি যুক্তি-তর্কে শামিল হয়েছিলেন নির্মাতারাও। এসময় ওয়েব সিরিজের পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে বিবৃতি-পাল্টা বিবৃতি দিয়েছিলেন নির্মাতা, অভিনয়শিল্পীরা। অশালীন বাক্যালাপ আর অঙ্গভঙ্গই যেন হয়ে উঠছে প্রচারের মূল বিষয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ভিডিওর শুরুতে প্রাণ্ড বয়স্কদের জন্য লেখা থাকলেও নানাভাবে তা প্রচারিত হয়ে যায় সব মাধ্যমেই। ওয়েব সিরিজের আপত্তিকর ভিডিওর ছোটো অংশ ছেড়ে দেয়া হয় সামাজিক মাধ্যমে। অনেকে তো আবার ফেসবুক, ইউটিউবে এসে ভিডিওর সমালোচনা করতে করতেই এবিষয়ে জানেন না, এমন দর্শকদেরও পরিচয় করিয়ে দেন, সেসব গল্প আর সমালোচিত দৃশ্যের সাথে। অনেক ভিডিওতে ধূমপান কিংবা অ্যালকোহলের দৃশ্য পরিবেশনের সময় প্রচার করা হয় না কোনো সতর্কতামূলক বাণী।

গত ১৬ ডিসেম্বর অনলাইন প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাওয়া একটি চলচিত্রে, ধর্ষণের শিকার একজন নারীকে জিজ্ঞাসাবাদের দৃশ্যে অশালীন ভাষা ব্যবহার করে, পুলিশকে হেয় করার অভিযোগে এবং পর্নোগ্রাফি আইনে মামলা করে পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিট। একই মাসের ২৫ তারিখে চলচিত্রটির পরিচালক এবং অভিনেতাকে গ্রেফতারের পর কারাগারে পাঠানো হয়। প্রসঙ্গত আরো উল্লেখযোগ্য ২০১৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর একটি মিউজিক ভিডিওর সাথে সম্পৃক্ত ৭ জনের বিরুদ্ধে আদালতে পর্নোগ্রাফির অভিযোগে মামলা করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী।

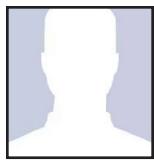
ইউটিউব, ওয়েবসাইট, পর্দা যেখানেই প্রচারিত হোক নাটক, সিনেমা হচ্ছে বিনোদনের মাধ্যম, যেখানে থাকবে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বার্তা, থাকবে শিক্ষণীয় বিষয়। এসব পর্যালোচনায় অনলাইন ভিডিও প্রচারের ক্ষেত্রেও প্রিভিউ কমিটি বা সেন্সরশিপের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, বিগত বছরের ২২ জুন ওয়েব সিরিজ বিষয়ে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, ‘ওয়েবসিরিজ, সিনেমা বা যেকোনো কিছু নির্মাণ ও প্রচার করার ক্ষেত্রে আমাদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের একটি কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি আছে, আমাদের সমাজের একটি মূল্যবোধ আছে। আমাদের

কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করে কোনো কিছু করা কখনোই সমীচীন নয়। আইন অনুযায়ী সেটি দণ্ডনীয় অপরাধ।'

শুধু দর্শক টানার উদ্দেশ্যে আপত্তিকর দৃশ্য দেখানোর প্রতিযোগিতা কোনো সুফল বয়ে আনবে না বিনোদন জগতে। নাটক, সিনেমা অবশ্যই জীবনের গল্প বলবে, প্রান্তিক থেকে উচ্চবর্গ সবার জীবনাচরণ দেখাবে, উপস্থাপন করবে সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষদের। কিন্তু তা উপস্থাপিত হোক সুন্দর এবং সুস্থ ধারায়। আমরা বিনোদন মাধ্যমে সুস্থ ধারা চাই, শুন্দরার চর্চা চাই।

লেখক: শিক্ষার্থী,  
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

প্রকাশ তথ্যঃ  
পত্রিকাঃ ইনকিলাব।  
তারিখঃ ০৭ জানুয়ারি ২০২১।



# সুনীল অর্থনীতি এবং বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনা সামিহা খাতুন

ব্লুইকোনমি বা নীল বিপুর হচ্ছে সমুদ্র সম্পদ নির্ভর অর্থনীতি। ১৯৯৪ সালে অধ্যাপক গুণ্টার পাউলি ভবিষ্যতের অর্থনীতির রূপরেখা প্রণয়নের জন্য একটি টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব মডেল হিসেবে ব্লুইকোনমির ধারণা দেন। সমুদ্র ব্যবহৃত হয় মাছ এবং মৎস সম্পদের মাধ্যমে খাবার চাহিদা মেটায়, মানুষ এবং পন্য পরিবহনের মাধ্যম হিসেবে। এছাড়াও সমুদ্র নানা ধরনের প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ যেমন বালি, লবণ, কবাল্ট, গ্রাভেল, এবং কপার ইত্যাদির আধার হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং তেল ও গ্যাস আহরণ ক্ষেত্র হিসেবে সমুদ্র প্রয়োজন হয়। এসব উপাদান সমষ্টিকেই বলা হয় সুনীল অর্থনীতি বা ব্লুইকোনমি।

বিশ্বব্যাপী ব্লুইকোনমির চিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায় বছরব্যাপী তিনি থেকে পাঁচ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের কর্মকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে সমুদ্রকে ঘিরে। বিশ্বের চার শত ত্রিশ কোটি মানুষের ১৫ ভাগ প্রোটিনের যোগান দিচ্ছে সামুদ্রিক মাছ, উভিদ ও জীবজন্তু। পৃথিবীর ৩০ ভাগ গ্যাস ও জ্বালানী তেল সরবরাহ হচ্ছে সমুদ্রতলের বিভিন্ন গ্যাস ও তেলক্ষেত্র থেকে। এছাড়াও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে সমুদ্র নির্ভর ঔষুধশিল্পও গড়ে তোলা সম্ভব। ধারণা করা হচ্ছে ২০৫০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা হবে প্রায় ৯০০ কোটি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর খাবার যোগান দিতে বিশ্ববাসীর হতে হবে সমুদ্রের মুখাপেক্ষী।

সমগ্র বিশ্বে ক্রমশ ব্লুইকোনোমি জনপ্রিয় হচ্ছে। বিগত বছরগুলোতে যতগুলো আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছে তার সবগুলোতেই ব্লুইকোনোমি ছিল আলোচনার কেন্দ্রে। অর্থনৈতিক সহায়তা এবং উন্নয়ন সংস্থা (□□□□), জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (□□□□), বিশ্বব্যাংক, খাদ্য ও ক্রমি সংস্থা (□□□), ইউরোপীয় ইউনিয়ন (□□) প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন ছোট বড় দেশ ব্লুইকোনোমি নির্ভর উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন করছে।

বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে সমুদ্র নির্ভর ব্লুইকোনোমির বদৌলতে। ২০১২ এবং ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে মায়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি হয় এবং ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার সমপরিমাণ টেরিটোরিয়াল সমুদ্র এলাকায় বাংলাদেশের নিরকুশ কর্তৃত, অধিকার ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এবং যার আয়তন প্রায় আরেকটি বাংলাদেশের সমান হওয়ায় এই সমুদ্র বিজয়ের পর খুলে গেছে নীল বিপুবের অপার দুয়ার। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর এবং অর্থনীতিবিদ ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বাসসকে বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও ভিশন-২০৪১ অর্জনে ব্লুইকোনমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সমুদ্রে অবস্থিত বিশাল জলরাশি এবং এর তলদেশের বিশাল সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নেওয়ার নতুন দিগন্ত উন্মোচন হয়েছে ব্লুইকোনমির মাধ্যমে। ধারণা করা হয় বঙ্গোপসাগরের তলদেশে যে খনিজ সম্পদ রয়েছে তা পৃথিবীর অন্য কোন সাগর, উপসাগরে নেই।

বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সমুদ্র সম্পদের অবদান মাত্র ৯ দশমিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অথবা ৬ শতাংশ। দেশের স্থলভাগের প্রায় সমপরিমাণ সমুদ্রসীমায় এখন মূল্যবান সম্পদের ভাভার। ভারত ও মিয়ানমার থেকে অর্জিত সমুদ্রসীমায় ২৬টি ব্লক রয়েছে। ইজারা দিয়ে এসব ব্লক থেকে প্রায় ৪০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পাওয়া সম্ভব মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০১৭ সালে ‘ব্লুইকোনমি সেল’ গঠন করে সরকার।

সমুদ্রসম্পদ সুরক্ষায় ২০১৯ সালে মেরিটাইম জোন অ্যাস্ট করেছে সরকার। সমুদ্রসীমা বিজয়ের ফলে ব্লুইকোনমির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দুই ধরনের সম্পদ অর্জন করেছে। এর একটি হলো প্রাণিজ, অপারটি অপ্রাণিজ। প্রাণিজের মধ্যে রয়েছে মৎস্যসম্পদ, সামুদ্রিক প্রাণী, আগাছা-গুল্মলতা ইত্যাদি। এছাড়া বঙ্গোপসাগরের বিপুল পরিমাণ আগাছা প্রক্রিয়াজাতকরণ করে বিভিন্ন রোগের ওষুধ তৈরি করা যায়। এসব আগাছার মধ্যে ইসপিরিলিনা যা অত্যাধিক মূল্যবান। সমুদ্রে শুধু মাছ রয়েছে প্রায় ৫০০ প্রজাতির, ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি, ২০ প্রজাতির কাকড়া ও ৩৩৬ প্রজাতির শামুক-বিনুক রয়েছে। সেই সাথে রয়েছে শ্যালফিশ, অঞ্চোপাস, হাঙ্গর সহ বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী।

অপ্রাণিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে খনিজ ও খনিজ জাতীয় সম্পদ যেমন তেল, গ্যাস, চুনাপাথর ইত্যাদি। আরও রয়েছে ১৭ ধরনের মূল্যবান খনিজ বালু। যেমন জিরকল, রোটাইল, সিলিমানাইট, ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, গ্যানেট, কায়ানাইট, মোনাজাইট, লিক্লেসিন ইত্যাদি। যার মধ্যে মোনাজাইট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়াও সিমেন্ট বানানোর উপযোগী প্রচুর ক্লে রয়েছে সমুদ্রের তলদেশে। এছাড়াও সামুদ্রিক মাছ সঠিকভাবে আহরণ করতে পারলে নিজ দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা সম্ভব। তাছাড়া সামুদ্রিক মাছ থেকে খাবার, মাছের তেল দিয়ে বিভিন্ন প্রকার ওষুধ, সস, চিটোসান ইত্যাদি তৈরি করা সম্ভব, যার ফলে নতুন ধরনের কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানি করে দেশের জন্য প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যেতে পারে।

ইতিমধ্যে সামুদ্রিক অর্থনীতি বিকাশের জন্য ২৬টি সম্ভাবনাময় কার্যক্রম চিহ্নিত করেছে সরকার। এগুলো হল: শিপিং, উপকূলীয় শিপিং, সমুদ্র বন্দর, ফেরীর মাধ্যমে যাত্রী সেবা, অভ্যন্তরীণ জলপথে পরিবহন, জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ রিসাইক্লিং শিল্প, মৎস্য, সামুদ্রিক জলজ পণ্য, সামুদ্রিক জৈব প্রযুক্তি, তেল ও গ্যাস, সমুদ্রের লবণ উৎপাদন, মহাসাগরের নবায়নযোগ্য শক্তি, বুংএনার্জি, খনিজ সম্পদ (বালি, নুড়ি এবং অন্যান্য), সামুদ্রিক জেনেটিক সম্পদ, উপকূলীয় পর্যটন, বিনোদনমূলক জলজ ক্ষেত্র, ইয়টিং এবং মেরিনস, ত্রুজ পর্যটন, উপকূলীয় সুরক্ষা, কৃত্রিম দ্বীপ, সরুজ উপকূলীয় বেল্ট বা ডেল্টা পরিকল্পনা, মানব সম্পদ, সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং নজরদারি এবং সামুদ্রিক সমষ্টি স্থানিক পরিকল্পনা (এমএসপি)।

বাংলাদেশের বুংইকোনমির উন্নয়ন সম্ভাবনায় ১০টি পয়েন্ট সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। ২০৪১ এর উন্নত বাংলাদেশ গঠনে সমুদ্রে পাওয়া ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি. মি. এর যথাযথ ব্যবহারে সামুদ্রিক অর্থনীতি হয়ে উঠতে পারে বাংলাদেশের জন্য ট্রামকার্ড। পয়েন্ট গুলো উল্লেখ করা হলোঃ

□ কিছুদিন আগে গৃহীত হয়েছে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বা ডেল্টা প্ল্যান-২১০০। এ মহাপরিকল্পনায় সমুদ্র অর্থনীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনায় নীল অর্থনীতির সম্ভাবনা কাজে লাগাতে ৫ ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে যার মধ্যে অন্যতম হলো সামুদ্রিক সম্পদের বহুমাত্রিক জরিপ দ্রুত সম্পর্ক করা। এর মাধ্যমে সরকার সমুদ্র অর্থনীতিকে কাজে লাগানোর জন্য প্রথম এবং প্রধান কাজটিই হাতে নিয়েছে।

□ সমুদ্র বিজয়ের ফলে বাংলাদেশ যে অঞ্চলের মালিকানা পেয়েছে, সেখানে অন্তত চারটি ক্ষেত্রে কার্যক্রম চালানো হলে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রতিবছর প্রায় আড়াই লাখ কোটি মার্কিন ডলার উপার্জন করা সম্ভব। ক্ষেত্র চারটি হলো তেল-গ্যাস উত্তোলন, মৎস্য সম্পদ আহরণ, বন্দরের সুবিধা সম্প্রসারণ ও পর্যটন।

□ সুষ্ঠির সামুদ্রিক কার্যক্রমের নিমিত্তে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক বুংপ্রোগ্রামের (□□□□□□□) জন্য ১০০ মিলিয়ন ডলারের ফাস্ট গঠন করা হয়েছে। যার সাইনিং সম্পাদিত হয়েছে নভেম্বর ২০১৮ তে। বাংলাদেশে সামুদ্রিক খাতেও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের বিনিয়োগ সম্ভাবনা রয়েছে।

□ বঙ্গোপসাগর তীরে বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার ও থাই উপকূলে ১৪৫ কোটি মানুষের বাস। বাংলাদেশের অবস্থান কেন্দ্রে। ফলে এখানকার বিপুল অর্থনৈতিক সম্ভাবনার সুফল বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার ভালো সুযোগ রয়েছে।

□ বর্তমানে বাংলাদেশের ট্র্যালারগুলো উপকূল থেকে ৩৫-৪০ নটিক্যাল মাইলের মধ্যে মাছ আহরণ করে। কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক অঞ্চল ২০০ নটিক্যাল মাইল। আরও বিস্তৃত পরিসরে কাজ করে সমুদ্র অর্থনীতিতে দেশের অর্থনীতি সুদৃঢ় করার বিশেষ সুযোগ রয়েছে।

□ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (□□□) মতে, ২০২২ সালের মধ্যে বিশ্বের যে চারটি দেশ মাছ চাষে বিপুল সাফল্য অর্জন করবে, তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে বাংলাদেশ। এরপর থাইল্যান্ড, ভারত ও চীন। নতুন জলসীমার অধিকার পাওয়ায় বুংইকোনমি প্রসারে বাংলাদেশের এ সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। তাই সমুদ্র খাতের এ সুযোগ লুপে নেয়াই এখন কাজ।

□ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ২১টি সদস্য দেশের সংগঠন ‘ইন্ডিয়ান ওসেন রিম অ্যাসোসিয়েশন-□□□□’ এর সদস্য বাংলাদেশ। বুংইকোনমি নিয়ে এ জোটের বিভিন্ন দেশ কাজ করছে।

□ ঢাকা চেম্বার অব কর্মস এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (□□□) হিসাব মতে, বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ৭০ শতাংশ আসে সমুদ্রে মাছ আহরণ, সামুদ্রিক খাদ্য ও বাণিজ্যিক সমুদ্র পরিবহন হতে। প্রায় ৩ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এসব কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এর মধ্যে কেবল সামুদ্রিক মাছ আহরণে নিয়োজিত আছে ৫০ লাখ মানুষ। এ খাতে আধুনিকায়ন হলে এ সংখ্যা বাড়া কেবল সময়ের ব্যাপার।

(সূত্রঝনকষ্ট, ২৭ জুলাই ২০১৭)

□ সিমেন্ট শিল্পের কাঁচামাল ‘ক্লে’র সম্ভাবনা পাওয়া গেছে বঙ্গোপসাগরের প্রায় ৩০ থেকে ৮০ মিটার গভীরে। অগভীর সমুদ্রের ক্লে উত্তোলন করা যায় গেলে বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্পে বৈপ্লাবিক পরিবর্তন আসবে। এছাড়াও সমুদ্র তলদেশে মহামূল্যবান ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। বিশ্বে এ ধাতু দুটির চাহিদা ক্রিয়ে তা সহজে অনুমোদিত।

□ সমুদ্র নির্ভর অর্থনীতি থেকে যদি ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা যায়, তাহলে ভিশন ২০৪১ ২০৪১ পূর্ণ করা সহজ হবে। ফলে আমরা এই সময়ের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছে যাব।

বুংইকোনমি উন্নয়নের পথে বাংলাদেশের মূল চ্যালেঞ্জ সমূহ হলো- পর্যাণ নীতিমালার ও সঠিক কর্ম পরিকল্পনার অভাব, দক্ষ জনশক্তির অভাব, প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব, সম্পদের পরিমাণ ও মূল্য সম্পর্কে সঠিক তথ্যের অভাব, মেরিন রিসোর্স ভিত্তিক গবেষণার না হওয়া, বুংইকোনমি সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক যোগাযোগের অভাব এবং গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য গবেষণা জাহাজ না থাকা।

বর্তমান সরকার বুংইকোনমির সুযোগগুলোকে কাজে লাগানোর জন্য দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার উপর বিশেষ নজর দিচ্ছে। সমুদ্র গবেষণা ও মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সাম্প্রতিক কালে সরকার বাংলাদেশ ওশানোগাফিক রিসার্চ ইনসিটিউট এবং একটি মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেছে। সমুদ্র অর্থনীতি বিষয়ে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় চুক্তি ও হয়েছে। সমরোতা চুক্তি করার প্রস্তাব দিয়েছে চীন। আগ্রহ প্রকাশ করেছে জাপান। এছাড়াও হাতে নেয়া হয়েছে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের কাজ এবং তৈরি করা হচ্ছে সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এছাড়াও গ্যাসসহ অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ উত্তোলন, মৎস্যসম্পদ আহরণ,

বন্দরের সুবিধা সম্প্রসারণ ও পর্যটনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনামাফিক কার্যক্রম পরিচালনা করা গেলে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রতিবছর আড়াই লাখ কোটি ডলার আয় করা সম্ভব। অপার সন্তাবনাময় এ খাতকে কাজে লাগানো জরুরি। সমুদ্রের তলদেশে কী ধরনের সম্পদ রয়েছে, সেগুলো আহরণ করতে হলে কোন ধরনের প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞ জনবল প্রয়োজন তা পরিকল্পনামাফিক নির্ধারণ করে সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ব্লুইকোনমি বা নীল অর্থনীতির সুন্দরপ্রসারী অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ সরকারকে নিতে হবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। নির্ভরযোগ্য তথ্য উপাত্ত ও সঠিক পরিসংখ্যান করে বিনিয়োগকারীদের এই খাতে কিভাবে আকৃষ্ট করা যায় এবং এই খাতের কিভাবে উন্নয়ন করা যায় সে বিষয়ে নজর রাখতে হবে। প্রযুক্তি নির্ভরতা ও দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ সম্পর্কে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমানায় যেসব অনাবিক্ষিত সমুদ্র সম্পদ আছে সেগুলোর বিজ্ঞানভিত্তিক ও পরিবেশবান্ধব সংগ্রহ এবং টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সেইসাথে ব্লুইকোনমি তে এগিয়ে থাকা দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও পরামর্শ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে যা আমাদের দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও সমুদ্র বিষয়ে পরিকল্পনা, জাতীয় নিরাপত্তা ও জাতীয় ক্ষমতা বিকাশের জন্য নানা রকম উদ্যোগ নেয়া এবং সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের জন্য কর্মপঞ্চা প্রণয়ন, জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও সুবিধা বৃদ্ধি এবং পর্যটন ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে হবে। একই সাথে আন্তর্জাতিক সীমালংঘন আইন, সিসিআরএফ এর ধারা সমূহের সর্বোচ্চ বাস্তবায়ন করতে হবে। এছাড়াও ব্লুইকোনমিক উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য সকল ধরনের কার্যকরী পদক্ষেপ ও পর্যাপ্ত পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। আশা করা যায় আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের জন্য সন্তাবনার দুয়ার খুলে দিবে ব্লুইকোনমি বা নীল সমুদ্র অর্থনীতি।

লেখকঃ

শিক্ষার্থী,  
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকাশ তথ্যঃ

পত্রিকাঃ বাংলাদেশ বুলেটিন।

তারিখঃ ১৫ জানুয়ারি ২০২২।



# আসন্ন চ্যালেঞ্জ; ব্যবসা বনাম চাকরি আবু সোহান

ব্যবসায় শব্দের উৎপত্তি ইংরেজি “Business” শব্দ থেকে। “Business” শব্দের পারিভাষিক প্রতিশব্দ হলো ব্যবসায়। আক্ষরিক অর্থে “Business” শব্দের অর্থ হলো “ব্যস্ত থাকা”। □□□□□□□□□ শব্দের মূল শব্দ “□□□□□□□□” (**business, Busyness**) এরপর □□□□□□□, □□□□□□□ এবং পরবর্তীতে □□□□□□□ বানানে রূপান্তরিত হয়। বৈধ উপায়ে মানুষের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করাকে ব্যবসায় বলে। ব্যবসায়ের প্রধান লক্ষ্য মুনাফা অর্জন করা। রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ বা মানুষের ক্ষতি করে এমন কাজের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করলে সেটা ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত হবেনা। তদুপর, মনের সুখে কারোর উপকার করলেও সেটা ব্যবসা নয়। কারণ, এখানে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য মুখ্য না। ব্যবসায় হতে হলে কাজের বৈধতা এবং মুনাফা অর্জন এই দুইটা বিষয় অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। অর্থশাস্ত্রের পরিভাষায় “ব্যবসায় এক ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ড (বিজ্ঞান) যেখানে নির্দিষ্ট সৃষ্টিশীল ও উৎপাদনীয় লক্ষ্যকে সামনে রেখে বৈধভাবে সম্পদ উপার্জন বা লাভের উদ্দেশ্যে লোকজনকে সংগঠিত করা হয় এবং তাদের উৎপাদনীয় কর্মকাণ্ড রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়”।

ব্যবসায়ের ক্রমবিকাশের ধারাকে তু ভাগে বিভক্ত করা হয় (১) প্রাচীন যুগ (২) মধ্য যুগ (৩) আধুনিক যুগ। মানব সভ্যতার শুরু থেকেই ব্যবসায়ের প্রাচীন যুগের সূচনা ঘটে। এ যুগের মানুষ বনের পশুপাখি শিকার, ফলমূল সংগ্রহ এবং মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতো। কৃষিকাজের সাথে সাথে বিনিময় প্রথারও প্রচলন ছিলো। মধ্য যুগে ব্যবসায়ের উৎপাদন এবং বিতরণ পদ্ধতির উন্নতি করা হয়। বার্টার সিস্টেম বা বিনিময় প্রথা খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এসময় কৃষক, জেলে এবং অন্যান্য পেশার লোক তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রের দক্ষতা প্রমাণ করেছে। ব্যবসায়ের আধুনিক যুগ শিল্প বিপ্লব থেকে শুরু হয় এবং এখনও অব্যাহত রয়েছে। ব্যবসায়ের আধুনিক যুগে প্রচলন হয় বিভিন্ন ধরনের শিল্প সরঞ্জাম ও মেশিন। আধুনিক যুগে মানুষ অনুভব করে যে, তাদের জন্য বিনিময় প্রথার ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। ফলশ্রুতিতে অর্থ বিতরণ, অর্থ হস্তান্তর করার জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অর্থ বাজারের প্রচলন করে। এরই ধারাবাহিকতায় অর্থ উপার্জনের সবথেকে উপর্যোগী ক্ষেত্র হিসাবে মানুষ ব্যবসাকে পেশা হিসাবে বাছাই করে। যার ফলে পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবসা শব্দটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। বুদ্ধিমত্তা আর সজ্জনশীলতার স্বচ্ছ বহিঃপ্রকাশ হিসাবে ব্যবসা একটি উজ্জ্বল দ্রষ্টান্ত। ব্যবসা করতে হলে মূলধন প্রয়োজন, কিন্তু তার থেকে বেশি প্রয়োজন প্রবল আত্মবিশ্বাস এবং ঝুঁকি নেওয়ার মন-মানসিকতা। ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা যেকোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনাকে ঝুঁকি বলে এবং ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত সবকিছু না ঘটার সম্ভাবনাকে অনিষ্টিততা বলে। একজন সফল উদ্যোগী এসকল প্রতিকূল পরিবেশকে পিছনে ফেলে জয় ছিনিয়ে আনে। বিশ্বের নামি-দামি যত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার অধিকাংশই আধুনিক যুগে প্রতিষ্ঠিত। আন্তর্জাতিক মানের কোম্পানি মাইক্রোসফট, আলিবাবা ডটকম, অ্যামাজন, এ্যাপেল ও ইউনিলিভার। এরকম হাজারো প্রতিষ্ঠান আধুনিক যুগের ব্যবসাকে আরও আধুনিক করেছে। ম্যালকম প্ল্যাডওয়েলের “আউটলয়ার্স” বইটা পড়লে বোৰা যায় যে, বিশ্ব-বিখ্যাত কোনিকিছুই একদিনে গড়ে উঠেনি। একটি সফলতার পিছনে পাহাড় সমান ব্যর্থতা লুকিয়ে থাকে। দৃঢ়তা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার নামই আত্মবিশ্বাস। যে যত আত্মবিশ্বাসী সে ততই অগ্রসরমান। আমাদের দেশীয় অসংখ্য ছেটবড় মানসম্মত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কুটির শিল্প থেকে শুরু করে বৃহদায়তন কোম্পানি পর্যন্ত বিস্তৃত। যেমন, মৃৎশিল্প, মৎস্য শিল্প, পাট শিল্প, রাসায়নিক শিশু, পোশাক ও বস্ত্র শিল্প এবং ইত্যাদি। দেশীয় চাহিদা মেটানোর পর বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরীকৃত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে। ফলস্বরূপ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধিশীল হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্যমতে, বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৪ বিলিয়ন বা ৪ হাজার ৪০০ কোটি মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়তে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স ও অনেক বড় একটা ভূমিকা পালন করে। করোনার মহামারীর কারণে অর্থনৈতিক ভাবে অনেক দেশ বিপর্যস্ত। বাংলাদেশও এই তালিকা থেকে পিছিয়ে নেই। করোনার কঠিন পরিস্থিতিতে অনেকে চাকরি হারিয়েছে। সদ্য পাসকৃত ডিপ্রিধারী যুবক-যুবতীরাও বেকারত্বের মিছিলে যুক্ত হচ্ছে। দিন দিন সরকারি এবং বেসরকারি খাতের কর্মসংস্থান সীমিত ও সংকুচিত হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরোর সর্বশেষ ২০১৬-১৭ সালের জরিপ অনুযায়ী দেশে শ্রমশক্তির আকার ৬ কোটি ৩৫ লাখ মানুষ। কাজের মধ্যে ছিলো ৬ কোটি ৮ লাখ। করোনার আগে বেকারের সংখ্যা ২৭ লাখ ছিলো। ২০২০ সালের এপ্রিল-জুলাই সময়ে বেকারত্ব আরও ১০ গুণ বেড়েছে। শতাংশের হিসাবে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার ৪ দশমিক ২ শতাংশ। আইএলও এর তথ্যমতে, তরঙ্গদের মধ্যে ২৫% বেকার। চলমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে যা পাওয়া যায় তা হলো, কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমান্বায়ন। ভবিষ্যতে তা আরও ক্রমবর্ধমান। কিন্তু নিজেই নিজের আত্মকর্মসংস্থান তৈরী করে নেওয়ার সুযোগ অসীম। আত্মকর্মসংস্থান তৈরি করার উপযুক্ত ক্ষেত্র হলো ব্যবসা। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে বেকার যুবক-যুবতীরাও জনশক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। বৈধভাবে অর্থ উপার্জনের তাগিদে মানুষ যা কিছু করে তার সবই কর্মসংস্থানের অন্তর্ভুক্ত। এই তালিকায় ব্যবসার থেকে চাকরি প্রথম সারির কর্মসংস্থান।

চাকরি শব্দের উৎপত্তি হয়েছে চাকর থেকে। চাকর তুকী শব্দ, এর মানে হলো “দাসত্ব”। ইংরেজ শাসনামলে আক্ষরিক অর্থেই আমরা

দাস ছিলাম। তখন তারা শাসনকার্যের সুবিধার্থে আমাদের দেশীয় লোক নিয়োগ দিত। আমরা নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ পেতাম। সেখান থেকেই চাকরি কথাটার উৎপত্তি। চাকরি কথাটার উৎপত্তি বিদ্যুটে হলেও এটার বিশালতা অনেক। সিকিউরিট জীবন অতিবাহিত করার জন্য চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতা আমাদের কারোর অজানা না। আমাদের সমাজ ব্যবস্থাও ব্যবসায়ীদের থেকে চাকরিজীবী মানুষের বেশি করতে করে। আত্মসম্মান ও আত্মর্যাদার ভয়ে একদল ব্যবসায়ী হওয়া থেকে বিরত থাকে। উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রেও অনুৎসাহ বোধ করে। একারণে প্রত্যেক শিক্ষিত বেকারের একমাত্র লক্ষ্য চাকরি। প্রতিনিয়ত চাকরির বাজার কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। পরিশ্রম, মেধা ও ভাগ্য একযোগে কাজ না করলে তালো চাকরি সোনার হরিণের মত মরিচিকা। এমতাবস্থায় আমাদের বিকল্প পথ অবলম্বন করতে হবে। কালো মেঘের ন্যায় জীবন অঙ্ককারাচ্ছন্ন হওয়ার পূর্বে সর্তক হতে হবে। দেশের সরকার প্রধান “মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা” ব্যবসায়ী হওয়ার তাগিদ দেন বারবার। তিনি ফ্রিল্যান্সিং করার কথাও বলেছেন। ফ্রিলান্সার হয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন। ফ্রিল্যান্সার হতে বেশি কিছু প্রয়োজন হয় না। শক্তিশালী ইন্টারনেট কানেকশন এবং একটি কম্পিউটারই যথেষ্ট। আউটসোর্সিং করে অনেকে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। সরকারি ও বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন মেয়াদী প্রাফিক্স ডিজাইনের কোর্স শিক্ষা দিচ্ছে। ফ্রিল্যান্সিং এমন একটি প্লাটফর্ম যেখানে কাজ পেতে কোন টাকা বা ঘুষ দিতে হয় না। বর্তমানে উদ্যোগাদের আর্থিকভাবে সহায়তা করার জন্য দেশে বিভিন্ন সংস্থা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান জামানতবিহীন স্বল্প সুন্দে ঝুঁঁ দিয়ে থাকে। অনেকে সুযোগগুলো কাজে লাগিয়ে বেকারত্ব থেকে মুক্ত হতে পারছে। বর্তমানে আমাদের দেশে চাকরির জন্য নতুন কোন খাত তৈরি হচ্ছে না, হলেও সেটা খুবই নগন্য। ভবিষ্যতে এই ভয়াবহতা আরও বিশাল হতে চলেছে। আসন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আন্তর্নির্ভরশীল হওয়ার বিকল্প আর কিছু দেখছি না। এই পরিস্থিতিতে চীনা নাগরিক আলীবাবা ফ্ল্যাপের প্রতিষ্ঠাতা “জ্যাক মা” এর একটি বিখ্যাত উক্তি না লিখে পারলাম না। জ্যাক মা বলেছেন “আপনি যদি একটি বানরের সামনে একটি ১০০ ডলারের নাটে এবং একটি কলা ফেলে দেন, তাহলে বানরটি কলাটিকেই বেছে নিরে কারণ বানর জানে না যে, ডলার দিয়ে আরও অনেক বেশী কলা কেনা যায়। ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের যুব সমাজের সামনে যদি চাকরি আর ব্যবসা কে বেছে নিতে বলা হয়, তারা চাকরি কে বেছে নেয় কারন তারা এটা বুঝতে পারে না যে, ব্যবসার মাধ্যমে আরারে অনেক চাকরি দেওয়া যায়”। এরপরও যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, ব্যবসা নাকি চাকরি করবো? তাদের উদ্দেশ্য বলবো, আপনার যেটা তালো মনে হয় আপনি সেটাই করবেন। বেকারত্বের অবসান ঘটাতে নতুন নতুন উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন। বার্বিশের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে বেকারত্বের প্রতিবন্ধকতা দূর করা অতীব জরুরী। আসন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর করতে কারিগরি শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারিগরি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমেও বেকারত্ব হ্রাস করা সম্ভব। কারিগরি শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নতুনত্বের ছোঁয়ায় আধুনিক করতে হবে। ফ্লাফলস্বরূপ প্রত্যেক ছাত্রাত্মী এক একটা বিষয়ে দক্ষ হতে পারবে এবং কঠিন পরিস্থিতিতেও উদ্যোগী হয়ে দেশ ও জাতির সম্মান বৃদ্ধি করতে পারবে।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।



# স্বপ্নের পদ্মা সেতু ও আমাদের পর্যটনশিল্পে -মারফ হোসেন

সব বাধা পেছনে ফেলে স্বপ্নের পদ্মা সেতু আজ বাস্তব রূপ নিয়েছে। পদ্মা সেতু নিয়ে আমরা গবিত। দ্রু মনোবল আর ইচ্ছাশক্তি থাকলে যে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়, বাঙালি সেটা আবার প্রমাণ করে দেখাল। একসময় এ দেশকে ‘তলাবিহীন বুড়ি’ আখ্যা দেয়া হলেও পদ্মা সেতুর মতো বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আমরা দেখাতে সক্ষম হয়েছি যে, ‘আমরাও পারি।’ পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী টানেল ও মেট্রোরেল প্রকল্প বাংলাদেশের সক্ষমতাকেই তুলে ধরে। স্বপ্নের পদ্মা সেতু এখন স্পন্ন নয়, বাস্তব। এ সেতু দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় নবাদিগন্ত উন্মোচন করবে। মানুষ অল্প সময়ের মধ্যে রাজধানী ঢাকায় আসতে পারবে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ যোগাযোগে পিছিয়ে থাকলেও স্বপ্নের পদ্মা সেতু তাদের আশা-আকাঞ্চা পূরণে ভূমিকা রাখবে। এতদিন এ অঞ্চলের মানুষের রাজধানীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় ফেরিই ছিল একমাত্র ভরসা। বৈরী আবহাওয়ায় ফেরি চলাচল অনেক সময় ব্যাহত হতো। ফেরিতে করে ক্ষেত্রের যত্নে ফলানো শস্য, ফলমূল ও শাকসবজি রাজধানীতে পৌঁছানো ছিল কষ্টসাধ্য ও দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। দক্ষিণ অঞ্চলে পর্যটনশিল্পের অপার সন্তান থাকলেও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না হওয়ায় পর্যটনশিল্পও তেমন এগোয়নি। কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত, বরিশাল, দীপ জেলা ভোলা, মোংলা বন্দর, পায়রা বন্দর, সুন্দরবনসহ দক্ষিণের চিন্তাকর্ষক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোয় যেতে পর্যটকদের পোহাতে হয় দুর্ভোগ। এখন স্বপ্নের পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে পর্যটকরা সহজেই এসব চিন্তাকর্ষক স্থানে পৌঁছাতে পারবে। ফলে এগিয়ে যাবে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পর্যটন। দেশের অর্থনীতি হবে বেগবান। বেকারত্বের হার কমে আসবে। পদ্মা বহুমুখী সেতু শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থায় নবাদিগন্ত উন্মোচন করবে না, পর্যটনশিল্পের পালে বইবে পরিবর্তনের হাওয়া। পদ্মা সেতু জাদুঘর হবে পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ। এখানে পদ্মা অববাহিকা ও দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত নানা প্রজাতির প্রাণীর নমুনা রাখা হচ্ছে, যা পর্যটকদের মানসিক প্রশান্তির পাশাপাশি নতুন কিছু দেখার ও শেখার সুযোগ করে দেবে। অন্যদিকে পদ্মার ইলিশ খাওয়ার স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে দেশি-বিদেশি পর্যটকরা। পদ্মাপাড়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগের আনন্দ পর্যটকদের বারবার এখানে নিয়ে আসবে।

পদ্মার দুই পাড়ে এরই মধ্যে গড়ে উঠেছে হোটেল, মোটেল, রেস্টুরেন্টসহ নানা স্থাপনা। এখনকার মানুষের চিন্তায় লেগেছে পরিবর্তনের হাওয়া। অনেকে পর্যটনে বিনিয়োগের স্পন্ন দেখছে। শুধু স্থানীয়রা নয়, প্রবাসী বাংলাদেশিরাও বিনিয়োগে আকৃষ্ট হচ্ছে। স্বপ্নের পদ্মা সেতু দেখার জন্য দূরবূর্ত্ত থেকে পর্যটকরা আসছে। অনেকে ব্যক্ত সময় থেকে সময় বের করে পরিবার-পরিজন নিয়ে এখানে এসে ছবি তুলছে, ঘুরে-ঘুরে চারদিকের দৃশ্য উপভোগ করছে, যা আগমী দিনগুলোয় পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক পর্যটন সন্তানাকেই সামনে নিয়ে আসে। পদ্মা সেতু শুধু দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ নয়, পুরো দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈশ্বিক পরিবর্তন আনবে। বিপুল কর্মসংহান সৃষ্টির পাশাপাশি দারিদ্র্যের হারও কমে যাবে। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে দেশমাত্কা।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্রিজ বা সেতুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে পর্যটন। নদীর পাড়ে সময় কাটাতে যে কারোই ভালো লাগে। নদীর পাড়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য পর্যটকদের মনে আনে প্রশান্তি। তাই তো উৎসবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ব্রিজগুলো বর্ণিল আলোকসজ্জায় সজ্জিত হয়ে ওঠে। স্বপ্নের পদ্মা সেতুও আলো ছড়াবে বিশ্ববাসীর হন্দয়ে। পদ্মা সেতুকে ধিরে পর্যটনশিল্পে রয়েছে অমিত সন্তান। তবে এ সন্তান কাজে লাগাতে এগিয়ে আসতে হবে সবাইকে। পর্যটন মন্ত্রণালয়কে নিতে হবে সুষ্ঠু পরিকল্পনা, যাতে এখানে একটি পর্যটনবান্ধব পরিবেশে গড়ে ওঠে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক পর্যটন অনেক দূর এগিয়ে নেবে। তাই সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থা ও দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে হবে। বিশেষ করে তরুণ উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে সুযোগ করে দিতে হবে। ঘন্টার পর ঘন্টা ফেরির অপেক্ষায় থাকতে হবে না ঘরমুখী মানুষকে। দুদের সময় তাদের পোহাতে হবে না দুর্ভোগ। পদ্মার দুই পাড়ের মানুষের মধ্যে তৈরি হবে মৈত্রীবন্ধন। পদ্মা সেতু নিয়ে মানুষের আগ্রহের শেষ নেই। পুরো জাতি এখন তাকিয়ে আছে স্বপ্নের পদ্মা সেতুর দিকে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোয় চোখ বুলালে পদ্মা সেতুর প্রতি বাঙালির অক্তিম ভালোবাসা আর আবেগ চোখে পড়ে। প্রতিদিন অসংখ্য দর্শনার্থী ভিড় জমাচ্ছে পদ্মার দুই পাড়ে। শুধু পদ্মার পাড়ে ভিড় জমানো নয়, বিভিন্নভাবে স্বপ্নের পদ্মা সেতুর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করছে মানুষ। সম্প্রতি দুই তরুণ-তরুণী পদ্মা সেতু উদ্বোধনের দিন বিয়ে করবে বলে ঘোষণা করেন। পদ্মা সেতু বাস্তবে রূপ নেয়ায় দেশের পর্যটন সন্তান বেড়েছে বহুগুণ। পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক পর্যটন এগিয়ে নিতে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে তা হলো, পরিকল্পিত পর্যটন গড়ে তোলা। পর্যটকদের জন্য যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা। অবকাঠামো তুলতে গিয়ে সেতু বা সেখানকার পরিবেশ যেন বিনষ্ট না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি। পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক পর্যটন যেন পরিকল্পিত পর্যটন হয়। দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ যোগাযোগে দীর্ঘদিন পিছিয়ে থাকলেও এবার তাদের অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার সময় এসেছে। অনেকেই পেশা বদল করে পর্যটনশিল্পে আসতে আগ্রহ দেখাচ্ছে। এ শিল্প লাভজনক হওয়ায় মানুষ পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক পর্যটনকে কাজে লাগিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার পথ খুঁজছে। এক্ষেত্রে সবাইকে অর্থ উপর্যুক্ত সুযোগ করে দিতে হবে। স্বপ্নের পদ্মা সেতু শুধু দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের ভাগ্যবদল নয়, এটি দেশের সার্বিক অর্থনীতির চেহারা বদলে দেবে- এমনটাই প্রত্যাশা।

লেখকঃ

সদস্য; বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।



# শেহাবির চড়ুইভাতির উল্লাসে বসন্ত বিলাস

## জান্নাতুল ফেরদৌস আঁখি

“একটি দিনের মুছলো স্মৃতি, ঘুচল চড়ুইভাতি, / পোড়াকাঠের ছাই পড়ে রয়, নামে আধার বাতি “

চড়ুইভাতির অপার্থিব সৌন্দর্যের বর্ণনা পাই রবীন্দ্রনাথের চড়ুইভাতির কবিতার মাধ্যমে। কিন্তু আধুনিকতার উৎকর্ষতার বেগে হারিয়ে যেতে বসেছে চিরায়ত গ্রামীণ ঐতিহ্যটি। চড়ুইভাতি শব্দটি শহরের ছেলে-মেয়েদের অনেকের কাছে অজানা থাকলেও গ্রামের পাড়া মহল্লার প্রায় সবাই এটা সম্পর্কে জানে। গ্রামের সাথে চড়ুইভাতির একটি আত্মিক সম্পর্ক বিরাজমান। বিশেষ করে, বর্তমান প্রজন্ম যেটাকে বনভোজন বলে অবগত আদতে সেটাই এককালীন চড়ুইভাতি নামে পরিচিত।

পরিকল্পনা ছিল অনেকদিন আগ থেকে গ্রাম্য আবহে প্রতিবারের মতো একটি চড়ুইভাতি আয়োজন করা হবে কিন্তু বিশ্বব্যূগী করোনা মহামারীর তাওবলীলায় তা হয়ে উঠলো না। অবশেষে, দীর্ঘ অপেক্ষার পর নেত্রকোণা শহরের অদূরে অবস্থিত শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের উদ্যোগে ক্যাম্পাসেই হয়ে গেল বাংসরিক চড়ুইভাতি।

ইংরেজি বিভাগের জনপ্রিয় শিক্ষক ও সহকারী প্রফেসর জনাব সাফি উল্লাহ স্যারের নির্দেশনায় আয়োজন করা হয় মনোমুক্তির এই উৎসব।

দিনটি ছিলো ০১/০৩/২০২২ তারিখ, সকাল ১০ টায় ক্যাম্পাস উপস্থিত হই। ক্যাম্পাস থেকে আমাদের সাথে যোগ দেন শ্রদ্ধেয় সাফি উল্লাহ স্যার। স্যারের আগমনে আমাদের আনন্দের মাত্রা বহুগুণ বেড়ে যায়। আমাদের চড়ুইভাতি দুটি পর্বে বিভক্ত ছিল। স্যারের অনুমতি নিয়ে আমরা শুরু করি। শুরুতেই ছিল মেয়েদের পিলো পাসিং। সামিয়ানার কাপড়ে তৈরি বালিশ দিয়ে খেলা শুরু হলেও বিজয়ী নির্ধারণে সৃষ্টি মধুর দন্দ। যাতে প্রিয় মায়মুনা পলি আপু বিজয়ী হন। ইতিমধ্যে শুরু হয়ে যায়, ছেলেদের বেলুন ফাঁটানো। নিজের বেলুন শূন্যে তুলে কিংবা লুকিয়ে রেখে অন্যের বেলুন ফাঁটানোয় কি মজা তা চোখে না দেখলে বুঝা মুশকিল। ছেলেদের মোরগ লড়াই খেলাও ছিল দেখার মতো। তারপর, সিনিয়র বনাম জুনিয়র গানের লড়াই ছিল অনন্য অসাধারণ। মূহূর্তের মধ্যে এক অন্য রকম আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। গানের লড়াই শেষ হতে হতেই দুপুরের খাবার চলে আসে। সত্যি বলতে, খেলাধুলায় আমরা এতেটাই মগ্ন ছিলাম যে খাওয়া দাওয়া করার কথা আমাদের মনেই ছিল না।

সম্পূর্ণ গ্রাম্য আবহে রান্না করা হরেক রকম খাবার আমরা যখন ত্রুটিসহ কারে খাচ্ছিলাম তখন ছোটবেলার অনেক স্মৃতিই মনে পড়ে। খাওয়া দাওয়া পর্ব শেষ হলে কিছুক্ষণ বিবরিতি দিয়ে আবার শুরু হয়। এই পর্বটির শুরুতে ছিলো প্রতি বিতর্ক যার বিষয়বস্তু ছিল স্বামী হিসাবে টেকো ধনী অপেক্ষা সুদর্শন বেকাররই শ্রেয়। পাশাপাশি আরো ইভেন্টের মধ্যে ছিল পিছু ঘুরি লেখা চুরি, ইভেন্ট আনর্যাপিং, মেয়েদের জল ডাঙা, ছেলেদের ইট ভাঙা, র্যাফেল ড্র ও চিরকুটের লেখা অনুযায়ী অভিনয়।

সূর্য মামা পশ্চিম আকাশে লাল আভা ধারণ করে জানান দেন দিন শেষ এবার শেষ করো। সারাদিনের পরিশেষে সূর্য মামা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেও ক্লান্তির কোনো ছাপ ছিল না আমাদের চোখে মুখে। “মাঠের সীমাহীনতা ও বাতাসে সামিয়ানার চঞ্চলতা একদম তুচ্ছ হয়ে পড়েছে এক বাঁক তরঙ্গের উচ্চলতার কাছে। এই তরঙ্গের জয় হোক, মনে ও মননে, চিন্তা ও চেতনায়, এবং সবথানে।” এই বলে শ্রদ্ধেয় জনাব সাফি উল্লাহ স্যার চড়ুইভাতির আনন্দানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন। স্যারের কথাগুলো হৃদয়ে ধারণ করে প্রত্যেকেই ফিরে যাই আপন নীড়ে।

মূলত, গ্রামীণ পরিবেশের সেই ছোটবেলার চড়ুইভাতি আজ প্রায় বিলুপ্ত প্রায়। বনভোজন তথা পিকনিক বা শিক্ষা সফরের ভিত্তে চড়ুইভাতির মতো উৎসব পাওয়া দায়। তরঙ্গ প্রজন্মের গ্রামীণ সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে পল্লির চিরায়ত অংশ চড়ুইভাতির আসল রূপ, সৌন্দর্য, তাৎপর্য তুলে ধরা উচিত বৈকি। এতে করে, বাঙালির ঐতিহ্য রক্ষা ও ইতিহাসের পাতাস স্মরণীয় হয়ে থাকবে বহুকাল ব্যাপী।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়



# প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গটির কেন এত উচ্চ মূল্য ফারহানা নওশিন তিতলী

পিরিয়ড বা ঝাতুচক্র নারীদের অন্য সব শারীরবৃত্তীয় কাজের মতোই অতি সাধারণ একটি বিষয়। নিয়মিত ঝাতুচক্র একজন নারীর সু-স্বাস্থ্যের অন্যতম পরিচায়ক। কিন্তু এই একুশ শতকে এসেও এটি নিয়ে আমাদের দেশে যে রাখাক, তা পরিস্থিতিকে অনেকাংশে শোচনীয় করে রেখেছে। এই বিষয় নিয়ে লুকোচুরির কারনে গ্রামাঞ্চলের বেশিরভাগ নারীকে স্বাস্থ্যবুকি পোহাতে হয়। শহরাঞ্চলে নারীদের ঝাতু চক্রের বিষয়টি কিছুটা স্বাভাবিকে পরিণত হলেও গ্রামাঞ্চলে বেশিরভাগ মানুষের কাছে এটি নিষিদ্ধ বস্তু বললেই চলে। প্রত্যেক মাসের একটা নির্দিষ্ট সময় নারীদের পিরিয়ড কেন্দ্রিক নানা রকম প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্যানিটারি প্যাড নারীদের এক অতিপ্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ।

তবে এই প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গটি এখনও বেশিরভাগ নারীদের নাগালের বাইরে। স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি প্যাডের ব্যবহার শুধু আর্থিকভাবে সচ্ছল নারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রাস্তিক জনগোষ্ঠীর নারীদের কাছে স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার রীতিমতো বিলাসিতার পর্যায়ে পড়ে। স্যানিটারি প্যাডের অতিরিক্ত মূল্যে স্বাস্থ্য বুকিতে রয়েছে দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ নারী। একজন নারীর প্রতি মাসে কমপক্ষে এক প্যাকেট ন্যাপকিনের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের বাজার দরে প্রতি প্যাকেট ন্যাপকিনের মূল্য ১২০ টাকা থেকে গড়ে ১৫০ টাকা। ফলে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের নারীদেরকে প্রতি মাসে ন্যাপকিনের বাড়তি খরচ পোহাতে হিমশিম থেতে হয়। এছাড়া অনেক পুরুষতাত্ত্বিক পরিবারে নারীদের জন্য ঝাতুকালীন এই বাড়তি খারচের জন্য আলাদা কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয়না। আর পিরিয়ডকে সামাজিক ট্যাবু হিসেবে বিবেচনা করায় অনেক পুরুষ এমনকি অনেক নারীরাও জানেননা পিরিয়ড কালীন অসচেতনতা বা অপরিচ্ছন্নতায় কত ধরণের ভয়াবহ রোগ হতে পারে। অতিরিক্ত মূল্যের কারণে ঝাতু কালীন সময়ে অনেককে পুরোনো নোংড়া কাপড় বা অস্বাস্থ্যকর তুলা দিয়েই কাজ চালাতে হয়। ফলে প্রায় ৭৩ শতাংশ নারী জরায়ু, জরায়ুমুখ ও মুগ্রেনালির সংক্রমণের শিকার হন, যা পরে ক্যানসারে রূপ নিতে পারে। আবার অনেকে এসব জটিলতার কারণে প্রজনন ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেন।

ঝাতুচক্র নিয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করতে গিয়ে গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে ওঠা অনেক নারীরা এখন পর্যন্ত জানেনই না অস্বাস্থ্যকর স্যানিটারি সামগ্রী ব্যাবহারের ফলে কতো ধরনের মারাত্মক সমস্যা হতে পারে। এই বিষয়ে আমাদের সমাজে এখনও এতটাই গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় যে বেশিরভাগ নারীরা নিজেদের মায়ের সাথেও বিষয়টি নিয়ে খোলামেলো আলোচনা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। এমনকি পিরিয়ড সংক্রান্ত কোন সমস্যায় পড়লেও তারা লজ্জায় স্বাস্থ্যকর্মী বা ডাক্তারের স্মরনাপন্ন হতে চান না।

সম্প্রতি বাংলাদেশ ন্যাশনাল হাইজিন বেসলাইন এর এক জরিপে দেখা যায়, স্যানিটারি ন্যাপকিনের উচ্চমূল্যের কারণে প্রায় ৮৬ শতাংশ নারীই ঝাতুকালীন সময়ে তা ব্যবহার করতে পারছেন। বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করছে পুরাতন কাপড় বা তুলা। আর মাত্র ১০ শতাংশ নারী স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করেন। এছাড়া বাংলাদেশে উৎপাদিত স্যানিটারি ন্যাপকিন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কি না এবিষয়ে কোনো কার্যকর গবেষণা নেই। বিদেশের গবেষণায় স্বাস্থ্যগত ক্ষতির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ না মিললেও এতে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানে স্বাস্থ্য বুকির কথা এসেছে। তাদের জরিপে আরও উল্লেখ করা হয়, দেশের ৪০ শতাংশ মেয়ে মাসিক ঝাতুচক্রের সময় মানসম্মত ও অধিক মূল্যের ন্যাপকিনের অভাবে মাসে গড়ে তিন দিন স্ফুলে যায় না। যার ফলে নিয়মিত পাঠ্যতালিকা থেকে তারা পিছিয়ে যাচ্ছে।

দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধ শতাধিক নারী। নারীদের নিত্য প্রয়োজনীয় যদি পাঁচটি জিনিসের তালিকা করা হয় তার মধ্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন অন্যতম। আমরা বিভিন্ন সময় নারী অধিকার নিয়ে আন্দোলন সংগ্রাম করি অথচ নারী স্বাস্থ্যের জন্য অন্যতম উপাদানটি থেকেই আমরা বঞ্চিত। এজন্য আমরা নারীরাই অনেকাংশে দায়ী। পিরিয়ড নিয়ে সংকীর্ণতা থেকে আমরা কখনও এই সব বিষয়ে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিনা। এক-বিংশ শতাব্দীতে সংকীর্ণতাকে রূপে দিয়ে এখন সময় এসেছে সচেতনতার। স্যানিটারি ন্যাপকিন সহজলভ্য না হলে নারীদের জরায়ুজনিত সংক্রমণ বহুলাংশে বাড়বে বলে আশংকা করছেন বিশেষজ্ঞরা। ন্যাপকিনের সহজলভ্যতা বাড়তে স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়ের সরাসরি হস্তক্ষেপ করা উচিত। ন্যাপকিন কোনো বিলাস পণ্য নয়, এটা নারীর অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। নারীর শারীরবৃত্তীয় কারণে যেহেতু স্যানিটারি ন্যাপকিন একটা অত্যাবশ্যকীয় পণ্য, তাই যতেটা সম্ভব এর দাম ক্রেতাদের নাগালের মধ্যে রাখতে হবে। স্যানিটারি ন্যাপকিনে সরকারি ভ্যাট ট্যাক্স কমানোর পাশাপাশি বেসরকারি কম্পানিগুলোকে সামাজিক দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে কম খরচে মান সম্পর্ক ও আরামদায়ক স্যানিটারি প্যাড সরবরাহ করতে হবে। গ্রাম পর্যায়ে ঝাতুচক্র নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। পিরিয়ড কালীন পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যাবহারে উৎসাহিত করতে হবে। নোংড়া কাপড় বা তুলা ব্যাবহার করলে কি কি ধরণের রোগ হতে পারে সে বিষয়ে সরকারি বেসরকারি এনজিওর মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। নারীর জন্য নিয়মিত ঝাতুচক্র সুহাত্তার অন্যতম বাহক এই বার্তাটি সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। পিরিয়ড সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য প্রাথমিকেই পাঠ্যতালিকাভূক্ত করা উচিত। এতে শিশুকাল থেকেই প্রত্যেকে শিক্ষার্থী নেতৃত্ব শিক্ষা সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে।

লেখকঃ

সদস্য; বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।



# গরমের রোজায় খাদ্য সচেতনতা

## মো. হাবিবুর রহমান

এবারে রোজা প্রায় পুরোটা এপ্রিল মাস জুড়ে। গরমে রোজা রাখা একটু কষ্টকরই বটে। কারণ প্রচণ্ড গরমের সাথে দিনের বেলায় কড়া রোদ। কিন্তু রোজার মধ্যে সারাদিনের সুস্থিতা অনেকাংশে আপনার উপরেই নির্ভর করে। সাহরিতে এবং ইফতারে সঠিকভাবে খাদ্য নির্বাচন এবং কিছু বিষয় মেনে চললে সারাদিন সুস্থিতাবেই কাটানো সম্ভব। গরমেও খুব বেশি কষ্ট লাগবে না লম্বা সময়ের এই রোজায়।

যা যা খাবেন: ১। পানি এবং তাজা ফলের জুস: গরমে সারাদিন কিছু না খেয়ে থাকার ফলে পানিশূন্যতা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই শরীর কে হাইড্রেটেড রাখার জন্য প্রচুর পরিমাণ পানি এবং প্রাকৃতিক ফলের জুস পান করতে হবে। তাই সাহরিতে প্রচুর পরিমাণে পানি পান করে নিন। প্রায় আধা লিটারের মতো পানি পান করবেন। প্রয়োজনে আরও বেশি পান করলে, কিন্তু এর চাইতে কম করবেন না। ইফতারে খেতে পারেন ডাবের পানি, আখের রস, লেবু বা বেলের শরবত কিংবা বিভিন্ন মৌসুমি ফলের জুস।

২। খেজুর: ইফতার মেন্যুতে অবশ্যই খেজুর রাখুন। খেজুর দেহের এনার্জি ধরে রাখার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি খাবার। খেজুর যে শুধুমাত্র ইফতারেই খেতে হবে এমন কোনো কথা নেই। সেহরির সময়েও কয়েকটা খেজুর খেয়ে নিতে পারেন। এতে করে সারাদিন দেহে এনার্জি পাবেন। খেজুরে আছে প্রচুর পরিমাণ পটাশিয়াম। যা আপনার মাংসপেশী কে করবে সচল এবং আপনাকে দেবে প্রয়োজনীয় পুষ্টি।

৩। কাঁচা ফল এবং সবজি: ইফতারের তালিকায় কাঁচাফল এবং সবজি রাখা অত্যন্ত জরুরী। খেয়াল রাখতে হবে যাতে মেন্যুতে সবুজ রঙের ফল এবং সবজি থাকে। এক্ষেত্রে খেতে পারেন শসা, গাজর, বরই, পেয়ারা, আনারস, তরমুজ, কমলা/মাল্টা ইত্যাদি ফল।

৪। স্যুপ: ভেজিটেবল কিংবা বোনলেস চিকেন স্যুপ হতে পারে আরেকটি স্বাস্থ্যকর আইটেম। এই ওয়েদারে গরম স্যুপ ভালো না লাগলে খেয়ে দেখতে পারেন ঠাণ্ডা স্যুপ।

৫। কম তেলে ভাজা ডিম চপ: যদি ভাজা পোড়া খেতেই হয়, তাহলে কম তেলে ভেজে খেতে পারেন ডিমের চপ। ডিমে আছে প্রচুর প্রোটিন; যা আপনার শরীর কে করবে শক্তিশালী।

৬। টক দই ও কাঁচা বাদাম: দুধের চেয়েও বেশি ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার টকদই। আর কাঁচা বাদামে আছে প্রচুর পরিমাণ গুডফ্যাট। তারাবির পরে ঘুমানোর আগে এক কাপ টক দই অথবা ১০টা কাজুবাদাম বা অন্যান্য বাদাম খেতে পারেন। টক দইয়ে থাকা ল্যাকটিক এসিড কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে। এই দই নিজে সহজে হজম হয় এবং মানুষের হজমশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। যাদের দুধ খেতে সমস্যা হয় তারা এই দই খেতে পারেন। কারণ এতে থাকা আমিষ দুধের আমিষের চেয়ে সহজে হজম হয়। তাই পরিমিত পরিমাণ টক দই, কাঁচা বাদাম আপনার সারাদিনের ক্লান্তি দূর করতে সাহায্য করবে।

৭। কলা এবং পেঁপে: ইফতার মেন্যুতে কলা এবং পেঁপে রাখুন। কলাতে আছে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক শর্করা এবং সল্যুবল ফাইবার। যা আপনাকে তাৎক্ষণিক শক্তি দেবে। হজমের জন্য পেঁপে খুব উপকারী। ইফতার শেষ করার আগে খেয়ে নিতে পারেন দুই তিন পিস পেঁপে।

যা যা খাবেন না:

১। অতিরিক্ত তেলে ভাজা খাবার: অতিরিক্ত তেল আপনার পরিপাকতন্ত্র কে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তাছাড়া বেগেনে থাকা অতিরিক্ত আয়রন, তার সাথে বেসন এবং তেলে পোড়া পিয়াজু - সারাদিন রোজা রাখার পর এ সবই আপনাকে করে ফেলতে পারে পুরোপুরি কাবু।

২। কার্বোনেটেড ড্রিঙ্কস: হজমের সমস্যা থেকে বাঁচতে এড়িয়ে চলুন কার্বোনেটেড ড্রিঙ্কস। এগুলোতে থাকে প্রচুর অ্যাডেড সুগার।

৩। লবণাক্ত খাবার: লবণাক্ত খাবার খাওয়ার ফলে সোডিয়াম লেভেলের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে বেশি বেশি পানি ত্বক্ষণ পায়। তাই যেসব খাবারে লবনের উপাদ্রিতি বেশি (যেমন: চিপস, লবণ যুক্ত বাদাম) চেষ্টা করলে সেগুলো পরিহার করতে।

৪। ক্যাফেইনড ড্রিঙ্কস: অনেকেরই সকালে কিংবা সন্ধিয়া চা-কফি পানের অভ্যাস রয়েছে। তারা রোজা রাখার কারণে সকালে চা-কফি পানের অভ্যাসটি সেহরিতেই নিয়ে আসেন; কিংবা সন্ধিয়ার অভ্যাসটি ইফতারে। কিন্তু এই কাজটি করতে যাবেন না। চা-কফির ক্যাফেইন দেহকে পানিশূন্য করে ফেলে, তাই সেহরিতে বা ইফতারে চা-কফি পান করা থেকে বিরত থাকুন। ইফতারে কফি কিংবা চা খেলে আপনার পানি পিপাসা বেড়ে যেতে পারে। এমনকি রাত্রে ভুগতে পারেন ঘুমহীনতায়।

লেখক:

সদস্য: বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

প্রকাশ তথ্যঃ

পত্রিকাঃ দ্বিমাসিক “ডাকঘর”।

তারিখঃ এপ্রিল-মে ২০২২।



## টিকটক লাইকি ও মহামারী রুখসানা খাতুন ইতি

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নতুন আতঙ্কের নাম টিকটক, লাইকি। বিনোদনের পরিবর্তে যেটি বর্তমানে সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ভিডিওতে নিজের ব্যাঙ্গাত্মক মুখভঙ্গি কিংবা রোম্য সংলাপের ঠোঁট মেলানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছে তরুন প্রজন্ম। সমাজের একটি বৃহৎ অংশ টিকটক, লাইকির অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

অ্যাপ দুটির জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে সহজলভ্যতা এবং 'তথাকথিত' তারকাখ্যাতি লাভের প্রত্যাশা। একটি স্মার্ট ফোন এবং ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেই টিকটক, লাইকি ভিডিও করা সম্ভব। এসব ভিডিও করতে খুব বেশি গতির ইন্টারনেটের প্রয়োজন হয় না। তাই শুধু শহর নয় গ্রামেও এর ব্যবহারকারী ছড়িয়ে আছে। টিকটক, লাইকি ভিডিওতে মুনাফা লাভের বিষয়টি লক্ষণীয়। লাইকিতে লাইভের মাধ্যমে আয় করার সুবিধাও আছে। যাদের ফলোয়ার বেশি এবং ভিউ বেশি তাদের আয় খারাপ না। অনেকেই মাসে ৩০-৪০ হাজার টাকা আয় করে ফেলছে শ। যার কারনে অসময়ে অর্থ প্রাপ্তির লোভে অনেক তরুন-তরুনী টিকটকের নেশায় বুদ হয়ে যাচ্ছে।

মানসম্পন্ন কিংবা মানহীন, অর্থপূর্ণ কিংবা অর্থহীন নানা কিছু নিয়ে তৈরি হচ্ছে ভিডিও। ব্যাঙ্গাত্মক মুখভঙ্গি, নাটক বা সিনেমা রাজনৈতিক বক্তব্য, ওয়াজ মাহফিল, গানের সাথে ঠোঁট মেলানো প্রভৃতি নিয়ে ভিডিও নির্মান করা হয়। কিন্তু বেগের বিষয় এই যে নিচৰ বিনোদনের জন্য তৈরি হলেও এসব আর বিনোদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ভিডিওতে প্রাধান্য পাচ্ছে যৌনতা, অশ্লীলতা। এছাড়া ট্রুল, সহিংসতাসহ নানা রকম কুরুচিপূর্ণ কটেজ। মনোযোগ আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ ভিডিও তৈরি করতেও পিছুপা হয় না এসব তরুন-তরুনীরা। মানহীন এসব কন্টেন্টের ফলোয়ার লাখ লাখ। কখনো কখনো কোটি ছাড়িয়ে যায়। পেজে ফলোয়ার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে অনেক সময় দলবদ্ধ হয়ে টিকটক, লাইকি ভিডিও করতে দেখা যায়। তরুন ও কিশোরোরা গ্যাংয়ে জড়িয়ে অপরাধমূলক কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে। হয়ে উঠছে সহিংস। টিকটকের শুটিং চলে রাজধানীর প্রায় সব বিনোদন কেন্দ্রে। বিনোদন কেন্দ্র গুলো যেনো টিকটকারদের আঙ্গুলী। বিনোদন কেন্দ্রে ঘূরতে আসা মানুষগুলোকেও টটস্ত থাকতে হয় এসব কিশোরদের ভয়ে। আগামোগো, চন্দ্রিমা উদ্যান, হাতির বিল, দিয়াবাড়ি সহ বিভিন্ন জায়গা দখল করে চলে টিকটক আর লাইকির শুটিং। অনেক সময় রাস্তার ফুটপাথ দখল করেও শুটিং চলে। শুটিংয়ে কেও বাধা দিলে এসব টিকটকাররা তাদের প্রতি হিংস্র হয়ে ওঠে। মারধর, আক্রমণ করে থাকে। শুটিংকে কেন্দ্র করে চলে অবেধ পুল পার্টি। অনেক সময় এসব শুটিংয়ের মধ্যেই চলতে থাকে অশ্লীলতা। অনেকেই না বুঝে রাতারাতি তারকা বনে যাওয়ার উদ্দেশ্য যোগ দেয় এসব গ্যাংয়ে। তারকা বানিয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ করা হয় অনেক তরুণীকে। গ্যাংয়ের কবলে পড়ে মাদকাসন্ত্বিতে আসত্ত হয়ে পড়ে অধিকাংশ তরুন-তরুনী।

টিকটক, লাইকির অন্ধকার পথে হাটছে আমাদের তরুন প্রজন্ম। তবে এ নেশা থেকে বাদ যায়নি শিশু ও বৃদ্ধারাও। নানারকম অঙ্গ-ভঙ্গি, ব্যঙ্গ করে টিকটক আর লাইকি ভিডিও তৈরির নেশায় মেতেছে তারাও। ডাঙ্কার, চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন পেশের মানুষ মেতেছেন এই নেশায়। বড় বড় তারকাদেরও দেখা মেলে এই টিকটক, লাইকি ভিডিওতে। টিকটক, লাইকি মূলত ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে প্রদর্শন করার মানসিকতার জন্য দেয়। ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে প্রদর্শন করবার মানসিকতা ব্যক্তির মধ্যে আধিপত্যকামী মনোভাবের জন্য দেয়। যেটি পরবর্তী সময়ে আমাদের সমাজে ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, বিকৃত অঙ্গ-ভঙ্গি করে যারা ভিডিও তৈরি করছে তাদের মনোযোগের উপর বিরুপ প্রভাব পড়ে। শিশু-কিশোরোরা টিকটক করার ফলে চোখ মস্তিষ্কসহ শারীরিক ব্যাধাত ঘটছে। মনোযোগ থেকে বিচ্ছুত হচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে, সুস্থ মানসিক বিকাশ না থাকাতেই ভয়ংকর পথে পা বাঢ়াচ্ছে সবাই। ইন্টারনেট দুনিয়ায় রঙিন তামাশায় মেতেছে তরুণ প্রজন্ম। যারা নেতৃত্ব দিবেন তারা অসুস্থ হয়েই বড় হচ্ছেন। এই অসুস্থ গোষ্ঠী কিভাবে বাংলাদেশ বা বিশ্বের নেতৃত্ব দিবে? টিকটক লাইকির অবস্থান অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু পারিপার্শ্বিকভাবে এখনো প্রাথমিক অবস্থানেই আছে। সরকার যদি এই জায়গা থেকে এখনো পদক্ষেপ না নেয় সামনে দেখা যাবে কয়েকবছরের মধ্যে আচরণগত অসুস্থিতায় পরিনত হবে। প্রযুক্তিবিদদের শঙ্কা, আভারগ্রাউন্ডে এসব প্রযুক্তি বিকাশের ধারাবাহিকতায় আরো খোলস বদলাবে। এমতাবস্থায় দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী। এর করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পেতে

রাষ্ট্রীয় ও পারিবারিকভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। ব্যক্তিগত সক্ষমতা এবং কঠোর আইনের প্রয়োগ করতে হবে। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে পারিবারিক সচেতনতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষুল কলেজ কিংবা পার্কে গিয়ে পরিবারের আড়ালে টিকটক, লাইকি ভিডিও করে থাকে। যার কারনে পরিবারের কিছু করার থাকে না। অপরদিকে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির উদাসীনতার কারনে রোধ কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। নিষিদ্ধ বন্ধুর প্রতি আকর্ষণ সব সময়ই থেকেই যায়। পারিবারিক সচেতনতা বা সরকারের পদক্ষেপের ফাঁকফোকার দিয়ে অনেকেই প্রযুক্তির এই ফাঁদের দিকে পা বাঢ়াবেন। ইতিপূর্বে কয়েকবার নিয়ন্ত্রণের কথা বললেও তা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। তাই দরকার সমূলে উৎপাটন। ভারতসহ কয়েকটি দেশ এসব অ্যাপের ক্ষতিকর দিক বিবেচনা করে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। আমাদের তরুন প্রজন্মকে রক্ষা করতে এবং সামাজিক অবক্ষয় রোধে টিকটক, লাইকি সরকারিভাবে বন্ধ করে দেওয়া এখনকার সময়ের দাবি।

লেখকঃ

সদস্য; বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।



# কর্মসংস্থান তৈরি ; নতুন অর্থবছরের চ্যালেঞ্জ

## খাইরুল ইসলাম

বাংলাদেশে অর্থ বছর শুরু হয় জুলাই থেকে শুরু করে পরের বছর জুন পর্যন্ত। প্রতি বছর জুন মাসের শুরুর দিকে জাতীয় সংসদ ভবনে বাজেট উপস্থাপন করা হয় এবং তা মাস ব্যাপি আলোচনা করে জুলাই মাসের ১ তারিখ থেকে কার্যকর হয় যা পরবর্তী ১ বছর অর্থাৎ জুন ৩০ তারিখ পর্যন্ত কার্যকর থাকে। জাতীয় বাজেট একটি দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক দলিল। সাধারণভাবে বলতে গেলে বাজেট হলো একটি নির্দিষ্ট সময় সীমার জন্য আয় ও ব্যয়ের প্রাক্কলন। বাজেট যে শুধু সরকারই তৈরি করে তা নয়; ব্যক্তি, পরিবার, ব্যবসায়ী, দেশীয় বা বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান অথবা অন্য কোনো সংগঠনেরও হতে পারে। পরিবারের উপার্জন অনুযায়ী খরচ মেটানোর জন্য যেমন বাজেট তৈরি করা হয়, তেমনি দেশের উন্নয়নও পরিচালনার জন্য সরকার বাজেট তৈরি করে থাকেন। দেশের বাজেট এক বছরের জন্য করা হয়ে থাকে।

গত ৩ জুনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮৭ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের পক্ষে মাননীয় অর্থমন্ত্রী আ. হ. ম. মুস্তফা কামাল জাতীয় সংসদ ভবনে ৫০ তম (অন্তবর্তীকালীন সহ ৫১ তম) বাজেট উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশের প্রথম (১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে) বাজেটের আকার ছিল মাত্র ৭৮৬ কোটি টাকা যা ২০২১-২২ অর্থবছরে বেড়ে দাঢ়িয়েছে ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকায়। যা দেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ বাজেট।

২০১৯ সালের শেষদিকে চীমে করোনাভাইরাসের উৎপত্তি হলে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই এ ভাইরাস ইউরোপ-আমেরিকাসহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ৮ মার্চ ২০২০ বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের প্রথম রোগী ধরা পড়ে। ক্রমান্বয়ে এ ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে থাকলে মার্চ মাসের শেষ দিক থেকেই সরকার দেশে ছুটি ও লকডাউন ঘোষণা করে। এতে থমকে যায় দেশের অর্থনীতির চাকা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সব ধরনের কলকারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষনা করা হয়। অনেকেই কর্মসংস্থান হারান। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি বলছে, ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মে'র মধ্যে সাধারণ ছুটির সময় বাংলাদেশের তিনি কোটি ৬০ লাখ মানুষ কাজ হারিয়েছেন। বিআইডিএসের সাম্প্রতিক জরিপে বলা হচ্ছে, করোনায় এক কোটি ৬৪ লাখ মানুষ নতুন করে গরিব হয়েছে এবং তারা দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে। তাই এখন দেশে গরিব মানুষের সংখ্যা পাঁচ কোটির বেশি। ১৩ ভাগ মানুষ ফরমাল সেক্টর থেকে চাকরি হারিয়েছেন। অনেক পরিবার তাদের আয়ের মেরুদণ্ড হারিয়ে ফেলেছেন। অনেক পরিবার রাজধানী ঢাকা শহর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। করোনা প্রভাবের কারণে কর্মকর্তা ছাটাই করেছে অনেক শিল্প কারখানা। আমরা এমন অনেক কে দেখেছি যারা পরিবারের সকল সদস্য নিয়ে রাজধানী ঢাকাতে সুথে শাস্তিতে বসবাস করতো, কিন্তু করোনা মহামারির কারণে চাকরি হারিয়ে সেসব পরিবার প্রায় নিঃস্ব হয়ে রাজধানী ঢাকাতে বাধ্য হয়েছেন। অনেকে জীবনের শেষ দিকে চাকরি হারিয়ে হতভস্ব। করোনাকালে দরিদ্রের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়েছে। নতুন এক দরিদ্র শ্রেণির উভব হয়েছে যাদের বলা হয় ‘নব দরিদ্র’। বিশ্বের ব্যাপার হলো, মানুষের শহর থেকে গ্রাম মুখী হওয়া, যা আগে কখনো দেখা যায়নি। অর্থনীতি সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. আবুল বারকাত আয়বৈষম্যের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা ভয়ংকর কিছুর ইঙ্গিত দেয়। করোনার আগে আমাদের আয়বৈষম্য নির্দেশক গিনি সহগের মান ছিল ০.৪৮। মাত্র চার মাসে তা বেড়ে দাঢ়িয়ে ০.৬৬ তে। (উল্লেখ্য গিনি সহগের মান ০ থেকে ১ পর্যন্ত হতে পারে)। বর্তমানে আমরা সবচেয়ে বড় আয়বৈষম্যের দেশ। অর্থাৎ একদিকে একদল গরিব আরো গরিব হচ্ছে অপরদিকে ধনী শ্রেণিরা আরো সম্পদের পাহাড় ঘরে তুলছে।

তাছাড়া বেকারত্ব সমস্যা আমাদের দেশের একটি মারাত্মক সমস্যা। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেও পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান এর অভাবে অনেকে বেকারত্ব বরণ করে নিতে বাধ্য হন। করোনা মহামারির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণে অনেক শিক্ষার্থী অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাপিত হচ্ছে। যারা চাকরি হারিয়েছেন এবং যারা পড়ালেখা শেষ করে চাকরির বাজারে প্রবেশ করবে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করায় হবে নতুন অর্থবছরের চ্যালেঞ্জ।

আমাদেরও হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। নিজে উদ্যোগ হয়ে যাতে আরো কয়েকজনের কর্মসংস্থান তৈরি করা যায় সেই চেষ্টা করতে হবে। মৎসজীবী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরামর্শ দিয়েছেন যুব সমাজকে লেখাপড়া শিখে মাছের খামার করে স্বাবলম্বী হওয়ার। যাতে দেশের মানুষ খাদ্য ও পুষ্টি হীনতায় না ভুগে।

বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভর দেশ। বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর - এই কথা বর্তমানে জোর দিয়ে বলা না গেলেও কৃষি এখনও এ দেশের অর্থনীতির প্রধান খাত। জিডিপিতে প্রতিবছরই কৃষি খাতের অবদান ১৫.৫৯ শতাংশ কিন্তু এ খাতে নিয়োজিত আছে ৪৫ শতাংশ শ্রমশক্তি। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল দেশের ৭৫ ভাগ মানুষ। তাই কৃষিকে বলা হয় বাংলাদেশের প্রাণ। কৃষক বাঁচলে বাঁচবে দেশ। কৃষির উন্নতি হলে দেশের উন্নতি হবে। জিডিপিতে প্রতি বছর কৃষির অবদান কমলেও প্রতি বছর বাড়ছে কৃষির প্রবৃদ্ধি ও কৃষি উৎপাদন। গত তিনি বছর ধরে কৃষিতে প্রতি বছর গড়ে ৪.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অব্যাহত আছে। কৃষি শস্য উৎপাদনে এই প্রবৃদ্ধি ৫.৬ শতাংশ। প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় বাজেটে কৃষি খাতের জন্য বরাদ্দ অনেক কম। এসব গুরুত্বপূর্ণ খাতে সরকারের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে একদিকে যেমন অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে অপরদিকে কৃষির খাত গুলোতে আত্ম-কর্মসংস্থানের প্রবণতা অনেক বেড়ে যাবে।

লেখকঃ

সদস্য; বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।



## প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের পথে অন্তরায় ও করণীয় মাইন উদ্দীন হাসান

বিটিশদের অধীনে ২০০ বছর এবং পাকিস্তানের অধীনে ২৪ বছর পার করে, পরাধীনতার শেকল ভেঙে স্বাধীন সুখ পানে আমাদের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার ৫০ বছর পূর্ণ হলো। তবে স্বাধীনতা অর্জনের অর্ধশত বছরে এসেও কি আমরা বলতে পারি, আমরা প্রকৃত স্বাধীন? স্বাধীনতা মানে দেশকে শুধু দৃষ্টিক্ষেত্রে কবল থেকে ছিনয়ে আনা নয়। স্বাধীনতা মানে দেশকে সব আগ্রাসন থেকে রক্ষা করা। স্বাধীনতা মানে সুশাসন, গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা এবং মুক্তিচিন্তার দুয়ার খুলে দেয়া। অথচ স্বাধীনতার অর্ধশত বছরে পদার্পণ করেও পূর্ণ স্বাধীনতা এখনো প্রশ্নবিদ্ধ রয়েই গেল।

স্বাধীন দেশের একজন নাগরিকের অধিকার থাকে আত্মসমালোচনা ও আত্মোপলক্ষ্মি। কিন্তু এই আত্মসমালোচনা এবং আত্মোপলক্ষ্মির জায়গাটুকুতে আমাদের সমাজ কতখানি নিশ্চিন্ত। স্বাধীনতার মূলমন্ত্র সাম্য, মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক ন্যায়বিচার স্বাধীনতার অর্ধশত বছরে এসে কটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে। আমরা মুখে গণতন্ত্রের বুলি আওড়ালেও পরাধীনতার শেকল গলায় ঝুলানো। গণতন্ত্র সাধারণ নাগরিকের কাছে আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে একটি রাষ্ট্র সব নাগরিকের স্বাধীনতা এবং মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য গণতন্ত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা বাস্তবায়িত হওয়ার সামান্যতম লেশমাত্র আমাদের মাঝে নেই। সীমাবদ্ধ থেকে গেছে গুটিকয়েক বিস্তারণী ও ক্ষমতাবান লোকের কাছে। স্বাধীন দেশে বসবাস করা সত্ত্বেও প্রকৃত স্বাধীন হতে পারেনি দেশের সাধারণ মানুষ। পরাধীনতার গানি স্বাধীনতার ৫০ বছরেও কুরে কুরে খাচ্ছে আমাদের।

সামাজিক বৈষম্যের কালো থাবা চারদিকে বিরাজমান। যেখানে প্রত্যেক নাগরিক অধিকার রাখে সুস্থুভাবে সমাজে বেঁচে থাকার। কিন্তু সেখানে তৈরি করে দেয়া হয়েছে ধনী-গরিব নামের মহাপ্রাচীর। যেখানে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে গরিব শ্রেণির মানুষের। যা সমাজে নির্বিঘে বসবাস করার অধিকারটুকু কেড়ে নিছে। এছাড়া রয়েছে দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, প্রশ্ফাঁস, নেতৃত্বাত্মক অবক্ষয়- যা একের পর এক স্বাধীনতা অর্জনের মহান পথে অন্তরায় হিসেবে দাঁড়িয়েছে।

### ছাত্রসমাজের করণীয়

ছাত্রসমাজ যে কোনো অধিকার আদায়ে সচেষ্ট। যার চিত্র আমরা দেখতে পাই '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-এর ৬ দফা আন্দোলন, '৭১-এর স্বাধীনতার সংগ্রাম, '৯০-এর বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, ২০১৮ সালে কোটাবিরোধী ও নিরাপদ সড়কের দাবিসহ সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে। ছাত্রসমাজ জাতির চালিকাশক্তি। ছাত্রসমাজকে রুখে দিতে হবে সব অন্যায়-অত্যাচার। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে আদায় করে নিতে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের পথ। যেভাবে তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল '৫২-এর ভাষা আন্দোলনে। উদ্রূকে যখন পাকিস্তানিরা বাঙালির ওপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল, তখন বলিষ্ঠ কর্তৃ ছাত্রসমাজ দাঁড়িয়ে যায় প্রতিবাদে। পরবর্তীতে এই আন্দোলনই স্বাধীনতা অর্জনের পথ সুগম করে দিয়েছিল। ভাষা আন্দোলন ছিল ছাত্রসমাজের অনুপ্রেরণার উৎস। এদেশ আর পেছাতে পারে না, যে কোনো মূল্যে এগিয়ে যেতে হবে। যেখানে ছাত্রসমাজের ভূমিকা বাঞ্ছনীয়।

ছাত্রসমাজকে কাজ করতে হবে সমাজ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সব অনিয়মের বিরুদ্ধে। একজন ছাত্রের প্রথম কাজ হবে নিজেকে জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ, সৎ চরিত্বাবান, মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। কথায় আছে, পৃথিবীকে গড়তে হলে সবার আগে নিজেকে গড়। দ্বিতীয়ত, দেশ এবং সমাজের সব প্রতিকূল পরিহিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেয়া। তৃতীয়ত, ছাত্রাজনীতির মাধ্যমে নিজের মাঝে প্রতিবাদী মানসিকতা ফুটিয়ে তুলতে হবে এবং শিক্ষাজ্ঞের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে ছাত্র-শিক্ষকের মাঝে সৌহার্দপূর্ণ মানসিকতা তৈরি করতে হবে। ৪৮তম, সবার মাঝে এক্য প্রতিষ্ঠা করা। প্রবাদ আছে 'দশের লাঠি, একের বোবা'। যদি এক্যবন্ধ প্রতিরোধ ছাত্রসমাজ গড়ে তুলতে পারে, তাহলে কোনো অপশক্তি তাদের পথ অবরুদ্ধ করে রাখতে সক্ষম হবে না। পরিশেষে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের পরিপূর্ণতার পথে আমাদের সীমাবদ্ধতাগুলো বের করে, তা আদায়ের জন্য ছাত্রসমাজকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এবং প্রকৃত স্বাধীনতা সেদিনই আকাশে ডানা মেলে উড়বে, যেদিন ছাত্রসমাজ এক্যবন্ধের মাধ্যমে উপরোক্ত বিষয়গুলো নিজ জীবনে প্রতিফলন করতে পারবে। জয় হোক প্রজন্মের, জয় হোক ছাত্রসমাজের। বাঙালির জাতিসত্ত্বার বিকাশ নতুনভাবে প্রস্ফুটিত হোক ছাত্রসমাজের হাত ধরেই। ছাত্রসমাজের আরেকটি ঐতিহাসিক অর্জন সূচিত হোক, যে অর্জনটি হবে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের বাধা মোকাবিলায়।

### লেখকঃ

সদস্য; বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।



# শিক্ষিত মানুষ বাড়ছে, তবু কেন সমাজের ভাঙ্গন হোসনেয়ারা খাতুন

একসময় মানুষ পড়তে জানত না, লিখতে জানত না। সাইনবোর্ড, বিলবোর্ডে কী লেখা আছে, বোঝার ভাষা ছিল না। তবু মানুষের মনে ছিল না প্রতারণার এত ফন্দিফিকির। গরমের দিনে বড় গাছতলাটায় বিকেল হলেই পাটি বিছিয়ে সবাই জড়ে হয়ে কাঁথা সেলাই থেকে শুরু করে নানা গল্পে মাতিয়ে তুলত দখিনা বাতাসকে। আবার শীতকালে দু-চার বাড়ির লোকজন এক জায়গায় জড়ে হয়ে সকালে রোদে বসে খাবার খেতে ভুলত না। কে কী রান্না করেছে, তা পরখ করতে একটু বিলম্বও হতো না। কেউ রাগ বা হিংসা অনুভবও করত না। লিখতে-পড়তে বুঝাতে না পারা এসব মানুষ কতই-না সহজ-সরল ছিল। কেউ কাউকে ঠকানোর, কাউকে কষ্ট দেওয়ার মনোভাব পুষে রাখত না। স্বল্পশিক্ষিত ছেলেটি প্রেমিকাকে একনজর দেখে শুভ প্রেমে হারিয়ে যেত।

এখন মানুষ পড়তে শিখেছে, লিখতে শিখেছে! বইয়ের পাতা, খাতার পাতা হেঁড়ে লিখতে শিখেছে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার, লিংকডইন, টুইটার ইত্যাদি সামাজিক মাধ্যমে। বাংলিশ, ইংলিশ-সব রকমের লিখতে শিখে গিয়েছে। সঙ্গে রঞ্জও করে ফেলেছে একাধিক নারী বা পুরুষে কীভাবে আসত্ত থাকা যায়। এখন আর সেই অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত ছেলে বা মেয়েটির মতো একনজর প্রিয়কে দেখে শুভতার প্রেমে হারিয়ে যাওয়ার লেশ নেই। সময় পালিতেছে, যুগ পালিতেছে। সহজেই মানুষকে সব রকম ফাঁদে ফেলার কৌশল রঞ্জ করছে মানুষ। বাড়ছে বিবাহবিছেদের ঘটনা।

বোধগম্য একজন মানুষ ছোট বাচ্চাদের দিয়ে শেখাচ্ছে অপরাধপ্রবণতা। বাচ্চারা জড়িয়ে পড়ছে নানা রকম অপকর্মে। তৈরি হচ্ছে কিশোর গ্যাং। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে হয়ে গিয়েছে একক পরিবার। বলা হয়ে থাকে, এখন নাকি মানুষ এক-দুজনও এক ছাদের নিচে একসঙ্গে বসবাস করতে পারছে না। মা-বাবা বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসা থেকে শুরু করে রাস্তাঘাটে ফেলে আসার ঘটনা অহরহ ঘটছে। বাচ্চারা আজকাল খেলাধুলা ভুলেই গিয়েছে স্মার্টফোন ও গ্যাজেটের আসক্তিতে। অধিকাংশ মা-বাবাও কান্না থামাতে বা খাবার খাওয়াতে শিশুদের হাতে গ্যাজেট তুলে দিচ্ছেন।

দুর্নীতি, ধর্ষণ, অন্যের অর্থ আত্মসাংস্কার, সরকারি ত্রাণ দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিতরণ না করা, ক্ষমতাধর ব্যক্তির পরিচয়ে নানা জায়গায় নানা সুবিধা হাসিল ইত্যাদি আজকাল সমাজের রঞ্জে রঞ্জে বিস্তার করছে। বিয়েকে কঠিন করায় বাড়ছে অবৈধ সম্পর্ক। সেখান থেকে ঘটছে অপহরণ, ধর্ষণ, আত্মহত্যা, খুন ইত্যাদি জঘন্য ঘটনা। ক্ষুক, শ্রমিক, মজুর পাচ্ছেন না ন্যায্য মূল্য। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, সিভিকেটের জাঁতাকলে পিষ্ট আজ সমাজ।

অনেকে এগুলোর পেছনের কারণ হিসেবে শিক্ষাকে দায়ী করে থাকেন। তাঁরা ধারণা পোষণ করেন, মানুষ যত শিক্ষিত হচ্ছে, তত ছলচাতুরী আর প্রতারণা শিখছে। আসলে কি শিক্ষাই দায়ী আজকের এই সমাজের মানুষের নানা প্রতারণার কৌশল রঞ্জ করা ও সমাজভাঙ্গনের এই নির্মম বাস্তবতার জন্য? না, শিক্ষা নয়, বরং সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, নীতিনৈতিকতার অভাবের কারণে আজ সমাজে নানা অসুখের তীব্রতা বেড়েছে। যে অসুখে সমাজ, জাতি, দেশ পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। সমাজের কোথাও কেউ আজ ভালো নেই। ভালো নেই আমাদের বাবা-মায়েরা। সন্তানকে বাইরে পাঠিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারছেন না তারা। সমাজের এই ভাঙ্গন দূর করতে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর কোনো বিকল্প নেই। বাড়াতে হবে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা। সব ধর্মেই ভালো কাজের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মূল্যবোধের অবক্ষয় দূর করতে সভা ও সেমিনার করতে হবে, বাড়াতে হবে সচেতনতা। যোগ্য ও সৎ লোককে দায়িত্বশীল স্থানে বসাতে হবে। তবেই সমাজভাঙ্গনের এই তীব্র অসুখ দূর করা সম্ভব হবে। অন্যথায় সমাজে অপকর্মের হার বেড়েই চলবে।

লেখকঃ

সহ সভাপতি; বাংলাদেশ তরঙ্গ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।



## শব্দযন্ত্রের যন্ত্রণা বন্ধ হোক

### আর এস মাহমুদ হাসান

দেশজুড়ে পৌরসভা নির্বাচনের তৃতীয় ধাপে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কোডিড-১৯ মহামারীর মধ্যে এবার কয়েক ধাপে সম্পন্ন হচ্ছে এবারের পৌর নির্বাচন। দেশে মোট পৌরসভা সংখ্যা ৩২৯টি। প্রথম ধাপে ২৮ ডিসেম্বর ২৫টি ও ১৬ জানুয়ারি দ্বিতীয় ধাপে ৬১টি পৌরসভায় নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। তৃতীয় ধাপে ৬৪ পৌরসভায় নির্বাচন হবে ৩০ জানুয়ারি। চতুর্থ ধাপে ৫৮ পৌরসভায় ১৪ ফেব্রুয়ারি এবং বাকি পৌরসভা গুলোর মধ্যে পঞ্চম ধাপে ৩১টি পৌরসভায় নির্বাচন হবে ২৮ ফেব্রুয়ারি।

এই নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে প্রতিদিন উচ্চ শব্দে মাইকের ব্যবহার করছে প্রার্থীরা। প্রার্থীদের প্রচারণায় থাকা অটোরিকশা, ভ্যানগাড়ির চালকেরা বেলা দেড়টার পর থেকে তাদের বাহনে মাইক বেঁধে প্রচারণার প্রস্তুতি নিতে থাকে। বেলা ২ টা বাজার সাথে সাথেই প্রার্থীদের বিভিন্ন সর্বনথকেরা শুরু করে মাইকিং প্রচারণার প্রতিযোগিতা। চলে রাত ৮টা পর্যন্ত। অনেক সময় আবার নির্বাচন উপলক্ষে প্রার্থীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলে সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত যেখানে ব্যবহার হয় উচ্চ শব্দে মাইক ও সাউন্ড সিস্টেম। যার কারণে পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটা, রাতের ঘুম নষ্ট হওয়া, মাথাব্যাখ্যাসহ জনজীবনে মারাত্মক নেতৃত্বাচক প্রভাব পড়ছে। জনগণের ভালো-মন্দ যারা দেখভাল করবেন, তাদেরই প্রচারণার বিকট শব্দে বিরক্ত এখন পৌরবাসী।

মাইকের বিরক্তিকর শব্দ মানুষের জন্য ব্যাপক ক্ষতিকর। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে এই মাইকের ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে, অথচ আমাদের দেশে যেখানে-সেখানে যত্নত্ব এটির ব্যবহার হচ্ছে। অনেক সময় একই সড়কে অটোরিকশা বা ভ্যানে একাধিক মাইক লাগিয়ে বিভিন্ন প্রার্থীর প্রচারণার মাইক আসে। এই সময় অনেকে মাইকিং এর অতিরিক্ত শব্দ সহ্য করতে না পেরে দুই হাত দিয়ে কান চেপে বা কানে আঙুল দিয়ে থাকেন।

শুধু তাই নয় রাস্তার পথকুর গুলি ও যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পেতে ওই সময়টুকু পালিয়ে বেড়ায়। মাইকের শব্দে যেন কান ঝালাপালা হয়ে যাওয়া অবস্থা। যন্ত্রণাদায়ক শব্দের কারণে মুঠোফোনে কথা বলা সহ দৈনন্দিন কাজকর্মেও বিঘ্ন ঘটছে। উচ্চ স্বরের প্রচারণায় আশেপাশে থাকা আমজনতা, ব্যবসায়ীদের দৈনন্দিন কাজ, মসজিদ, মন্দির, হাসপাতাল, ক্লিনিক, অফিস, ব্যাংকের নিয়মিত কর্মকাণ্ডেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পাশ দিয়ে যানবাহন চলার সময় মাইক বাজানো নিয়ন্ত্রণ হলেও তা মানা হচ্ছে না। আর এসব কারণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে পৌর এলাকার সাধারণ মানুষ।

অতিমাত্রায় শব্দ দূষণে সবচেয়ে বেশি স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে অসুস্থ, বয়স্ক ও শিশুরাসহ হার্ট, কান ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত রোগীরা। সহনীয় মাত্রার চেয়ে অতিরিক্ত শব্দ মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতির কারণ। মায়ের গর্ভে থাকা সন্তানও শব্দদূষণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, এমনকি তাদের শ্বেগশক্তি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া শিশুর বেড়ে ওঠা ও মেধার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় শব্দদূষণে। মাত্রাতিরিক্ত শব্দদূষণে শ্বেগশক্তি লোপ, উচ্চ রক্তচাপ, আলসার, মাথাধৰা, খিঁটখিঁটে মেজাজ, বিরক্তি বোধ, অনিদ্রা, চোখে কম দেখা, হৃদরোগ, বাধিরতা প্রভৃতি রোগে মানুষ ভুগে। শব্দদূষণ সর্বোপরি শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর বিভিন্ন ধরনের নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলে।

**শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ)** বিধিমালা, ২০০৬-এ নীরব, আবাসিক, মিশ্র, বাণিজ্যিক ও শিল্প এই পাঁচ এলাকা চিহ্নিত করে শব্দের মানমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিধিমালায় নীরব এলাকায় দিনে (ভোর ছয়টা থেকে রাত নয়টা) ৫০ ডেসিবেল ও রাতে (রাত নয়টা থেকে ভোর ছয়টা) ৪০ ডেসিবেল, আবাসিক এলাকায় দিনে ৫৫, রাতে ৪৫ ডেসিবেল, মিশ্র এলাকায় দিনে ৬০, রাতে ৫০ ডেসিবেল, বাণিজ্যিক এলাকায় দিনে ৭০, রাতে ৬০ ডেসিবেল ও শিল্প এলাকায় দিনে ৭৫, রাতে হবে ৭০ ডেসিবেল শব্দের মানমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এ শব্দের মাত্রা এর চেয়ে বেশি হলে অর্থাৎ মানুষের সহনীয় মাত্রা অতিক্রম করলে তাকে ‘শব্দদূষণ’ বলে গণ্য করা হয়। বিধিমালায় শব্দের মানমাত্রা অতিক্রম না করার শর্তে মাইক, অ্যাম্পিফিয়ার ব্যবহার করতে হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেয়ারও বিধান আছে।

আইন অনুযায়ী হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি নির্ধারিত কিছু প্রতিষ্ঠান থেকে ১০০ মিটার পর্যন্ত এলাকাকে নীরব এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব এলাকায় মোটরগাড়ির হর্ন বাজানো বা মাইকিং করা সম্পূর্ণ নিষেধ। আইন অমান্য করলে প্রথমবারে অপরাধের জন্য একমাস কারাদণ্ড বা অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড এবং পরবর্তী অপরাধের জন্য ছয়মাস কারাদণ্ড অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এসব আইনের প্রয়োগ তেমন দেখা যায় না। ফলে শব্দদূষণে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না।

এছাড়া নির্বাচনী প্রচারণা ছাড়াও প্রতিদিন প্রতিনিয়ত শব্দ দূষণ হয়েই চলেছে। যেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে উচ্চ শব্দে গাড়ির হর্ন (বিশেষ করে ট্রাকের হাইড্রোলিক হর্ন), উৎসব, বিয়ে, মেলা উপলক্ষে বেশি সাউন্ড দিয়ে গান বাজানো, বাজি ফাটানো, মিছিলে বা

খেলার মাঠে একসাথে অনেক মানুষের কোলাহল, বোমা বিস্ফোরণ, কলকারখানায় বিভিন্ন যন্ত্রের বিকট শব্দ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডিইউএইচও) মতে, ৬০ ডেসিবল মাত্রার শব্দ মানুষকে অঙ্গায়ী বধির এবং ১০০ ডেসিবল মাত্রার শব্দ মানুষকে স্থায়ীভাবে বধির করে পারে। অনবরত ৬০ ডেসিবলের বেশি শব্দ শুনতে থাকলে তা মাথার পক্ষেও যথেষ্ট ক্ষতিকর, দীর্ঘক্ষণ বেশি সাউন্ড শুনলে মাথা ব্যাথার সৃষ্টি হয়। অপরিনত শিশুর চেতনার উপর আঘাত হানে ও তার সুস্থ মনকে বিপর্যস্ত করে। শব্দের দূষণ শুধু মানব সমাজের উপরই খারাপ প্রভাব ফেলে তা নয়, অন্যান্য প্রাণীদের জন্যও শব্দ দূষণ মারাত্মক ক্ষতিকর। বন্য পরিবেশে শব্দ দূষণ প্রাণীদের অবাধ বিচরণ, শিকারের অসুবিধা, পাখিদের প্রজননে অসুবিধার সৃষ্টি করে।

তাই সবকিছু বিবেচনায় রেখে মাইকিংয়ের সাউন্ড সীমিত করে দেয়া হোক। যেকোনো শব্দ সহনীয় মাত্রায় রাখতে শব্দের দূষণ বক্ষে প্রশাসনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ জরুরি, প্রয়োজনে মোবাইল কোর্টসহ কঠোর নজরদারির ব্যাবস্থা নিতে হবে। দোকানে, ফুটপাথে বিরতি উৎপাদনকারী শব্দের উৎসও বন্ধ করতে হবে। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে জনতা ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরের দায়িত্বশীলদের উদাসীনতা দূর করতে হবে। তবে সবচেয়ে জরুরি হলো সামাজিক সচেতনতা। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন রয়েছে, দেশের একজন আদর্শ নাগরিক হিসেবে আমাদের আইন মেনে চলতে হবে। তাহলে শব্দ দূষণের সমস্যা অনেকাংশেই সমাধান সম্ভব। সব ধরনের দূষণ নির্মূল হোক এটাই কাম্য।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশ তথ্যঃ  
পত্রিকাঃ ইত্তেফাক।  
তারিখঃ ২৬ জানুয়ারি ২০২১।



# বিশ্বজুড়ে মার্কিন প্রভাবের আদ্যপাত্ত আতিকুর রহমান

১৪৯২ সালে স্পেনের রানী ইসাবেলার অনুদান আর জাহাজে করে বের হয়ে পড়ে ইতালির নাবিক কলম্বাস। কলম্বাস ভারত আবিষ্কার করতে গিয়ে ভূলক্রমে পৌঁছে যান ওয়েষ্ট ইন্ডিজ এলাকায়। সেখানে কলম্বাসরা আদিমবাসীদের গনহত্যায় মেতে উঠে। তাদের সাথে ইউরোপ থেকে পৌঁছে যায় ম্যালিরিয়া ও বসন্তের জীবাণু। এই জীবাণুতে আক্রান্ত হয়ে কয়েক বছরের ব্যবধানে ৯৫% আদিবাসী বিলুপ্ত হয়ে যায়। জায়গা দখল করে নেয় ইউরোপ থেকে আসা নাগরিকরা। এক পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। বৃটিশদের অত্যাচার, বৈষম্য নীতির ফলে সেখানকার অধিবাসী স্বাধীনতার ডাক দেয়। ১৭৭৬সালের ৪ এ জুন জর্জ ওয়াশিংটন এর নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভ করে আজকের আমেরিকা। স্বাধীনতার পর থেকেই দেশটি তাদের সমস্ত কাঠামো গোচানের প্রতি মননিবেশন করে। দেশের রাজনীতি, সামরিক, অর্থনীতির উন্নয়নে বিশেষ করে দৃষ্টি দেয়। ফলে অল্প কিছু দিনেই তারা সফলতার মুখ দেখে। হয়ে উঠে শক্তিশালী এক রাষ্ট্র। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তাদের শক্তির জানান দেয়। নিজেদের প্রভাব, প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন দেশকে কজায় টেনে আনতে সক্ষম হয়। হয়ে উঠে একক শক্তিশালী এক রাষ্ট্র। আমেরিকার এই প্রভাবনীতি আলোচনা করলে তিনটি জিনিস সামনে আসে। যার মাধ্যমে তারা নিজেরা শক্তিশালী হওয়ার সাথে সাথে অন্য দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এক রাজনীতি দুই। অর্থনীতি তিনি। সামরিকনীতি।

যেকোন দেশ নিজে শক্তিশালী হওয়ার সাথে সাথে অন্য রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চাইলে এই তিনি জিনিসের উন্নয়নের বিকল্প নেই।

আমেরিকা এই বাস্তব সত্য অনুধাবন করে বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। আমেরিকার প্রভাবনীতিগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। রাজনীতিঃ একটা দেশ শক্তিশালী হওয়ার জন্য শর্ত হলো দেশের অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব, কলহ মিটিয়ে দেয়। আজ সারা পৃথিবীতে গনতন্ত্রের নামে সংঘাত, বাগড়া সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু আমেরিকাতে কোন দ্বন্দ্ব, সংঘাত নেই। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে আইন পাশ করেছে যে একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ দুইবার প্রেসিডেন্ট পদে দাঢ়িতে পারবে। চাই সে বিজয়ী হোক বা পরাজিত হোক, যোগ্য নেতৃত্বের গুণাবলি থাকুক বা না থাকুক দুইবারের পর দাঢ়িনোর সুযোগ নেই। ফলে দেশের রাজনীতির সংঘাতের পথ অনেকটাই কমে গেছে। সাম্প্রতিক ডেনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতা ছাড়া কে উপলক্ষ করে হোয়াইট হাউজে হটগোল আমেরিকার রাজনীতিকে কল্পিত করেছে। অনেক বিশেষজ্ঞ ডেনাল্ড ট্রাম্প কে মানসিক রোগী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে আমেরিকার ভূমিকা হলো। অর্থাৎ অপেক্ষা করো, দেখো তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে আমেরিকা প্রথম দিকে যোগ দেয়নি। শেষের দিলে যোগদান করে। মার্কিন বিরোধী অনেকে আমেরিকার এই ভূমিকাকে ‘মাখন খাওয়ার চেষ্টা’ হিসেবে দেখেন। যদিও এ সুযোগটা জার্মানই করে দিয়েছিলো। আক্ষ শক্তি ও মিত্র শক্তি উভয়ের উপর প্রভাব রাখার জন্য প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর লীগ অব নেশনস এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের প জাতিসংঘ গঠন করে। এ ছাড়াও অনেক যুদ্ধে আমেরিকার এই নীতি লক্ষ করা যায়।

সামরিকনীতিঃ একটা দেশ শক্তিশালী হওয়ার জন্য সামরিক উন্নয়ন আবশ্যিক। আমেরিকা স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই সামরিক উন্নয়নের প্রতি জোর দিয়েছে। দক্ষ সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌ বাহিনী, গোয়েন্দা বাহিনী গঠন করার প্রতি মনযোগ দেয়। ফলে আমেরিকার সেনাবাহিনীকে মনে করা হয় বিশেষ দক্ষ সেনাবাহিনী। আর তাদের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ কে মনে বলা হয় সবচেয়ে শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা। ইসরায়েল এর আমান, মোসাদ এবং ভারতের “র” এর অবস্থানও তাদের নিচে। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে আজ অবধি যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে আমেরিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত।

১৯৮৯ সালে রুশ- আফগান যুদ্ধে আমেরিকা আফগানদেরকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার অর্থ ও অস্ত্রের সহযোগিতা করেছে। আরব- ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইল কে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছে। ইরাক- কুয়েত যুদ্ধে অর্থ, সৈন্য, অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছে। বিশেষ সামরিক প্রভাব বজায় রাখার জন্য ন্যাটো সহ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক জোট গঠন করেছে। বিভিন্ন দেশ, দ্বীপে সামরিক ঘাটি স্থাপনের নামে সারা বিশ্বের উপর নজরদারী করেছে।

অর্থনীতিঃ একটা দেশ অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হলে অন্যন্যা দিক দিয়ে শক্তিশালী হওয়া যায়। আমেরিকা রাজনৈতিক, সামরিক উন্নয়নের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নেও বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে। ফলে নিজ দেশের অর্থনীতির উন্নয়নের পাশাপাশি বিশ্ব অর্থনীতিতে রেখেছে নিজস্ব প্রভাব। অস্ত্র, ক্রষি, পর্যটন খাতে আয় করছে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার। অস্ত্র ব্যবসায় গড়ে তুলেছে পৃথিবী জুড়ে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক। বর্তমানে আমেরিকার অস্ত্রের বড় আমদানিকারক মধ্যপ্রাচ্য।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ এর পর অর্থনৈতিক মান্দাতার মুখে পড়ে আমেরিকার অর্থনীতি। ফলে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রঞ্জিভেল্ট এর নীতি অনুসরন করে মান্দাতা কাটিয়ে অবিশ্বাস্য সফলতা অর্জন করে।

লেখকঃ

সদস্য; বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।



# পর্নোগ্রাফির ভয়ংকর ছোবল

## মো. আবুসাইদ

মানুষের সামন্য অজানা ভুল তার পুরো জীবনেকে ধ্বংস করে দেয়। এই ভুলগুলো আবার মানুষকে চরমভাবে আর্কষিত করে, সৃষ্টি করে কৌতুহল আর লালসার। ম্যাজিকের মতো নিমিষেই লঙ্ঘণ করে দেয় সাজানো গুছানো স্বপ্নবাজ একেকটি সুন্দর জীবন। এমনই এক নীরব গতিশীল ব্যাধি হচ্ছে পর্নোগ্রাফি। নীরব এই ঘাতকের খঙ্গরে পরছে সকল ধর্মের, সকল বয়সের মানুষ। বিশেষজ্ঞদের মতে বর্তমানে সুস্থ ও সুন্দর জীবনধারণের জন্য পর্নোগ্রাফি বিরাট বাঁধা হয়ে দাঢ়িয়েছে। পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত ব্যক্তির পরিবর্তন হয় স্বাভাবিক জীবন ধারা। পাল্টে দেয় শারীরিক ও মানসিক চাহিদা। সামাজিক সার্বজনীন অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে এসব অশ্লীল বিষয়বস্ত। এতে আসক্ত ব্যক্তি শুধু নিজের ক্ষতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। ক্ষতি করে পরিবারের, সমাজের, দেশের তথা সম্পূর্ণ পৃথিবীর। একজন পর্ন ভিডিও আসক্ত ব্যক্তির চরিত্রের মধ্যে লোপ পেতে থাকে মূল্যবোধ, নৈতিকতা, হিতাহিত জ্ঞান। ফলে জড়িয়ে পরে হত্যা, শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ, মানবপাচার, অজাচার, আত্মহত্যা এবং মাদকে। এই মারাত্মক কন্টেন্ট বন্ধের জন্য গৃহীত সকল অন্তর্হ ব্যর্থ হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে।

যদি আমরা পর্নোগ্রাফির মূল উৎস অনুসন্ধান করি তাহলে পাবো নোংরা নাটক, সিনেমা, অশ্লীল ফেসবুক ভিডিও, চটিগল্প, উপন্যাস ইত্যাদি। এগুলো মানুষের জীবনকে চরমভাবে প্রভাবিত করে। মানুষ তার পছন্দের অভিনেতা অভিনেত্রীদের মতো পোষাক, হেয়ারকাট, খাদ্যাভ্যাস ব্যক্তি জীবনে অঙ্গ অনুকরণ করে। তাই এসব ভিডিওতে আসক্ত বিবাহিত দম্পত্তিদের মধ্যে পর্ন দের অনুকরণ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তাদের জীবনে স্বাভাবিক যৌন চাহিদা থাকে না। বিভিন্ন গবেষনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, পর্ন আসক্তির কারণে স্বামী স্ত্রীর মধ্যাকার ভালোবাসার মধ্যে ফাটল ধরে। যৌন জীবন নিয়ে তারা অসম্ভুষ্ট, অত্মিতে ভোগে। কারণ তাদের চাহিদা হয়ে যায় পাশবিক, লালিত হয় বিকৃত যৌন চাহিদা। এসকল ব্যক্তিরা ভ্রান্তধারনা নিয়ে যখন তার সঙ্গীর সাথে সময় কাটাতে যায় তখনই অঘটনটা ঘটে কারণ নীলপদ্মার অভিনেতা অভিনেত্রীদের মতো তারা শরীর খোজে কিন্তু বাস্তবটা হয় ভিন্ন। পর্ন আসক্ত পুরুষদের চাহিদা থাকে পর্ন অভিনেত্রীদের মতো আর্কফনীয় সুন্দর হবে তাদের স্ত্রীদের শরীর। নারীরাও ছেলেদের দেহ সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ধারণা করে বসে। ফলে তৃণ্ঠ হতে পারে না, শুরু হয় দাম্পত্য জীবনে কলহ, অশান্তি। ধীরে ধীরে রূপ নেয় পরকীয়া, বিবাহ বিচ্ছেদের। ধীরে ধীরে একাকিত্ব, হতাশায় নিমজ্জিত হতে থাকে। অনেকে আবেগ প্রবণ হয়ে আত্মহত্যার মতো ভংকর পথ বেছে নেয়। অনেকেই পর্ণকে বাস্তব মনে করে। বোবো না এগুলো কল্পকাহিনী থেকে কম নয়। এসব নোংরা মুভির অভিনেতাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ পতঙ্গ এডিটিংয়ের মাধ্যমে বাস্তবের চেয়ে বড় আকারে আর্কফনীয়ভাবে দেখানো হয়। তারা দীর্ঘ দিন শুটিং করে কয়েক মিনিটের একটা ভিডিও বানায়। কিন্তু দর্শকদের এটা বুঝতে চায় না। ফলে নষ্ট হয়ে যায় একটা ফুলের মতো সংসার। আমেরিকান সোসিওলজিক্যাল এসোসিয়েশন এর গবেষনাপত্র অনুযায়ী, বিবাহিতদের মধ্যে যারা পর্ন আসক্ত, তাদের বিবাহ বিচ্ছেদের আশঙ্কা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি। আমেরিকায় শতকরা ৫৬ টি বিবাহ বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ সঙ্গীর পর্ন আসক্তি। এটা এমন একটি ভয়াবহ ঘাতক যা ঘুনে পোকার মতো ভিতরে ভিতরে সমাজের সবকিছু নষ্ট করে দেয়। একটা তরতাজা সদ্য প্রাইমারি স্কুলের গাছ থেকে বের হওয়া কিশোর কিশোরীরা পর্নের মতো জন্মন্যতম ফাঁদের শিকারে পরিণত হয়। মোবাইলের মেমোরিকার্ডে ভর্তি থাকে অশ্লীলতা। সারা রাত এসবে মগ্ন থাকে যা সরাসরি প্রভাবিত করে ছাত্রজীবনকে। ক্লাস ও পড়াশোনাই অমনোযোগী হয়। তারা ধীরে ধীরে হয়ে যায় নির্লজ্জ। উচ্চস্বরে পর্ন ভিডিও ছেড়ে বাস্তবীদের বিরক্ত করে, তাদের কে অশোভন ইঙ্গিত করে। পাশের বাসায় আন্তি কে দেখে শিষ মেরে বাজে ইঙ্গিত করে। নিজের কাফিনকে কু-প্রস্তাব দেয়।

প্রস্তাবে রাজি না হলে চেষ্টা করে ধর্ষণের। এগুলো মূলত এই ১২ বছরের কিশোর ছেলেটি শিখল কিভাবে। তার তো থাকার কথা ছিল খেলার মাঠ দাপিয়ে বেড়ানোর। অপেক্ষায় থাকার কথা ছিল কখন বিকাল হবে। কখন বন্ধুদের সাথে ঘুড়ি উড়াবে। কিন্তু কেন এমন বিপথে যাচ্ছে জাতির আগামী প্রজন্ম। তার একটাই কারণ তা হচ্ছে পর্ন ভিডিও। এগুলো দেখে বেড়ে ওঠা এসব ছেলে মেয়েরা যৌনতা সম্পর্কে অবাস্তব ধারণা নিয়ে বড় হয়।

ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ স্টুডেন্টস এর এক জরিপ থেকে তথ্য উঠে এসেছে যে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে শতকরা ৬০ জন যৌনতা সম্পর্কে পর্ন ভিডিও দেখেছে। বাংলাদেশে ২০১৭ সালে অষ্টম শ্রেণির কিছু ছাত্রছাত্রীর উপর চালানো একটি জরিপে দেখা গিয়েছিল যে, শতকরা ৭৬ জন শিক্ষার্থীদের ফোন আছে। বাকিরা বাবা-মার ফোন ব্যবহার করে ৮২ শতাংশ সুযোগ পেলে মোবাইলে পর্ন দেখে। ক্লাসে বসে পর্ন দেখে ৬২ শতাংশ। এটা ছিল ২০১৭ সালের কথা আর এখন ২০২২। করোনার প্রকোপে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনস্বার্থে বন্ধ করতে বাধ্য হয় সরকার। শিক্ষার্থীরা যেন ঝারে না পরে তার জন্য শুরু হয় অনলাইন ক্লাস। ফলে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন পরে ইন্টারনেট, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন। অনেক সচেতন অভিভাবকরাও এসব ডিভাইস কিনে দিতে বাধ্য হয়। এজন্য বলা যায় বাংলাদেশের এখন শতভাগ শিক্ষার্থী মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। বাসায় রাতের অন্ধকারে, স্কুলের টিফিনের বিরতিতে, পাড়ার অলিগলিতে নিরাপদে ইন্টারনেট এসব অশ্লীল ভিডিও দেখেছে।

২০০৮ সালে জার্মানির একদল গবেষক জানান, পর্ন আসক্তি ছাত্র-ছাত্রীদের অ্যাকাডেমিক পারফরম্যান্সের উন্নয়নে বড় একটা বাধা। পর্ন ভিডিও দেখে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনায় ফাঁকিবাজি শুরু করে। ক্লাস পালায়, ঠিকমতো অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেয় না। কারণ তার ভিতরে সবসময় একটা যৌন উদ্দীপনা কাজ করে। তার আর অন্য কোন কাজ করতে ভালো লাগে না। ফলে রেজাল্ট খুব খারাপ হয়। ফলশ্রুতিতে দেখা যায় তার সাথে বন্ধুবন্ধুর মিশতে চায় না, বাবা-মা, আত্মীয় স্বজনরা চাপ সৃষ্টি করে। শুরু হয় হতাশা, একাকিত্ব ও

অস্থিরতা। জীবনে ভর করে জটিলতা, তৈরি হয় মন খারাপের সু-উচ্চ প্রাসাদ। একাকিন্ত দ্র করতে হাতে তুলে নেয় সিগারেট, মদ-গাজা, ইয়াবা, হিরোইন বাদ যায় না কিছুই। আবার এসব নেশান্দের অর্থের যোগান দিতে জড়িয়ে পরে অপরাধ জগতে। তাই বলা যায় অসামাজিক সকল কার্যকলাপের সাথে জড়িত সকল অপরাধের প্রভাবক হলো পর্ণগাফি।

শুধু অপরাধ সৃষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, পর্ণ অনুকরণীয় ব্যক্তির আক্রান্ত হয় মারাত্মক যৌনরোগে। যেমন; প্রসাব ও মলত্যাগের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে, গলায় ক্যন্সার, আক্রান্ত হচ্ছে এইডস রোগে। তরুণ তরুণীরা ভুগেছে অস্থিরতা, উদ্বেগ আর বিষমতায়। সমাজের এই জটিল অসুখের বিরুদ্ধে রংখে দাঢ়াতে হবে। নিজের ছেলে-মেয়ে, বন্ধু, স্বামী-স্ত্রী ও আত্মীয় স্বজনদের উপর নজর রাখতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে যারা পর্ণ ভিডিওতে আসঙ্গ তাদের কিছু চলন চরিত্র উপস্থিতি চিহ্নিত করেছেন। যেমন: মাত্রাতিরিক্ত ইন্টারনেটের আসঙ্গ হবে, তাদের ঘুমের প্যাটার্ন বদলে যাবে, ব্রাউজারের সার্চ হিস্ট্রি মুছে দিবে, মাত্রাতিরিক্ত আইটেম সং ও মিডিজিক ভিডিওর প্রতি আর্কফন জন্মাবে, একাকী থাকার চেষ্টা করবে এবং লজ্জাহীন ও অসামাজিক হয়ে উঠবে। যদি এগুলোর উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় তাহলে বুঝে নিতে হবে সে পর্ণ আসঙ্গ। সেক্ষেত্রে করনীয় হলো তাৎক্ষণিকভাবে তাদের কে কাউন্সিলিং ও মনিটরিং করতে হবে। তাদের কে পর্ণ ভিডিওর ভয়ংকর ক্ষতিকর প্রভাবগুলো সম্পর্কে জানাতে ও বুঝাতে হবে। তাঁদের সাথে মিশতে হবে তাদের মনের কথা গুলো শুনতে হবে। এই পর্ণ ভিডিওর বিরুদ্ধে সমাজের সচেতন, সুশীল, শিক্ষিত এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের অগ্রণী ভূমিকায় এগিয়ে আসতে হবে। আর যদি এসবের বিরুদ্ধে রংখে দাঢ়ানো না যায় তাহলে অটীরেই দেশ সমাজিক ব্যবস্থা ধসে পড়বে, পারিবারিক কাঠামো ভেঙে পড়বে। প্রচলিত মূল্যবোধ, রীতিনীতি, সন্মান, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা সবকিছুই বিলীন হয়ে যাবে। সবখানে হবে নষ্টদের জয়জয়কার।

লেখকঃ

সদস্য; বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।



# পানিতে ডুবে অকালমৃত্যু রোধে সচেতনতা আব্যশক নাসরিন সুলতানা হিরা

পানিতে ডুবে অকালমৃত্যু কারোই কাম্য নয়।

বিশ্বসাঙ্গ সংস্থার তথ্য বলছে, প্রতিবছর ৩ লাখ ৫৯ হাজার ৪০০ জন ব্যক্তি পানিতে ডুবে মারা যান। এদের ২০ শতাংশের বয়স পাঁচ বছরের কম। এ জন্যই “বিশ্বজুড়ে পানিতে ডুবে মৃত্যুকে” নীরব মহামারি” হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশে ১ থেকে ৪ বছর বয়সী শিশুদের মোট মৃত্যুর ৬৭ শতাংশের জন্য দায়ী পানিতে ডুবে যাওয়া। পানিতে ডুবে মৃত্যুর ১০ ভাগের এক ভাগ ঘটে নৌ দুর্ঘটনায়। এছাড়াও ইউনিসেফের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিবছর গড়ে ১৭ হাজার শিশু পানিতে ডুবে মারা যায়। এ মৃত্যু সংখ্যা বিশেষ সর্বোচ্চ।

বর্ষা এলেই এই দুর্ঘটনার হার যেন বেড়ে যায়। এর কারণ হিসেবে বিষেজ্ঞরা বলেছেন, এই অঞ্চলে প্রলম্বিত বন্যা ও জলাবদ্ধতার কারণেই এতো পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। চারিদিকে বিভিন্ন ধরণের প্রচুর জলাশয় পুরু, নদী, খাল, বিল। গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, শহরের চেয়ে গ্রামে পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যুর হার বেশি, অধিকাংশ শিশুই বাড়ি থেকে ২০ মিটার এবং কম বয়সীরা ১০ মিটার দূরত্বের কোনো পুরু বা জলাশয়ের মধ্যে পড়ে মারা যায়। পরিবারের ক্ষেত্রে উপর সঠিক নজরদারির অভাবে এমন করণ পরিণতি দেখা যায়। সংখ্যায় বলতে গেলে, পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যুর ঘটনার ৬০ শতাংশ ঘটনা সকাল নয়টা থেকে বেলা একটা মধ্যে হয়ে থাকে। কারণ এ সময় মাঝেরা ব্যস্ত থাকেন গৃহস্থালি কাজে, বাবারা কাজের তাগিদে বাইরে থাকেন এবং ভাই বোন থাকলে তারা হয়তো স্কুলে থাকেন।

এ সমস্যা রোধে ইউনিসেফ ও কয়েকটি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ‘সুইমসেফ’ নামে শিশুদের সাঁতার শেখানো একটা প্রকল্প চলছে এছাড়া এখন পর্যন্ত সারা দেশে ১০ উপজেলায় ও হাজার ২০০ টি কেন্দ্রে প্রায় ৮০ হাজার শিশুকে দিবায়তু কেন্দ্রে রাখা হয়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একজন নারী শিশুদের দেখভাল করেন। এছাড়া ও সরকার সম্প্রতি ডুবে শিশুমৃত্যু রোধে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে—“সমাজভিত্তিক সমর্পিত শিশুয়ত্ব কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশও সুরক্ষা এবং শিশুর সাঁতার সুবিধা প্রদান প্রকল্প। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সারা বিশ্বে নজর এসেছে। জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী এ বছরের ২৫ জুলাই পালন করা হয়” পানিতে ডুবে মৃত্যু” প্রতিরোধ সংক্রান্ত আর্তজাতিক দিবস। বাংলাদেশ সরকারও পালন করে থাকে দিবসটি।

বৈশ্বিকভাবে এসডিজির অন্তভুর্ত করা হলেও পানিতে ডুবে মৃত্যুর হার আশানুরূপ হারে কমছে না। অসুস্থতাজনিত কারণে শিশু মৃত্যুর হার কমানো সম্ভব করা হলেও সার্বিকভাবে শিশুমৃত্যুর উচ্চতার থেকে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে পানিতে ডুবে মৃত্যুর ৪৭ শতাংশ তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অর্থে এসব মৃত্যু রোধে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ধরণের অনাকস্তিক ঘটনা এড়ানোর জন্য কিছু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দরকার। যেমন— পুরু পাড়ে বেড়া দেওয়া, শিশুদের জন্য দিবায়তু কেন্দ্রের পর্যবেক্ষণে রাখা, সাঁতার শেখানো, পানি থেকে উদ্ধারের পরপরই শিশুদের স্বাভাবিক করতে সাহায্য করা। বাংলাদেশ সরকারের তত্ত্বাবধানে, ৪৯৩ টি উপজেলায় শিশুদের জন্য দিবায়তু কেন্দ্র চালু করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশা শিশুদের সাঁতার শেখার গুরুত্বের ওপর স্কুলের শিক্ষকরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। শিশুদের পাঠ্যপুস্তকেও ‘সাঁতার শেখার গুরুত্ব’ বিষয়ে অধ্যায় সংযুক্ত করা যেতে পারে। এছাড়া পানিতে ডুবে শিশুমৃত্যু রোধে পারিবারিক পর্যায়ে সচেতনা তৈরি ও জাতীয়ভাবে কর্মসূচি গ্রহণ করার উপর বিভিন্ন আর্তজাতিক ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বারোপ করেছে।

মনে রাখতে হবে, বর্তমান সরকার পানিতে ডুবে মৃত্যুরোধে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ঠিকই তবে শুধু সরকারি উদ্যোগে পানিতে ডুবে মৃত্যুরোধ সম্ভব নয়; তাছাড়া, পারিবারিক, সামাজিক ব্যক্তিপর্যায়ে সচেতনতা ছাড়া ও ব্যক্তিপর্যায়ে সচেতনতাহীন হলে এ মৃত্যু রোধ করা সম্ভব নয়; এক্ষেত্রে সবাই মিলে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে, যাতে শিশুরা নিরাপদে বেড়ে উঠতে পারে যেন আমরা দ্বিধাহীন সুরে বলি, “আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ”।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।



# রাজ্য যেথায় উচ্ছ্বসিত বইয়ের কল্লোলে

## শাহিদা আরবী

ভাষার জন্য প্রাণ দেওয়া বাঙালি জাতির কাছে বই বরাবরই প্রিয়। বইপ্রেমী এই জাতির কাছে ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি

মানেই যেন প্রাণের উৎসব একুশের বইমেলা। ফাগুনের বর্ণমালার প্রতি ভালোবাসা ও সৃজনের আনন্দ নিয়ে প্রতিবছরই বইমেলায় হাজির হয় হাজারো লেখক, পাঠক, প্রকাশক। লেখক আর পাঠকের এত সুন্দর সমাবেশ বইমেলা ব্যতীত আর কোথাও চোখে পড়া দুষ্কর। বাঙালির এই প্রাণের প্রাচুর্যের বইমেলায় সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় লেখকের ভাবনামালা যেন হয়ে ওঠে বিগণন পণ্য। পাঠকের হাতে উঠে আসে প্রিয় লেখকের প্রিয় বইটি। ই বুক আর অনলাইন মাধ্যম যে বইয়ের গ্রহণযোগ্যতা এতটুকু কমাতে পারেনি, বইমেলার পাঠকের আগমন সে বার্তাই জানান দেয়। প্রতিবছরই নতুন বইয়ের সংখ্যা হাজার ছাড়াচ্ছে। মাতৃভাষায় রচিত বই, আর বাঙালির অমর একুশে বইমেলাই একদিন বাংলা ভাষাকে নিয়ে যাবে অনন্য এক উচ্চতায়।

ধীরে ধীরে জমে উঠেছে এবারের অমর একুশে বইমেলা। করোনা মহামারীর কারণে সংশয় ভেঙে কিছুটা দিখা দন্ডের মধ্যেই কিছুটা অপ্রস্তুত অবস্থাতেই শুরু হয়েছে এবারের বইমেলা। ফাগুনের মিস্টি বাতাস যেন জানান দিচ্ছে আজ থেকে ৭০ বছর আগে এই বাঙালি জাতিই করেছিল ভাষার জন্য আত্মত্যাগ। আর ঠিক ৭০ বছর পরে এমনই এক অমোঘ পরিবেশে অমর একুশে বইমেলায় পদচারণা হাজারো বাঙালির। এ যেন ভাষা অর্জনের এক বিশাল সার্থকতা। বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউজ থেকে শুরু করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, বইয়ের প্রতিটি স্টলই পরিপূর্ণ বইপ্রেমীদের ভিড়ে। মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যের রস আস্বাদনে মগ্ন শিশু কিশোর থেকে শুরু করে প্রবীণরাও। বাঙালির প্রাণের স্পন্দন আর মেলার চিরচেনা পরিবেশে উচ্ছ্বসিত তাই লেখক পাঠক সকলেই। ভাষার মাসে মাতৃভাষায় রচিত বই কেনা, এ যেন ভাষা শহীদদের প্রতি শুদ্ধার জানান দেওয়া।

বাঙালির এই প্রাণের উৎসবের আরেকটি বিশেষ আকর্ষণ থাকে শিশুপ্রহর। মেলা প্রাঙ্গন মুখরিত হয় শিশুদের পদচারণায়। শিশুপ্রহরের মূল আয়োজনের অনেক আগে থেকেই ছোট শিশুরা বাবা মায়ের হাত ধরে আসতে শুরু করে মেলা প্রাঙ্গণে। করোনার এই বন্দীদশায় ক্ষুদে পাঠকদের ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস থেকে দূরে রেখে বইয়ের উৎসবে সামিল করাটা তাদের নীতি নৈতিকতা বৃদ্ধিতে অনেকটাই সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। মোবাইল, কম্পিউটারে দিনরাত আটকে থাকা চোখগুলো বইয়ের পাতায় নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ পাবে। এক্ষেত্রে শিশুদের জন্য প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা বাঢ়াতে হবে। শিশুরাও এতে আগ্রহী হবে নতুন বইয়ের প্রতি।

করোনার জরাজীর্ণতাকে মুছে দিতে আয়োজিত বাঙালির প্রাণের এই বইমেলা দেখতে দেখতে প্রায় শেষের পথে। তবুও বরাবরের মতই মেলার সময়সীমা বাড়ানোর আহবান বইপ্রেমী পাঠক, লেখক, প্রকাশকসহ বিক্রেতাদের। বইয়ের প্রতি এই আকুলতা থেকেই মেলা প্রাঙ্গনে হাজির হন হাজারো পাঠক। মুখরিত হয় বইমেলা। কেননা অবসরের সঙ্গী এই বই তো মানবমনের অঙ্ককার দূর করে আলোর পথ দেখিয়ে আসছে শুরু থেকেই। তবে বয়স অনুযায়ী বই নির্বাচনের ক্ষেত্রেও হতে হবে সচেতন। বয়সের মাপকার্টি অনুযায়ী পাঠকের হাতে উঠে আসুক রঙিন প্রচ্ছদে মোড়ানো নতুন বই। তবেই বই পাঠে উপকৃত হবে পাঠক।

প্রাণের উৎসব এই বইমেলা থাকুক চিরায়ত রূপে। বইএর প্রতি পাঠকের ভালোবাসা বইমেলার প্রাঙ্গনকে মুখরিত রাখুক আজীবন। ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস ছেড়ে বর্তমান প্রজন্ম বইয়ুক্তি হোক আগের মতন। বইয়ের লাইনে মিশে থাকা হাসি, কানার অনুভূতিগুলো মানবহৃদয় পর্যন্ত পৌছে যাক। প্রণয় থেকে প্রতিবাদী, বইয়ের লাইনগুলোর মধ্যেই পাঠক খুঁজে পাক নিজস্ব সত্তা। বিকশিত হোক মনের রাজ্য। জ্ঞানের রাজ্য থাকুক সদা পরিপূর্ণ। বই থাকুক প্রিয়জনের উপহারের তালিকায়, বই মিশে থাকুক আপন সত্তায়। উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা কিংবা খিলার সাহিত্যের সকল প্রকাশের আলো জুলে উঠুক প্রতিটি মননে। বইয়ের আলোয় উচ্ছ্বসিত হোক প্রাণ, উচ্ছ্বসিত হোক জগৎ।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা



# বন্ধুত্বে বিচ্ছেদও বয়ে আনে হতাশা

## লাইজু আক্তার

জীবন চলার পথে প্রত্যেকের জীবনে বন্ধু নামের বিশ্বাসী ও মজবুত একটি সম্পর্কের সৃষ্টি হয়ে যায়। যে সম্পর্ক কখনো লাভ অথবা ক্ষতির ভাবনায় গড়ে উঠে না। কিছু মুহূর্ত আমাদের সামনে হাজির হয়ে যায়, যেখানে বন্ধুর গুরুত্ব অপরিসীম। যার কাছে মনের সব লুকানো কথা আস্থা ও বিশ্বাসের সঙ্গে খুলে বলা যায়। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে টেনে তোলা হয় বিপৎসীমা থেকে নিরাপদ স্থানে। ভুল সিদ্ধান্তের অন্ধকার হতে ফিরিয়ে আলোকিত পথের সন্ধান দেখায়। সেই বিশ্বাসী সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিকে বন্ধুত্বের আসনে বসিয়ে তাকে বন্ধু বলা যায়। বন্ধু হতে পারে এক থেকে একাধিক। আত্মার সঙ্গে আত্মার শক্তিশালী বন্ধন হলো বন্ধুত্ব। বন্ধু হতে পারে যে কেউ। বন্ধুত্বের কোনো বয়স নেই। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সততা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, সমবেদনা, মনের অনুভূতি প্রকাশ, ভয়কে জয় করায় নির্ভরশীল সঙ্গীই হলো বন্ধু।

প্রযুক্তির কল্যাণে এখন মানুষের বন্ধুর অভাব যেমন নেই তেমনি বন্ধুত্বের সম্পর্কে বিচ্ছেদের ঘটনারও অভাব হচ্ছে না। অনেক সময় আমরা সামান্য কারণে এরকম একটা সম্পর্ককে বিচ্ছেদে মোড় দিতে একবারও ভাবি না। বন্ধুত্ব একটা ইমোশনের বড় জায়গা। যেখানে নিজেকে নিগড়ে দেওয়া যায়। এই বন্ধুত্বে হ্যাঁ বিচ্ছেদ বদলে দিতে পারে একটা জীবনের মোড়। ঘটতে পারে অনেক অস্বাভাবিক ঘটনা।

যে ব্যক্তিকে মনের সব লুকানো কথা বলে স্বষ্টি অনুভব হয়, যার সাথে কথা না বলে; আড়তা না দিলে ভালো লাগে না, সময় কাটে না সেই ব্যক্তি নামক বন্ধুটি যদি হ্যাঁ বিচ্ছেদ আনে তবে তা অপরপক্ষের জন্য হ্যাঁ হতাশার। কারো কারো জন্য সেটা হতে পারে আত্মহত্যার মতো মারাত্মক ঘটনা।

“আমার প্রিয় ব্যক্তি, আমার প্রিয় বন্ধু। যে আমার সব দুঃখের ভাগিনী। আজ সে পাশে নেই, তার হাত আমার দুঃখে আজ কাঁধে নেই। কিংবা সে আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আজ আমি বড় একা।” এরকম হতাশাজনক ভাবনা থেকে অনেকেই জীবনের রস বোধ হারিয়ে ফেলে। হয়ে যায় একাকী। আর এই একাকীত্ব দূর করার জন্য মাদক কিংবা আত্মহত্যাকে সঙ্গী করে। যা একটি সামাজিক ব্যাধি।

তাই বলব বন্ধুত্বের সম্পর্কে ইতি টানার আগে, ভাবুন আপনার বন্ধুটির কথা। সে আপনাকে ছাড়া ভালো থাকবে কি না। মানুষ বড় অভিমানী প্রাণী। অভিমানের বশে মানুষ অনেক ভুলকে সঠিক মনে করে। আপনার সাথে বিচ্ছেদে যেন ঝড়ে না যায় একটি প্রাণ। নষ্ট না হ্যাঁ একটি পরিবারের সুখ। আপনার বন্ধুটিকে ভালো রাখুন, ধরে রাখুন আপনাদের বন্ধুত্ব। ভালো থাকুক বন্ধুত্বের আসনে থাকা সকল বন্ধু।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ



# ইউপি নির্বাচন বনাম জনগণ

## জাবেদুর রহমান

নির্বাচন হচ্ছে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করার মাধ্যম। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের যোগ্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করে থাকেন। আর এ প্রতিনিধি বাছাইয়ের মাধ্যম যত স্বচ্ছ হবে, জনবাদীব প্রতিনিধি নির্বাচিত করা ততই সহজ হবে। ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। প্রত্যন্ত এলাকার উন্নয়নের উপরই দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে। সুতরাং নির্বাচন যতটা সুস্থ ও নিরপেক্ষ হবে ততই জনতার আশা ও প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটবে।

আমাদের দেশে যখন কোনো একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তখন সেটা উৎসবে পরিণত হয়। নির্বাচনের সময় যখন নির্ধারণ করা হয় তখন শহরকেন্দ্রিক মানুষ নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য নিজ বাড়ির দিকে ছুটে আসেন। পাশাপাশি দলবেঁধে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য ভোটকেন্দ্রে যান। আর এভাবেই সাধারণ জনতা নির্বাচনের আনন্দ উপভোগ করেন।

বর্তমানে দেশব্যাপী বইছে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের হাওয়া। ইতিমধ্যেই কে হবে মেম্বার? আর কে হবে চেয়ারম্যান? এই নিয়ে আলোচনায় মুখরিত হয়ে উঠেছে জনপদ। গ্রামীণ হাট-বাজার ও চায়ের দোকানে জমে উঠেছে নির্বাচনের তুমুল আলাপ-আলোচনা। এই আলোচনার মধ্যে কেউ খুঁজছেন যোগ্য প্রতিনিধি যা ইউনিয়ন পরিষদকে করবে আলোকিত। আবার কেউ খুঁজছেন কালো টাকার প্রতিনিধি যা ইউনিয়ন পরিষদকে করবে অঙ্ককার।

ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নে শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপনে, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়তে এবং উন্নতি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত করা জনগণের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। কারণ জনপ্রতিনিধিরা আমাদের মতোই সমাজের একজন সাধারণ মানুষ। কিন্তু তাদের মাঝে এমন কিছু অসাধারণ প্রতিভা বা গুণবলী আছে যা দ্বারা সমাজ এবং সমাজের মানুষকে আলোকিত করবে। এজন্যই আমরা নির্বাচনে তাদেরকে নির্বাচিত করি।

যখন আমাদের দেশে কোনো একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তখন আমরা যারা সাধারণ জনগন আছি তারা চাইলে যে কাউকে নির্বাচনে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করতে পারি। কিন্তু প্রতিটা নির্বাচনে আমরা চাই সৎ, যোগ্য, ন্যায়বান, আদর্শবান পাশাপাশি চরিত্রবান একজন মানুষ জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচনে নির্বাচিত হোক। যারা দুষ্ট, অসহায় ও দারিদ্র্য মানুষের বিপদে-আপনে সহযোগিতা করে পাশে থাকবে এবং ইউনিয়নের উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে জনপ্রতিনিধির চেয়ে জনগণের করণীয় বেশি ও গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের কিছু উল্লেখযোগ্য করণীয় আছে, যা যথাযথভাবে পালন করলে যোগ্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করতে সক্ষম হবে।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অশক্তি, অযোগ্য ও সুযোগসন্ধানী জনপ্রতিনিধিকে নির্বাচিত না করা। পাশাপাশি শিক্ষিত, সৎ, ন্যায়বান ও যোগ্যতাসম্পন্ন জনপ্রতিনিধিকে নির্বাচিত করা। যে জনপ্রতিনিধি হিসেবে যোগ্য ও সৎ, যার দ্বারা জনকল্যাণমূল্য কাজ হবে এবং যিনি জনগণের উপকারে নির্বেদিত থাকবেন, তাকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করা উচিত।

এছাড়া যোগ্য জনপ্রতিনিধিকে নির্বাচনে নির্বাচিত করতে হলে জনতাকে অবশ্যই অর্থলোভী হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। আর জনগণ যদি অর্থলোভী হয়ে কোনো জনপ্রতিনিধিকে ভোট প্রদান করে, তাহলে নির্বাচনের পরে জনপ্রতিনিধিকে কোনো জবাবদিহিতার মধ্যে রাখা যাবে না। যার ফলে জনপ্রতিনিধি তার ইচ্ছা মতো যে কোন কাজ করবে তাতে জনগণের নাগ গলামোর কোনো সুযোগ থাকবে না। সুতরাং ইউনিয়নের উন্নয়ন তথা যোগ্য জনপ্রতিনিধিকে নির্বাচিত করতে হলে অবশ্যই ভোট বিক্রি করা তথা অর্থলোভী হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নির্বাচন আসলে দুষ্ট লোকেরা ভালো মানুষের মুখোশ পড়ে জনতাকে বিভিন্নভাবে বুঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু নির্বাচনের পরে তাদের কাজে এবং কথায় কোনোটাই মিল থাকেনা। সুতরাং প্রকাশ পায় তাদের আসল চেহারা। তাই, নির্বাচনে জনতা যেন দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথায় যোগ্য জনপ্রতিনিধিকে নির্বাচিত করার পরিবর্তে অযোগ্য জনপ্রতিনিধিকে নির্বাচিত না করে সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি।

পাশাপাশি যাদেরকে নির্বাচিত করলে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলবাজি, টেলারবাজি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম বৃদ্ধি পাবে। তাদেরকে নির্বাচিত করে জনগণ তথা ইউনিয়নের উন্নয়নের জন্য বিপদ ডেকে না আন।

নির্বাচনে জনগণের সবচেয়ে বড় নাগরিক দায়িত্ব হলো জেনে, শুনে ও বুঝে জনপ্রতিনিধিকে ভোট দেওয়া। পাশাপাশি আমরা যাতে কালো টাকার খেলা, দুর্নীতি এবং অযোগ্য জনপ্রতিনিধির কাছে জিম্মি না থাকি সেদিকে খেয়াল রাখা। কারণ, নির্বাচনের দিন ভোটের মাধ্যমে যে বীজ বপন করা হয়, সেটা আমরা দীর্ঘ পাঁচ বছরের জন্য পেয়ে থাকি। সুতরাং, জেনে, শুনে ও বুঝে ভোট প্রদান না করলে, ভেটাররা খাল কেটে কুমির ডেকে আনবে। এছাড়া টাকার বিনিময়ে ভোট প্রদান করলে, পরবর্তীতে দুর্নীতি, অন্যায় ও অনিয়ম বেড়ে যাবে। আর এদেরকে নির্বাচিত করার মূল উদ্দেশ্য হবে দুর্নীতিবাজদের সাহায্য করা।

পরিশেষে বলতে চাই, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে যোগ্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করার জন্য জনতাকে বেশি সচেতন হতে হবে। জনতা যদি অসচেতন হয়ে অযোগ্য জনপ্রতিনিধিকে ভোট প্রদান করে, তাহলে ইউনিয়নের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। কাজেই মনে রাখতে হবে যে ন্যায়পরায়ণ, বিবেকবান, আদর্শবান, নীতিনিষ্ঠ, দায়িত্বশীল ও সমাজ উন্নয়নে নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিরা জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হলে ইউনিয়নের উন্নয়ন ও অগ্রগতি তথা দেশ ও জাতি উপকৃত হবে। অপরদিকে, সাধারণ জনতা যদি যোগ্য জনপ্রতিনিধিকে নির্বাচিত করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ইউনিয়নের উন্নয়নে বাধাগ্রস্ত তথা সমগ্র দেশ পিছিয়ে যাবে।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
নবীগঞ্জ সরকারি কলেজ



# বাইডেন প্রশাসনের মধ্যপ্রাচ্যনীতি

## সাদিয়া আফরিন কুমু

গাধা হাতির হাড়ভাড়ি লড়াইয়ে হাতির পতন আকাঙ্ক্ষিত হোয়াইট হাউস কে এনে দিয়েছে ডেমোক্র্যাটদের দখলে। বাইডেনের নির্বাচনী যাত্রার শুরু থেকেই অনুমান করা হচ্ছিলো, রাজনীতির বৈশিক পরিক্রমায় ঘটতে যাচ্ছে পরিবর্তন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণের পর প্রথম কর্মসূচিসে বাইডেন ও দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টোনি বিলকেন কর্তৃক পরিবর্তিত পররাষ্ট্রনীতি ঘোষণার ফলে সত্য হতে চলেছে অনুমিত সব জল্পনা-কল্পনা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট শুধু একজন রাষ্ট্রপ্রধান নন, বরং পুরো বিশ্বের রাজনৈতিক মোড়ল, তাঁর চাওয়াতেই পাল্টায় রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের সমীকরণ, বদলায় রাজনৈতিক হিসেবনিকেশ। রাজনীতির বৈশিক চক্রের মতোই মার্কিন প্রেসিডেন্ট এর হাত ধরে প্রবর্তিত হয় মধ্যপ্রাচ্যের ভাগ্যও।

রাষ্ট্রপতির রদবদলে মার্কিনীদের বিদেশনীতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ইতিহাস না থাকলেও গত মেয়াদে অনেকটাই খেল দেখিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।

মধ্যপ্রাচ্যনীতিতে আমূল-পরিবর্তন ও ইসরাইল যৌঁ আচরণে মধ্যপ্রাচ্যের ইসলাম পন্থী দেশগুলোর মধ্যে জন্মেছিলো চরম অসন্তোষ। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর প্রতি ভারসাম্যহীন ট্রাম্পনীতির জন্য একাধিকবার সমালোচিত হতে হয়েছে পূর্বসূরি এই প্রশাসনকো তবে নির্বাচনের শুরু থেকে বাইডেনের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক মন্তব্যে আশা জেগেছে আরব বিশ্বে।

পূর্বের শর্ত মানার সাপেক্ষে বাইডেন ইরানের সাথে পারমাণবিক চুক্তিতে ফেরাসহ অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে যেই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তা নিঃসন্দেহে ইরানের জন্য একাদশে বৃহস্পতি। মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটির সাথে ছয় জাতির চুক্তিতে ফেরার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা, বাইডেনের হাত ধরে উল্লেচিত হতে পারে ওয়াশিংটন-তেহরান সম্পর্কের শুভ সূচনা। তবে ইরানের প্রতি আন্তরিক হলেও মার্কিনীদের স্বভাবজাত ভারসাম্যমূলক নীতি থেকে পিছু হটবে না ওয়াশিংটন। পরমাণু চুক্তি পুঁজুনুপুঁজি অনুসরণ করলে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সাথে দীর্ঘমেয়াদী আরও চুক্তিতে যেতে পারে বলে জানিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী তেহরানের সাথে ওয়াশিংটনের এই ঘনিষ্ঠতা নিসন্দেহে নাখোশ করছে রিয়াদকো অপরদিকে বাইডেন কর্তৃক সৌদি আরবের সাথে সম্পর্ক পর্যালোচনার বিবৃতিও সেই সন্তানারাই সাক্ষ্য দিচ্ছে। ইয়েমেনে সৌদি নেতৃত্বাধীন যুদ্ধে মার্কিন সমর্থন বন্ধের সোজাসাপ্টা যোগনায় আমেরিকা বনাম ট্রাম্পঘোঁষা সৌদির সম্পর্ক নতুন মোড় নিতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সম্প্রতি সৌদি ও আমিরাতের সাথে অস্ত্র চুক্তি স্থগিতাদেশ ও অস্ত্র বিক্রি বন্ধের ঘোষণায় মার্কিন মহলের সাথে এ দু'দেশের সম্পর্কের নতুন মোড়ে ঘটতে পারে বড়সড় বাঁক বদল। বাইডেনের নির্বাচনী প্রচারণায় উপসাগরীয় দেশগুলোর উপর সৌদি আগ্রাসন বন্ধ করার মর্মে যেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাই যেন কালক্রমে প্রতীয়মান হতে চলেছে।

মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বলয় বিস্তারের ব্যাপারটি ছাড়াও প্রতিপক্ষ রাশিয়ার কাছ থেকে 'এস-৪০০' মিসাইল ক্রয়ের জেরে তুরক্ষের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের যেই মৌন সংঘাত চলে আসছিলো তা ডালপালা মেলে বৃহৎ বিপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে তুরক্ষের জন্য আপাতত বলা যায়, মধ্যপ্রাচ্যের নব্য এই পরাশক্তির বিস্তৃতি রোধকল্পে একে অর্থনৈতিক ভাবে কোণঠাসা করাই হবে ডেমোক্র্যাটদের নয়া তুরক্ষনীতি।

বাইডেন নির্বাচনী প্রচারণার শুরু থেকেই ইসরাইল-ফিলিস্তিন সমস্যার দ্বি-রাষ্ট্রীক সমাধান চান বলে জানিয়ে আসছিলেন। ইসরাইলে অধিকৃত পশ্চিম তীরে বসতি নির্মানের মতো পক্ষপাতী কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করলেও ইসরাইলের মার্কিন দূতাবাস জেরংজালেম থেকে সরাচ্ছেন না নয়। এই রাষ্ট্রপ্রধান। ফিলিস্তিন ও ইসরাইল উভয়ের সাথে বাইডেন বিশ্বস্ততার সম্পর্ক গড়তে চান, তবে জায়নবাদী আমেরিকা তার দীর্ঘদিনের মিত্র ইসরায়েলের পক্ষপাতিত্ব থেকে সহজে সরে দাঁড়াবে না বলে ধারণা বিশ্লেষক মহলের। ফিলিস্তিনিদের প্রতি ৬০০ মিলিয়ন ডলার বার্ষিক সহায়তা পুনরায় চালু করতে পারে বাইডেন প্রশাসন। দীর্ঘমেয়াদী সমাধান না হলেও আপাতত এটুকুই স্বত্ত্ব ফেরাতে পারে ফিলিস্তিনে।

তালিবানদের সাথে গতবছর সাক্ষরিত মার্কিন চুক্তি খতিয়ে দেখার বিষয়ে বাইডেন সরকারের মন্তব্যে আফগানিস্তান প্রসঙ্গে তৈরি হয়েছে ধোয়াশা। অপরদিকে ইয়েমেন ও সিরিয়াকে ঘিরে নীতিগত পরিবর্তনের খুব একটা আভাস দেখা না গেলেও জাতিসংঘের জানানো আহ্বান এর প্রেক্ষিতে ইয়েমেনের হৃথি বিদ্রোহীদের উপর ট্রাম্প সরকারের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছেন বাইডেন ডেমোক্র্যাটদের বিদেশনীতির পরিবর্তিত ক্রম দেখতে হতে পারে ইয়েমেনবাসীদেরও।

এটুকু বলা যায়, মধ্যপ্রাচ্যে ট্রাম্পনীতির অবসান ও আরব বিশ্বের দেশগুলোর সাথে গঠনমূলক সম্পর্ক বজায় রেখে কূটনৈতিক স্বার্থ হাসিলের পথেই হাটবেন বাইডেন। শুরুটা ভালো তবে শেষটায় মধ্যপ্রাচ্যের জন্য কী অপেক্ষা করছে, তা সময়ই বলে দিবো।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ



## ভাষা শহীদ ও বাঞ্ছালিত ইমরান খান রাজ

বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা, আমাদের মায়ের ভাষা। জন্মের পর প্রথম মায়ের মুখেই আমরা বাংলা ভাষা শুনি, তারপর থেকে শুরু হয় আমাদের মায়ের ভাষায় কথা বলা। বর্তমানে আমরা যতটা সহজে বাংলা শিখছি, বলছি শুন্ন দিকে বাংলা বলাটা এটটা সহজ ছিলনা। সহজ ছিলনা রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠা করার। ১৯৫২ সালে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে দাবি জানায় তৎকালীন ছাত্রসমাজ। তীব্র আন্দোলনের মুখ্য আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এতে বহু তরুণ ছাত্র শহীদ হন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলো রফিক, জবার, শফিউল, সালাম, বরকতসহ অনেকেই। বুকের তাজা রক্ত দিয়ে তাঁরা বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠা করো তাঁদের মহান আত্মত্যাগের ফলেই আজ আমরা সহজে বাংলা ভাষা শিখতে, বলতে ও লিখতে পারছি। তাঁরা শহীদ হলেও আমাদের কাছে অমর হয়ে থাকবে চিরকাল।

অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, আন্দোলন, সংগ্রাম ও ত্যাগের বিনিময়ে আমরা যেই ভাষা পেয়েছি আজ আমরা সেই ভাষার যথাযথ প্রয়োগ করছি না। বর্তমান যুগে অনেকেই বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা, অবহেলা করছে। দূষণ করছে বাংলা ভাষা। এখন রেডিও-টিভি চালু করলেই শোনা যায়- ‘হ্যালো লিসেনাস’, ‘হ্যালো ভিডিয়ার্স’। এটা কি ভাষার দূষণ নয় ? কোনো আঞ্চলিক রেডিও-টিভি যদি তাঁদের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে সেক্ষেত্রে সেটা ভাষার দূষণ হয় না। কিন্তু যখন কোন জাতীয় প্রচার মাধ্যমে ঐসব ভাষা প্রয়োগ করা হয় তখন ঠিকই বাংলা ভাষার অবস্থানা করা হয়। আবার বাংলা নাটকের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় বেশিরভাগ নাটকের শিরোনাম হয় ইংরেজিতে। যা বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসার অভাব বোঝায় অনেক ইংরেজি মাধ্যম স্কুল-কলেজ রয়েছে যেগুলোতে বাংলা চর্চার চাইতে ইংরেজি ভাষার চর্চা বেশি করা হয়। ঐসব স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের চেয়ে অন্যান্য দেশের ইতিহাস ভালো বলতে পারে। অথচ বাঞ্ছালি হয়ে তাঁরা নিজ দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও নিজ দেশের ভাষা, মাতৃভাষা বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ। রাজধানীসহ সারা দেশের বহু মার্কেট, রেস্টোরাঁ কিংবা শপিংমলে বাংলা ভাষার জায়গায় ইংরেজিতে নাম লেখা হয়। যা বাংলা ভাষাকে ছোট করে দেখার শামিল। চীন, জার্মানসহ অন্যান্য বেশকিছু দেশের দিকে নজর দিলেই দেখা যায় তাঁদের মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা ও গুরুত্ব কর্তৃত। অথচ এত ত্যাগ ও আন্দোলনের বিনিময়ে আমরা যেই ভাষাকে পেয়েছি সেই ভাষাকেই আজ অনেক বাঞ্ছালি ছোট করে দেখে। যা জাতির জন্য অকল্যাণকর।

হাইকোর্ট সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর আদেশ দেন ২০১৪ সালে। রয়েছে বাংলা ভাষা প্রচলন আইন-১৯৮৭সহ সরকারি অনেক বিধিনিষেধ। কিন্তু ঐসব আদেশ, আইন ও বিধিনিষেধের পরেও অনেক বাঞ্ছালি বাংলা ভাষাকে অসম্মান করে। সর্বত্র বাংলা ভাষার দূষণ চলছেই। কেউ যদি নিজের মাতৃভাষাকে অসম্মান করে থাকে তাহলে সে যেনো নিজেকেই নিজে অসম্মান করলো। এখনই সময় নিজেকে পরিবর্তন করার। যেই ভাষার জন্য আমার ভাই জীবন দিয়েছে, যেই ভাষা আমার মায়ের মুখের ভাষা, যেই ভাষায় আমরা হাসি, যেই ভাষায় আমরা কাঁদি সেই ভাষার অসম্মান হতে দেবো না। সর্বত্র বাংলা ভাষার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। যেখানেই ভাষার দূষণ দেখা যাবে, সেখানেই প্রতিবাদ করতে হবে। কারণ আমাদের ভাইদের আত্মত্যাগ বৃথা যেতে পারে না। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় আমরা বদ্ধপরিকর।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
শেখ বোরহানউদ্দিন পোষ্ট গ্রাজুয়েট কলেজ।



# Motorcycles are the Death Cycles of the Young Generation

## Farhana Yasmin,

Motorcycles are two-wheeled fast-moving vehicles. Motorcycles are very useful for working people to reach their destination in comfort and time. At one time it was seen that middle-aged men were the only drivers of this vehicle. However, for the last few years, the young generation has become the only driver of the motorcycle and the whole highway has become their own property. When riding a motorcycle, just as they do not see if there is anyone on the front or back, right or left, they cannot move at a balanced speed. Not being able to ride a motorcycle at extra speed is a kind of un-smartness for them. It is now a death trap for the younger generation to hand over motorcycle keys to young boys to satisfy their children's cravings.

According to the authorities of the National Orthopaedic Hospital and Rehabilitation Centre (Pangu Hospital), 1,484 people injured in various accidents have received services in the first seven days of May this year. About 65 to 70 percent of them are victims of motorcycle accidents. Note that 90 percent of them are young. A study by the Road Safety Foundation found that 830 people died in motorcycle accidents in the first four months of this year (January-April). And 945 people died in motorcycle accidents in 2019. Surprisingly, the number of deaths that a motorcycle kills in one year is increasing several times in another year. Motorcycle accidents are on the rise dramatically. The Road Safety Foundation also said that 1,463 people died in motorcycle accidents in 2020. And in 2021, around 2,214 people died in motorcycle accidents. Seventy-five percent of those killed were between the ages of 14 and 45, and 90 percent of those injured were young. According to Prothom Alo, an analysis of road accidents in five places across the country during the three days of Eid has shown that the 10 people killed in motorcycle accidents are all 18 or younger. It was all about going out with friends to celebrate Eid. Work with multiple research and road safety groups say the increase in road accidents is one of the reasons behind the large availability of a motorcycle.

According to the Bangladesh Passenger Welfare Association, more than 2.5 million motorcycles are running this Eid. This time around half of the people who died on the road during the Eid holidays were motorcyclists and riders. Most of them are between 15 and 25 years of age. Most of them did not have licenses. They are not supposed to drive on the roads and highways. They did not use helmets, disobeying road transport laws. Three people got on a motorcycle. This is not right. Apart from that, the roads are empty during Eid. Accidents increase when vehicles move recklessly on empty roads.

Bangladesh Road Transport Authority (BRTA), according to the number of motorcycles registered in 2015 countries since it was less than 15 million. At present, the number of registered motorcycles has increased by nearly 36 million. That year, 2016 more than 3 million registered motorcycles. Also, according to the Research Institute of BUET accident, motorcycles registered in the district, at least 15 million motorcycles in urban and rural areas are not registered. Thus, the motorcycle cannot available in any country. The motorcycle behind a road accident has become a trap now. Motorcycle accidents have increased in recent years. A large proportion of those injured in motorcycle accidents and emerging-old teenagers. These young souls are joining the death procession on the road by reckless riding motorcycles without following the traffic rule.

At present motorcycles are being used more than public transport to travel from one district to another. It is unfortunate that motorcycles have become an alternative to public transport. It cannot be an alternative to public transport. Using a motorcycle for long-distance travel is extremely risky. This time many motorcycles have transported long-distance passengers commercially. This is contrary to the existing ride-sharing policy of the country.

Most of the motorcyclists and riders killed in road accidents during this Eid time are between 15 and 25 years of age. Thus, if our new generation of boys continues to lose their lives in motorcycle accidents, it will have a negative impact on our workforce. Because young people are a big part of the productive manpower, on whom our future development and progress depend. According to transport experts, the risk of a motorcycle accident is 30 times higher. But a class of teenagers who get a motorcycle became insane. They take a deposit from their parents and if they don't buy a motorcycle, they give up food and drink. They think that being able to ride a motorcycle is a matter of pride for boys. They see it as a symbol of heroism, which is not true at all. The trend of bike racing has also increased among them due to various propaganda including social media, which is more deadly. There is a competition as to who can ride a motorcycle at high speeds and in different poses by making loud noises. While many are upset by their death game, many animals and people have died from being crushed, and even if they themselves have suffered casualties, other teenagers are not learning from it. Motorcycle rehearsals are shown in some political programs with all these teenagers. Locals and even the public representatives and traffic police feel helpless in the face of their violence.

Parents need to be aware before they can stop biking, racing, and motorcycling. Motorcyclists must be adults. They must have a driving license. Traffic laws must be complied with. Drivers and riders must also wear helmets. No one will be allowed to ride a motorcycle without following these rules. Apart from these, not only motorcycles, but also no vehicle should be driven recklessly. Occasionally there will be raids in towns and villages to stop teenagers from riding motorcycles and various measures will have to be taken including lawsuits against illegal and reckless motorcyclists. Parents need to be aware of this.

Student, Sociology Department,  
Barishal University.



# Vested Property Act and the Hindu minorities

Md. Abu Sufian

Vested Property Act,a terrific law which legalizes the government confiscating property from people, deprives actual owners from their property creates controversy and criticism. It is one of the consequences of the long lasting communalism and disparity in Indian subcontinent. Continuous partition of the subcontinent was the consequence of the ‘Divide and Rule’ policy by British colonialism hence it’s distortions caused sufferings to the individuals for long time in economy and politics. No doubt, it is the controversial creation of the socio-political instability though there must have liabilities to the involved leaders of this subcontinent. Before the independence of Bangladesh, it was known as the ‘Enemy Property Act’ and now it is known as ‘Vested Property Act, 2013’. It was the key to unlock the problems related to appropriate the lands of the Hindu population who went to India from 1965 to 1969, an unfair and oppressive one. It corresponds those property belongs to Hindu community possessed by other persons later. To signify the effects and impacts on Hindu population in Bangladesh, we have to know about impacts and effects by which this law was created first. We have to know clearly about the Hindu population who are aggrieved today whether they were benefited or not before existing this law.

This law was the expression of disparity towards the Hindu population when Bangladesh was the part of Pakistan. Government of Pakistan bound it by several successive law before 1971 as we notice behind gradually. I would like to mention few of them like The vested and Non-Resident Ordinance, 1976, The Vested and Non-Resident Property Act, 1974, The Enemy Property Act, 1974, The Enemy Property Ordinance No. 1 of 1969, The Defence of Pakistan Ordinance, 1965, The East Bengal Prevention of Transfer of Property and Removal of Documents and Records Act of 1952, The East Bengal Evacuees Act, 1951 etc.

Following the 1947 partition of India into the predominantly Muslim state of Pakistan, including its East and West Wings, and the Hindu majority state of India, Mohammad Ali Jinnah, the founder and first governor general of Pakistan, initially repudiated , noting that, ‘You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of the state’. But in spite of this proclamation, he soon thereafter attempted to build a nationalist project in an idiom of a shared Urdu language, to create a sense of collective belonging that would bring the East and West Wings together. The argument against Bengali, and for Urdu, was that Bengali did not comfort with the construction of a national narrative articulated in the sacralized language and cultural traditions of Islam. At this time, the Hindu population was estimated to be between 10 and 12 million with Muslims accounting for 32 million . Thus, introducing Urdu as the state language was a response to the perceived threat of Bengali nationalism in the East, where Bengali language and culture were infused with Hindu religious and linguistic idioms, and a significant proportion of the population was Hindu. This language initiative can thus be understood as an effort to mark Hindus as a community distinct from East Bengal’s Muslim majority.

In addition to the 1948 struggle against Urdu, people of East Bengal led to the Language Movement inn East Pakistan. The Movement sought recognition of the East as a multi-religious community whose mark of national belonging was shared language rather than religious identity. A bloody battle ensued following a five-year struggle against the imposition of Urdu as the state language. Students of East Bengal rescue their language from a dark hole. Government of Paki-

stan deceived to eliminate Bengali only for the mixture of Hinduism culture with Bengali nationalism, tried to separate Muslims from Hindus in social and national stage. Struggles over recognition of the multiethnic character of East Pakistan, and the particular place of Hindus in the body politic, also included the State's proposal for a separate electorate for minorities. But Bengali Muslims and Hindus alike rejected this proposal, even as a 1956 Constitutional provision only allowed Muslims to serve as the president of Pakistan. Arguing against the proposal were Basant Kumar Das, Peter Paul Gomez and B.K. Dutta, as well as Hossain Shahid Suhrawardy and Sheikh Mujib - ur - Rahman, all members of the Constituent Assembly that included Hindus, Christians, and Muslims. They claimed that the proposal would relegate minorities to the status of second-class citizens and, significantly, would put Muslims residing in India at risk, since the politics of the period reflected an implicit or explicit engagement with policies in India. Hindu - Muslim collision was then concurrent familiar issue in the divided India. On the other hand, Hindus in Bangladesh were being oppressed following the same wether. \The East Bengal Requisition of Property Act was Jinnah's final action aimed at marking Hindus as second-class citizens. The Act empowered the government to 'acquire, either on a temporary or permanent basis, any property it considered needful for the administration of the state . The agreement signed by Prime Ministers Liaquat Ali Khan of Pakistan, and Jawaharlal Nehru of India on 10th April, 1950, provided a hopeful sign for migrants, as it acknowledged that refugees would be permitted to take with them their movable personal effects, including up to 150 rupees. It further acknowledged that immovable property would not be confiscated, even if occupied by another person, if its owner returned to East Pakistan before the end of 1950.

The India-Pakistan War in 1965 also legitimated relations of Hindu othering by providing the state with an opportunity to reiterate the criticality of Muslim unity in Pakistan and to mark Hindus as potential threats to this unity. This short war also legitimated President Ayub Khan's passing of Order of 1965, The Defense of Pakistan Ordinance, declaring India an enemy country and authorizing the confiscation of all interests of the enemy.

Despite revoking the state of emergency on 16 February 1969, The Defense of Pakistan Rules relating to the control of trade with the enemy and their firms continued, as did use of the term 'enemy'. This continuance empowered the District Commissioners, who held bureaucratic control in the rural areas, to implement these ordinances and rules under the Government's declaration of the Enemy Property, Continuance of Emergency Provisions Ordinance, 1969.

These orders imposed cruel rules aimed at Hindu landowners and those owning firms and buildings that sanctioned property acquisition by the state. The enemy, included all Hindus who resided in India, even if they had family or kin in Pakistan and who, according to Hindu inheritance law, could be the recipients of their property. Declaring India an enemy state meant that even Hindus living in East Pakistan were included among those whose allegiance was assumed to be inevitably tied to India. It led , to a second major displacement, since Hindus were now deprived of their rights to property and to its transfer, sale, and gifting.

Though they take these, Hindus continued to opt for East Pakistan as their country of belonging, a choice the identification of the majority of its inhabitants as Bengali rather than Muslim. Those Hindus remaining in the East, challenged the leadership in the West. These challenges eventually helped catalyse the West Pakistan response to the East Wing's call for autonomy- the threat of Bengali nationalism and a questionable identification with Islam.

Liberation war of Bangladesh was started and finished in 1971, Bangladesh got independence after the bloody struggles for 9 months. But the hole founded by Pakistani Communalists did not fill up. Despite the constitution was made on the basis of one of the principles- Secularism, it did

not come round from the illness. Targeting of Hindus institutionalized the right to violence that can turn neighbors into enemies and people to be feared for the threat they pose to conceptions of national belonging. It also can destroy community and forms of sociality that make such behavior against kin or neighbor possible. The Bangladesh Order which recognized the new government as vested with “enemy” properties seized since the 1965 War and stipulated that its provisions shall not be subjected to judicial review. In 1996, Government led to passage of the Restoration of Vested Property Act, 2001 which stipulated that previously confiscated lands should be returned to their original Hindu owners. However, the Act referred only to properties vested prior to February 1969, while ignoring properties confiscated afterwards that were likely in the hands of government officials or miscreants, and often confiscated illegally. It also excluded land that was no longer in government hands or currently used by or leased to an authorized person. Thus, despite this initial sense of promise, these and other restrictions of the Act failed to offer claimants access to the return of land that they or their families owned. On 6 November 2008, the High Court division of the Supreme Court of Bangladesh delivered its rule nisi upon the government on the Enemy Property Act, 1974 and subsequently promulgated Arpita Sampatty Protapyan Ain, 2001 and circulars, administrative orders. There was no interim order issued. the Government was compelled to pass the Vested Properties Return Act, 2001 cancelling the Schedule ‘B’. According to the new amendment, all cases challenging the ownership of the property on the schedule-B will no longer exist. It is now familiar with the Vested Property Act, 2013.

Government of Bangladesh should have taken steps to stop decreasing Hindu minorities but the matter of great regret is that government put lubricant on fire making this law. They think them to be neglected and unsecured, their rights are unsecured. So they are leaving Bangladesh day after day. Once Hindu minorities were tortured socially thus thought them neglected in the society, passed their day with fear. They were optimistic getting facilities and rescuing rights and interests by their ultimate shelter- government. But we observe that government does not try to help them properly rather enhances social insecurity with passing this law. It exposes cosmopolitanism is the far cry from reality. Cosmopolitanism is the uniform of our body of nation but actually the heart of the state is clearly divided into two portions - Hindu and Muslims. Generally Indian, Pakistani and Bangladeshi minorities are neglected reciprocally; Indian communal instability affects Bangladeshi as well as Pakistani communal stability, Bangladeshi and Pakistani instability affects Indian stability everyday is the geopolitical nature. But this law carries butter on the instable political fire.

Vested property Act dignifies the Hindu community altering the word “enemy”. But honestly saying, it ensures the applicability of the Enemy Property Act declaring non- evident properties as khas in accordance with section, 92 of the SAT Act, 1950 that deprives the relatives of the appropriate owner of properties. The socio-economic condition of the Hindu community in Bangladesh is at stake, deserves privilege to stand strictly. It is high time to consider the Act again for the betterment of subcontinental geo-political policies whereas every part of it has been changed depending upon another part. It is nor expected declaring NRC in India, not expected depriving the minorities in Bangladesh. We expect our country to be regarded as an absolute example of religious collocation and harmony in the world.



# সম্পর্ক ও অপ্রত্যাশিত শূন্যস্থান

## মুক্তা আচারী,

মানব সৃষ্টির প্রাচুর্যে ‘সম্পর্ক’ একটি প্রাকৃতিক বিষয় যা কেউ ব্যক্তিগতভাবে নিজের পছন্দের প্রেক্ষিতে নির্বাচন করতে পারে না। সম্পর্কের বড় এবং ছোট হ্বার ধারাবাহিকতায় ছোটরা বড়দের মান্য করবে, কথা শুনবে, বড়দের সিদ্ধান্তগুলো নিজ হিতার্থে মেনে নেবে, সদা কৃতজ্ঞ ও সম্মানসূচক আচরণ করবে এটা বিখিলিপির মত প্রত্যাশিত মনে করা হলেও বিষয়টি বাস্তবিকই কতটা সন্তুষ্ট তা নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনার প্রয়োজন আবশ্যিক। আবার বড়দের প্রতিও মেহ, মমতা, আবদার-আহ্লাদপূর্ণ ছোটদের রয়েছে কিছু প্রত্যাশা যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোণঠাসা পরিস্থিতিতে পরে নিরাশা সৃষ্টি করে। ফলে সময়ের সাথে বড়-ছোট সম্পর্কে তৈরি হয় এক অপ্রত্যাশিত শূন্যস্থান। এসবকিছুই কার্যকারণের অদেখো ভবিতব্য। কর্মে সফলতা অর্জনের জন্য এবং যথাযথভাবে জীবন অতিবাহিত করার প্রচেষ্টায় মানুষ ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজ দক্ষতার ভিত্তিতে নিজস্ব শক্ত অবস্থান তুলে ধরতে নিয়োজিত থাকে। এই ব্যক্তিগত ও সামাজিক অর্জনটি চাহিদা সোপানের সবচেয়ে উপরের ধাপ অথচ যার নিচের ধাপগুলোতে মানুষের আধ্যাত্মিক চেষ্টা থাকে মৌলিক চাহিদা পূরনের মাধ্যম টিকে থাকা। সফলতার সাথে সাথে তৈরি হয় সামাজিক ও ব্যক্তিগত মর্যাদা বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা। বিষয়টি একদিনে যেমন অর্জন করা অসম্ভব তেমনিভাবেই স্বল্প সময়ের লালিত কিঞ্চিং চেষ্টার ফলে এই আত্মমর্যাদার অনুভূতির ভিত গড়ে উঠে না। মুদ্রার চকচকে পিঠে আত্মমর্যাদা নামক বাগড়মুর্পূর্ণ শব্দ নজর কাড়লেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে একে ঔদ্ধৃত আচরণে পূর্ণ, যথাযথ শিষ্টাচারের অভাবে মানবিক গুণে পরিপূর্ণ বিকশিত না হ্বার ফলাফল বলা যেতে পারে। যখন ছোট শিশুর মুখে বড়দের মত করে বলা কথার ফুলবুড়ি শুনে আমরা মনে মনে হাসি, হাততালি দেই, সাবাসি না হোক অন্তত আনন্দ বিনোদনের উপাদান হিসেবে দৃষ্টিগোচর করে থাকি সেটা নিতান্তই দূরদর্শিতার অভাবে শিশুর জন্য ক্ষতি ছাড়া কিছুই নয়। কারণ সময়ের সাথে শিশু মনে উল্লেখিত আচরণসমূহ ‘হাসি-তামাশার উপাদান’ এই ধারণা স্থায়ী হয়ে রয়ে যায়। সে ভাবতে শেখে তার আচরণে সবাই আনন্দ পাচ্ছে, এতে দোষ বা ভুল কিছু নেই। অথচ একই শিশু কিছুটা বড় হ্বার পর সেই একই আচরণের জন্য উৎসুক্ত উপাধি পেয়ে থাকে। মূলত কার আচরণে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রয়োজন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কথাগুলো বেশ কাঠখোটা ও বিক্ষিষ্ট শোনাচ্ছে; কিছু উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক। আজকাল সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পরিবারগুলোতে সদস্যদের মধ্যে পারস্পারিক সম্মানবোধের ব্যাপক ঘাটতি দেখা যায়। সম্পর্কের নিজস্ব কিছু প্রতিষ্ঠিত স্থান, গুরুত্ব ও মর্যাদা রয়েছে। ক্রমাগত মানবিক উন্নয়নে পরিকল্পিত সময় দেবার পরিবর্তে আমরা জীবনকে করে তুলি প্রতিযোগিতা ও তুলনামূলক সাফল্যের এক ধারাবাহিক যাত্রার মত। ছোট থেকে প্রতিযোগী পরিবেশে ঠেলে দিয়ে মানবিক গুণাবলি বিকশিত হ্বার জন্য পর্যাপ্ত সময় না দিয়ে ছোটদের জন্য তৈরি করা হয় মানসিকভাবে বিক্ষিষ্ট পরিবেশ। ভালো করতে হবে, বড় হতে হবে, আরো বেশি দক্ষ হতে হবে কিংবা অপরের তুলনায় বেশি সফল হতে হবে বিষয়সমূহের মধ্যে ছোটদের জীবনকে আমরা বদ্ধ করে রাখি। যে বয়সে ছোটদের উৎসুক্তার সাথে এক সাধারণ জীবন সম্পর্কে ধারনা থাকার কথা সেই বয়সে তারা হয়ে উঠে গঠিত প্রকৃতির। শুধু পুঁঁথিগত বিদ্যায় বিভোর থেকে থেকে মৌলিক মানবীয় গুণাবলি বিকশিত তো হয়ই না বরং সময়ের সাথে আচরণে আসে পরিবর্তন। মিষ্টি মিষ্টি কথায় বিভোর করা সেই ছোটরা বড় হতে থাকে। বিরক্তি, নিজস্ব মতবাদের বিরদে বড়দের নেয়া সিদ্ধান্তগুলোর সুফল-কুফল সম্পর্কে বিবেচনাসহ নানান বিষয়ে মতপার্থক্য ক্রমে স্পষ্ট হতে থাকে। অপর দিকে বড় হ্বার সুবাদে ছোটদেরকে সঠিক দিশা দেখাবার উদ্দেশ্যে নেয়া নানান সিদ্ধান্ত ও আচরণে বিস্তর ফারাক তৈরি হতে থাকে বড়-ছোট সম্পর্কে। অভিভাবকত্বের দোহাই দিয়ে কথনো বড়দের অতিরিক্ত কঠোরতা ও স্বেরাচারী ব্যবহার হিতে বিপরীত ফলাফল বয়ে আনে। ছোটদের পছন্দ অপছন্দের তেয়াক্কা না করে সবকিছুতে ‘না’ বলার প্রবণতা আচরণে বিরক্তি এনে দেয়। ফলে সময়ের সাথে সাথে ছোটরাও বড়দের সিদ্ধান্তে ‘না’ বলা শিখে ফেলে। এক্ষেত্রে শুরুটা কেন, কিভাবে, কখন কিংবা কার দ্বারা সূচনা হয় তা ইতোমধ্যে স্পষ্ট হয়েছে আশা করি। আমরা যদি ছোটদের সত্যিকার অর্থে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই তাহলে সবার পূর্বে তাদের মানসিক দিক পর্যবেক্ষণ করতে হবে। খারাপ কোন কিছুর প্রভাব থেকে বের করতে অবশ্যই তার জন্য পূর্বের থেকে উন্নত কোন বিকল্প খুজে নিতে হবে যা তার জন্য অধিকতর উপযোগী। ধরা যাক ছোটরা মোবাইল গেমিং এ আসক্ত হয়ে পড়ছে যা নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর। এই ক্ষতিকর দিকটি সুন্দর এবং যথোপযুক্ত উপায়ে তাকে বোঝাতে হবে, একই সাথে কিছু মনোদীপ্ত বিকল্প ব্যবস্থা করে তার সুফল পরিক্ষার করা জরুরি যা তাকে গেমিং এর আসক্তি ভুলে থাকতে সহায়তা করবে। হতে পারে সেটা সাঁতার প্রশিক্ষণ, সাইকেল শেখানো কিংবা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকনে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে হেঁটে বেড়ানো। আফসোসের বিষয় এই যে, আমরা সমস্যা নির্ধারণ করতে পারি এবং সমাধানও ঠিক করি কিন্তু যান্ত্রিক জীবনে এগুলো মোকাবেলা এবং সমাধান করার জন্য আমাদের হাতে যথেষ্ট সময় নেই। আর তাই সহজ সমাধান হিসেবে ছোটদের হাতে প্রযুক্তি নয় বরং প্রযুক্তির হাতে করেছি ছোটদের সোপাদ। সম্পর্কে এই বড়-ছোট ধারা তো প্রকৃতির তৈরী কিন্তু সম্মানবোধ তৈরী প্রাকৃতিক নয় বরং অর্জনভিত্তিক। দূরদর্শিতার সাথে দায়িত্বশীল বড় যারা থাকেন তারা ছোটদের সাথে সমরোহ করবে, পারস্পারিক সুবিধা-অসুবিধা, সামর্থ্য-অসামর্থ্য, দক্ষতা-দুর্বলতাকে বিবেচনায় রেখে সঠিক দিশায় পরিচালনা করার পাশাপাশি নেতৃত্ব ও মানবিক পরিবর্তনে সমানভাবে সচেষ্ট হতে হবে। ইদানিংকালে প্রায়ই বলতে শোনা যায়, আমাদের সন্তান বা ছোট সম্পর্কের কেউ আমাদের কথা শোনে না। আমাকে পর্যাপ্ত সম্মান ও মূল্যায়ন করে না বা ছোটরা কৃতজ্ঞ নয়। এ অশঙ্কা নিশ্চয়ই একদিনে তৈরি হয় না। ছোটবেলা থেকে পড়াশুনায় প্রতিযোগিতার পাশাপাশি ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন, ভালো মানুষ হ্বার স্বপ্নের বীজ বেগন, অতি যত্নে সে বীজ বেড়ে ওঠায় সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা সমানভাবে গুরুত্বের দাবী রাখে। ছোটদের মনস্তান্ত্বিক গঠন বুরো বড়দের নিয়ম নির্ধারণ, সঠিক পথ প্রদর্শন, একই সাথে তা পর্যবেক্ষণ করা জরুরি। জীবনের অনেকটা সময় পার্থিব চিন্তা জগতের সাথে খাপ খাইয়ে যখন আমরা ছোটদের থেকে

পরিপূর্ণ ভালো আচরণ ও সম্মান আশা করি তখন তা বাস্তবিকই অসম্ভবের পথে পা বাঢ়িয়েছে। ডট্টর, ইঞ্জিনিয়ার, পাইলট কিংবা পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য ছোটদের যতটা গুরুত্বের সাথে পরিচালন করা হয় তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি যত্নের প্রয়োজন হয় মানুষ গড়ার জন্য। একজন ভালো মানুষ গড়ার পরিকল্পনাকে সামনে রেখে শিশুর আচরণের গতিবিধি পর্যবেক্ষণপূর্বক ছোটদের পাশাপাশি দায়িত্বে থাকা সম্পর্কে বড়দের আচরণেও বিস্তুর পরিবর্তন আনা জরুরি। আমাদের আশেপাশে অনেক মানুষ রয়েছেন যারা কর্মক্ষেত্রে প্রচল দক্ষতার পরিচয়ে দিয়ে সবার প্রশংসা কুড়োতে ব্যস্ত অথচ সন্তান কোন শ্রেণীতে পড়ছে, কখন ঘরে ফিরছে, কি তার মানুষিক ও শারীরীক বিকাশের পর্যায় তার বিন্দুমাত্র খবর নেই। তারপর হঠাতে একদিন নানান অনিয়ম চোখে পরে, দোষারোপ করি আমরা গৃহে থাকা সদস্যদের, হতাশা দেখাই সমাজ ব্যবস্থার উপর। অথচ দায়িত্বের ভার আমারও ছিলো, ছোটদের অনৈতিক আচরণের দায় আমার উপরেও সমানভাবে বর্তায় যা উপেক্ষা করার কোন সৎ উপায় আমার জানা নেই। প্রতিটা সময় সুন্দর, প্রতিটা সুন্দরের জন্য কিছু সঠিক মাত্রার সময়ের সম্বুদ্ধার অনিবার্য। আপনার আমার দায়িত্বে থাকা বয়সে ছোট যেসকল সদস্য পরিবার কিংবা কাছের সম্পর্কে রয়েছে তাদের আচরণে দোষারোপ না করে পর্যাপ্ত সময়ের সাথে বিষয়গুলোকে গুরুত্বপূর্ণভাবে নেয়া ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নেয়ার পাশাপাশি বয়স অনুযায়ী শিশুর মানুষিক বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। সময়ের এক ফোঁড়, অসমশের দশ ফোঁড়ে কখনো পূরণ করা সম্ভব নয়। যে বয়সে নৈকি শিক্ষায় ছোটরা বড়-ছোট সম্মানের মর্যাদা বুঝতে ও মানতে পারবে তার থেকে বেশি সময় অতিক্রম হয়ে গেলে উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। ছোট থেকে কথা, গল্প কিংবা খলার ছলে এই বিষয়গুলো শিশুমনে গভীরভাবে গেঁথে দেবার জন্য বড়দের বিচক্ষণতার সাথে আচরণ করতে হবে যা আধুনিকতার ছোঁয়ায় আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। এক্ষেত্রে মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া, দেশ কাল ও পরিবেশ বিষয়ক যথাযথ আলোচনা, পর্যাপ্ত গুণগত সময় কাটানোর ব্যবস্থা, সর্বদা ভালো আচরণের মাধ্যমে ছোটদেরকে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়া, তাদের ভালো-মন্দের সম্যক ধারণাসহ ধর্মীয় শিক্ষাদানের মাধ্যমে সক্রিয় জীবন যাপনে সাহায্য করতে হবে। পেশাগত জীবনে আপনার কনিষ্ঠ সদস্যদের সফল হ্বার জন্য যে পৃষ্ঠপোষকতা, সময়, অনুপ্রেরণা ও প্রত্যাশার পথ বাস্তবায়নের সহায়তা দরকার তদুপর আদর্শ মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবেও প্রতিটি ক্ষেত্রে সতর্ক থেকে সহোযোগী মনোভাব নিয়ে পাশে থাকা জরুরি। একটি শিশু শৈশব থেকে বড়দের তত্ত্ববিদ্যানে যে জীবন যাপনে অভ্যন্ত হয় তার মূল ভিত্তি সেখান থেকেই তৈরি হয়। বড় হ্বার সুবাদে বেছাচারী মনোভাব লালন করে ছোটদের হেয় প্রতিপন্থ করা, ছোটদের বিকাশের সময়রাকে দৃষ্টিগোচর করে সর্বদা নিজ মতামত ও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া, উদ্বৃত আচরণ, রাগ, জেদসহ নানাবিধ নেতৃত্বাচক আচরণ ছোটদের মনে বড়দের প্রতি অশ্রদ্ধার জন্ম দেয় যা সময়ের সাথে অত্যন্ত খারাপ প্রতিফলন তৈরি করে। বন্ধুসুলভ আচরণ, ছোটদের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া, কোন বিষয়ের ভালো-খারাপ প্রসঙ্গে খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ ছোটদের প্রতিও সম্মানসূচক আচরণ করা বাঞ্ছনীয়। আমরা অন্যের কাছে যে ব্যবহার আশা করি তা নিজ কর্মপন্থার মাধ্যমে বাস্তবিক উদাহরণ সরূপ উপস্থাপন করে শেখাতে হবে তবেই ছোটরা কথা শোনেনা, সম্মান করে না, কৃতজ্ঞ নয় এরপ বড় বড় সামাজিক সমস্যার সহজে সমাধান সম্ভব। নিজ নিজ অবস্থান থেকে সঠিক পরিবর্তন ও দায়িত্বশীলতার মাধ্যমে সম্পর্কে সৌন্দর্য ও সম্মান বৃদ্ধির অধিক ফলপ্রসূ ও দীর্ঘমেয়াদী সন্তানবন্ন রয়েছে।

লেখকঃ কলামিস্ট,  
সাবেক শিক্ষার্থী, একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগ।  
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।



# জাহাজশিল্পের সংকট কাটাতে হবে মো. আরাফাত হোসেন

২০০৮ সালের পর বাংলাদেশ জাহাজ নির্মাণ শিল্পে যে পরিমাণ সন্তাননা ও সমৃদ্ধির দ্বারোন্নোচন করেছে তা ছিল বিশ্বয়কর। ডেনমার্কের রঞ্জনির মধ্য দিয়েই মূলত জাহাজ রঞ্জনিকারক দেশ হিসেবে পরিচিতি পাই আমরা। এক যুগেরও বেশি সময় পার করা এই খাতে সাম্প্রতিক সময় খুব একটা ভালো কাটছে না, বিশেষ করে রঞ্জনিতে।

কাঁচামালে ব্যয়বৃদ্ধি, নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ করতে না পারা, দীর্ঘসূত্রিতা, চাহিদা অনুযায়ী আন্তর্জাতিকমান ঠিক রাখতে না পারা, করোনা চলাকালে চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি নানামুখী সমস্যায় বিগত দুই বছরেও কোনো রঞ্জনি কার্যাদেশ পাইনি আমরা। যদিও ২০০৮ সালের পর এ পর্যন্ত ৪০টি জাহাজ রঞ্জনি হয়েছে ইউরোপ-আফ্রিকা-এশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে। সর্বশেষ ২০২০ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশ থেকে জাহাজ রঞ্জনি হয়েছে।

জাহাজ নির্মাণে যেহেতু বেশির ভাগ কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়, সেক্ষেত্রে পুরো নির্মাণ কাজে আমাদের অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। প্রতিযোগী দেশগুলো এই জায়গায় আমাদের থেকে এগিয়ে। বাংলাদেশের রঞ্জনিবাণিজ্যে বর্তমানে সব থেকে বড় প্রতিযোগী ভিয়েতনাম। ভিয়েতনাম আমাদের তুলনায় অনেক কম সময়ে মানসম্পন্ন জাহাজ নির্মাণে সক্ষমতা অর্জন করেছে। তাছাড়া আমাদের জাহাজ ডিজাইনিং প্রক্রিয়ায়ও আমরা পিছিয়ে রয়েছি, কালক্ষেপণ হওয়ার এটিও অন্যতম একটি কারণ।

বাংলাদেশে জাহাজনির্মাণ তুলনামূলক কোরিয়া, চীন, জাপান, ভারতের থেকে অধিক ব্যয়বহুল। যার অন্যতম কারণ সাপ্লাই চেইনের সীমাবদ্ধতা। এই খাতকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন কিছু ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পের উপস্থিতি, যা আমাদের নেই বললেই চলে। এতে ব্যয়ও কমে আসে কিছুটা। আমাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের প্রায় সবটুকুই আমদানি করতে হয়। ব্যাকওয়ার্ড শিল্পের ভূমিকা এক্ষেত্রে প্রতিযোগী দেশগুলোকে অতিরিক্ত সুবিধা দিচ্ছে। তাছাড়া বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান মূলত দেশীয় বাজারের চাহিদা মেটাতে কাজ করছে, যা আমাদের অর্থনীতির জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু রঞ্জনিকারক হিসেবে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক, ওষুধ, চামড়া, কৃষিজাত পণ্যের পাশাপাশি যদি ভারী শিল্পে উন্নতি করতে পারে তবে তা দীর্ঘমেয়াদে সুফল বয়ে আনবে।

বৈচিত্র্যময় রঞ্জনি খাত যে কোনো দেশের অর্থনীতিকে টেকসই এবং মজবুত করে। রঞ্জনিতে অতীতে সন্তাননা দেখানো জাহাজ নির্মাণশিল্পের বর্তমান সংকট স্থায়ী হলে দেশের অর্থনীতি বড় রকমের সুযোগ হাতছাড়া করবে। রঞ্জনিবহুমুখীকরণ করতে উৎপাদনমুখী শিল্প থেকে নির্মাণ বা ভারী শিল্পে বিশেষ নজর রাখা অতি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনীতি বৈচিত্র্যময় হলে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভৃত নাজুক পরিস্থিতি মোকাবিলা অনেকাংশে সহজতর হয় এবং টেকসই অর্থনীতি তৈরিতে তা প্রধান প্রভাবক হিসেবে অবদান রাখে। বর্তমান শীলঙ্কা তাদের একমুখী অর্থনীতি তৈরির মাশুল গুনছে। তাই সন্তাননা জাগানো এবং সুযোগ থাকা খাতগুলোর যথাযথ পরিচর্যা করা একান্ত প্রয়োজন। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের শক্তির জায়গা হচ্ছে প্রধানত সন্তা শ্রম এবং বিশাল জনগোষ্ঠী। আর তাই জাহাজ রঞ্জনিতে এবং নির্মাণে বহির্বিশ্বে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ রয়েছে আমাদের। প্রয়োজন কেবল দক্ষ ব্যবস্থাপনা, দক্ষ লোকবল এবং অভ্যন্তরীণ অনুকূল পরিবেশ। আমাদের এখন আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জাহাজ নির্মাণ এবং নির্দিষ্ট বাজারকেন্দ্রিক চাহিদা অনুযায়ী জাহাজ সরবরাহে অধিক মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। সময়সীমা যেহেতু আন্তর্জাতিক বাজারে কিংবা প্রফেশনালিজম রক্ষার্থে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। তাই এদিকেও বেশ সর্তকতা অবলম্বন জরুরি। যথাসময়ে সরবরাহ করা না গেলে আন্তর্জাতিক বাজারে গ্রহণযোগ্যতা হারাবো আমরা। একই সঙ্গে এই শিল্পের যথাযথ ব্র্যান্ডিং ও প্রচার-প্রসারে পর্যাপ্ত উদ্যোগ গ্রহণ করে সে অনুযায়ী কাজ করা উচিত প্রতিষ্ঠানগুলোর। মন্ত্রিসভা ‘জাহাজ নির্মাণশিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১’-এর খসড়ার অনুমোদন দিয়েছে। জাহাজরঞ্জনিতে বর্তমানের ১ বিলিয়ন ডলারের মার্কেট থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে বছরে ৪ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। চলমান সংকট কাটানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিলেও সেগুলোর ধীরগতির বাস্তবায়ন বড় একটি সমস্যা হিসেবে দেখা যায়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে হলে সবদিকেই সক্ষমতা দেখাতে হবে। প্রতিযোগী দেশগুলো যদি আমাদের বাজার ইতিমধ্যে দখল করে নেয়, তবে পুনরায় তা পুনরুদ্ধার করা মোটেই সহজ কাজ হবে না। সেদিকে বিবেচনায় দেশের বড় কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারের উচিত প্রয়োজনীয় সবধরনের সহায়তা প্রদান করা। জাহাজশিল্পে দক্ষ জনসম্পদ নিয়ে সরকারিভাবে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করলে একদিকে বেকারত্ব করবে, অন্য দিকে নির্মাতাপ্রতিষ্ঠানের জন্যেও তা সুবিধার হবে। উৎপাদনের ব্যয় কমাতে আমদানি প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে এবং ব্যাকওয়ার্ড শিল্পের বিকাশে নজর দিতে হবে। সঠিক পরিকল্পনা ও সহায়তা ছাড়া রঞ্জনি বহুমুখীকরণে জাহাজ শিল্পের সন্তাননা কাজে লাগানোর কোনো বিকল্প নেই।

লেখকঃ শিক্ষার্থী,  
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



# পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করবেন যেভাবে! সিফাত জামান মেগলা

আমরা অনেকেই পত্রিকায় লিখতে চাই। যদিও আমাদের সবারই মোটামুটি লেখার অভ্যাস আছে। কিন্তু পত্রিকায় লেখার কথা শুনলেই মনে হয় এর জন্য বড় মাপের পঞ্চিত হতে হবে। আসলে এটা একদমই নয়। তবে, একটি মানসম্পন্ন লেখা দাঁড় করাতে হলে বেশি বেশি বই ও অন্যের লেখা পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে। এক্ষেত্রে বেশি তথ্য জানার বিকল্প নেই।

যারা পত্রিকায় লেখালেখি করেন তারাও আপনার আমার মতো সাধারণ মানুষ। শুধু পার্থক্য হলো তার চর্চা আছে, আপনার নেই। তবে, শুরু করলে আপনারও চর্চা হবে। জেনে নেওয়া যেতে পারে কিভাবে সহজেই আমাদের লেখার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি।

মার্ক টয়েনের ভাষায়, ‘আপনি কখনোই দু’হাত পকেটে রেখে পুরো বিশ্বকে জানাতে পারবেন না।’ অর্থাৎ বিশ্বকে কিছু জানাতে হলে আপনাকে লিখতে হবে। তবেই মানুষ আপনার মনের ভাব জানতে পারবেন। আপনি কী বলতে চাচ্ছেন, তা বুবাতে পারবে।

লেখালেখির অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য প্রতিদিন লিখতে হবে। অন্তত পক্ষে ১০ লাইন লিখতে হবে। আমাদের আশেপাশে যা আছে বা ঘটছে, তাই নিয়ে লেখা শুরু করতে হবে। নিজের ভেতর সুপ্ত প্রতিভাকে বিকাশ করতে হলে, নিজেকে আবিক্ষার করতে হলে প্রতিদিন লেখার অভ্যাসের বিকল্প কিছু নেই।

লেখালেখি সম্পর্কে এক লেখকের বিখ্যাত উক্তি, ‘আমার মধ্যে যে লেখালেখির প্রতিভা আছে, তা আবিক্ষার করতে আমার ১৫ বছর সময় লেগেছিল। আর যখন মানুষ আমাকে লেখক হিসেবে চিনতে শুরু করেছিল, তখন আমি নিজেকে ফিরিয়ে আনতে পারিনি।’ লেখালেখির জন্য সর্বপ্রথম যে কাজগুলো করতে হবে।

## সংকোচ দূরীকরণ

লেখালেখি শুরু করার জন্য প্রথমে সংকোচ দূর করতে হবে। এমন যে আমি এটা লিখলে মানুষ কী বলবে, কে কী ভাববে, আমি কি এটা লিখবো? আবার নিজের ভেতরও অনেক সংকোচ তৈরি হয়। যেমন- আমি কি এটা পারবো? প্রথমেই এসব পরিহার করতে হবে। সব পিছুটান, সংকোচ ঝোড়ে ফেলতে হবে। তাই সবার প্রথম নিজের ভেতরের সংকোচ দূর করতে হবে। এজন্য প্রাচুর লিখতে হবে। প্রথমেই পাণ্ডিত্য দেখানোর প্রয়োজন নেই।

লেখালেখি এমন নয় যে, কঠিন কঠিন ভাষায় লিখতে হবে। গুরুগন্তীর ভাব দেখাতে হবে এমন নয়। সহজ-সাবলিল ভাষায় লিখতে হবে। এতে প্রাঞ্জলতা থাকতে হবে। তাই প্রথমেই পাণ্ডিত্য দেখানোর প্রয়োজন নেই।

## টপিক ঠিক করতে হবে

আপনি যে বিষয়ে আগ্রহী বা অনেক ভালো পারেন বা জানেন সেই বিষয়ে লেখা শুরু করতে পারেন। টপিক নির্ধারণ করতে গেলে প্রথমেই এই বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে, আপনি যে বিষয়ে অনেক বেশি জানেন, সেই বিষয়ে আগে লিখতে শুরু করতে হবে।

## সহজ টপিক নির্বাচন

অনেক সময় আমরা মনে করি, ভাষা অনেক গুরুগন্তীর বা কঠিন করলেই লেখা ভালো হয়ে যায়। অনেক ক্রিটিক্যাল বিষয় নিয়ে লিখতে হবে। ব্যাপারটা তা নয়। লেখা হতে হবে সহজ-সরল-সাবলীল।

অনেক বেশি পড়তে হবে

লেখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পড়া। যত বেশি পড়বেন, তত বেশি জানবেন বা শিখবেন, আর তত লিখতে পারবেন। তাই বেশি বেশি পড়তে হবে। সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় পড়ার বিকল্প নেই।

আর যখন যেটা মনে আসবে, তখন সেটাই লিখে ফেলতে হবে। কারণ একই জিনিস পরে সেইভাবে মনে করতে পারি না। আমরা জানি যে এই মহা বিশ্বের প্রতিটি জিনিস একটা-অন্যটার থেকে আলাদা। কারো সঙ্গে কারো মিল নেই। আমরা এখন যা ভাবি, কিছুক্ষণ পর সেই একই জিনিস একইভাবে চিন্তা করতে পারি না। প্রত্যেকটা জিনিস, প্রত্যেকটা চিন্তাভাবনা একটা থেকে অন্যটা আলাদা। তাই যখন যা মনে আসবে, তা খাতায় লিখে ফেলতে হবে।

পত্রিকায় লেখালেখি শুরুর জন্য চিঠিপত্র দিয়ে শুরু করা যায়। কেননা, চিঠিতে আপনি যাবতীয় সব কিছুই উল্লেখ করতে পারবেন।

## যেসব বিষয়ে লিখতে পারেন

১. ফিচার: কোনো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে তার সম্ভাব্য ফলাফল ও সমাধান।

২. কলাম: কোনো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে নিজের মতো একটা সমাধান দাঁড় করানো।

৩. চিঠি: সবকিছু চিঠিতে লেখা যায়।

৪. আন্তর্জাতিক বিষয়ে লেখা: যে কোনো আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে লেখা।

৫. সাম্প্রতিক বিষয়: সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কোনো বিষয়ে লেখা।

৬. ভ্রমণ কাহিনি: কোথাও ঘুরতে গেলে সেই অভিজ্ঞতা ও জায়গা নিয়ে লেখা।

৭. মানবিক বিষয় নিয়ে লেখা। আরও অনেক লেখার বিষয় রয়েছে। তবে নবীনদের জন্য এগুলোই সবচেয়ে ভালো।

এমন বই পড়তে হবে-

যা আমাদের জ্ঞান বাড়ায়। যা চিন্তা, কল্পনা শক্তি বৃদ্ধি করে। আমাদের শব্দ ভান্ডার বৃদ্ধি করে। মন্তিক্ষের কার্যক্ষমতা বাড়ায়। ত্রিটিক্যাল চিন্তা করার দক্ষতা বাড়ায়। আন্তসম্মানবোধ বাড়ায়। পরিনির্ভরতা কমায়। হতাশা দূর করে। এবং কর্মসূহাও বাড়ায়।

এই হলো মোটাদাগে লেখালেখির হাতেখড়ির ধারণা। একবার লেখার অভ্যাস হয়ে গেলে, তখন এমনিই লেখা হয়ে যায়। তখন অনায়াসেই যে কোনো কিছু লিখতে পারা যায়।

লেখকঃ শিক্ষার্থী, আইন বিভাগ,  
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়



# বাংলা ভাষার দৃষ্টিকারণ ও প্রতিকার

মো. আকিব হোসাইন

বাঙালি জাতির নিকট সবচেয়ে প্রিয় ভাষা হচ্ছে মাতৃভাষা বাংলা। আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কথা বলার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে থাকি। আমরা জন্মগ্রহণের পর সর্বপ্রথম মায়ের নিকট থেকে যে ভাষা শিক্ষার্জন করি সেটা হচ্ছে বাংলা ভাষা। এজন্য এ ভাষাকে মায়ের ভাষা বলে থাকি। আমরা আমাদের মনের ভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করার জন্য এই ভাষা ব্যবহার করে থাকি। তাই বাংলা ভাষা খুবই সম্মানিত ভাষা হিসেবে সুপরিচিত। অতি তৎপর্যবৃক্ষ কথা হচ্ছে এ ভাষা সহজে আমাদের নিকট আসে নি কিংবা সর্বজনীনতা লাভ করে নি। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ব্রিটিশ সরকার ভারত পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করে দেওয়ার পর পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন যদিও এ দেশের (পূর্ব পাকিস্তান) ৫৬ শতাংশ মানুষের নিকট বাংলা ভাষা ছিল প্রিয়। অন্যদিকে শতকরা ৭ শতাংশ মানুষের মুখের ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেও এদেশের ছাত্র, শিক্ষক কিংবা আপামর জনসাধারণ এর চরম বিরোধিতা করেন এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলনকে আমাদের বাঙালির জাতীয় জীবনের প্রথম সংগ্রাম বলা যায়। ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষার জন্য এদেশের ছাত্র, শিক্ষক থেকে শুরু করে আপামর জনসাধারণের আপ্রাণ চেষ্টায় বাংলা ভাষা এদের মানুষের নিকট প্রিয় ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বে আমরাই একমাত্র জাতি যারা মায়ের ভাষা, প্রিয় ভাষা ও মাতৃভাষা বাংলাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে বুকের তাজা রক্ত দিতে হয়েছে।

ভাষা আন্দোলনের ৬৯তম বর্ষে পদার্পণ করলেও অতি সাধারণভাবে লক্ষ করা যায় যে, এখনো বাংলা ভাষার পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি কিংবা বাংলা ভাষার পূর্ণ প্রয়োগ করা সম্ভব হয় নি। ভাষার অপব্যবহার, বিকৃতিসহ আর অনেক কিছু দৃশ্যমান। বর্তমানে নানানভাবে ভাষাকে বিকৃতি করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে ভাষাকে মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না বললেই চলে। কেননা, অতি সহজভাবে দেখা যায় দেশের সিংহভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ইংরেজিতে লেখা, বিভিন্ন সরকারি কিংবা বেসরকারি অফিস-আদালত সমূহের ইংরেজি নামকরণ, রাস্তার পাশে কিংবা দোকানপাটের ইংরেজি নামকরণ, পরিবহণগুলোতে ইংরেজিতে নামকরণ, বড় বড় কোম্পানিগুলোর প্রতিষ্ঠানের নামও ইংরেজিতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি মাধ্যমে পাঠদান, দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ইংরেজি মাধ্যমেই পড়ানো হয়। যদি এদেশের উচ্চ আদালতের রায় ইংরেজি মাধ্যমে লেখা হয়, বিভিন্ন চাকরির ক্ষেত্রে ইংরেজি কি সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়, বিভিন্ন প্রচার কিংবা বেতার পরিচালনার ক্ষেত্রে ইংরেজিতে কথা-বার্তার মাধ্যমে শুরু করা হয়।

বাংলা ভাষাকে ব্যবহারের পরিবর্তে অপব্যবহার করা হয় বলা যেতে পারে। তাহলে কি বাংলা ভাষা তার পূর্ণ মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে? তাহলে কি দরকার ছিল বাংলা ভাষাকে এদেশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বুকের তাজা রক্তে রাজপথ রাখিত করতে? কি দরকার ছিল পাকিস্তানের সিংহভাগ লোকের মুখের ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে ভাষা শহীদদের জীবন উৎসর্গ করতে? কি দরকার ছিল রাজপথে মিছিল করার

“রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই,

আমাদের দাবি আমাদের দাবি,

মানতে হবে মানতে হবে।”

তাহাড়া আমরা কথা বলার ক্ষেত্রে বাংলার সাথে দুই একটা ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ করাটা দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করেছি। বিভিন্ন অফিস-আদালতের দৈনন্দিন কাজকর্ম ইংরেজিতে পরিচালনা করা হয়, ব্যাংকের সকল কার্যক্রম ইংরেজিতে পরিচালনা করা হয়, খুদে বার্তা প্রেরণ করার সময় কিংবা পরম্পরাগত আলাপ-আলোচনায় ক্ষেত্রে বাংলার সাথে ইংরেজিকে মিশ্র করে উচ্চারণ করে থাকি। এটাকে আবার আমরা ‘বাংলিশ’ ভাষা নামে ডাকি। তবে এটা বেশিরভাগ আমাদের দেশের সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের মাঝে উপস্থিতি। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে তাহলে কি আমরা আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে মর্যাদাবান ভাষা হিসেবে বলতে পারি না?

বাংলার সাথে ইংরেজি, হিন্দি, আরবি, ফারসি কিংবা উর্দুর সংমিশ্রণ করার মাধ্যমেও ভাষাকে বিকৃত করতেছি। আবার কথা বলতে গিয়ে হায়, হ্যালো, হায় ভিড়য়ার্স, গুড মর্নিং, গুড নাইট বলতে গিয়ে ভাষাকে সম্মানের পরিবর্তে অসম্মান করতেছি। এভাবে আমরা নানান মাধ্যমে ভাষার অপব্যবহার করে থাকি। আর এগুলোই হচ্ছে ভাষাকে স্থতন্ত্র মর্যাদার পরিবর্তে ভাষার মৌলিকত্বের ক্ষুণ্ণ করা। আধুনিকতার নামে এরকম (বাংলা সাথে ইংরেজি, হিন্দি, আরবি, ফারসি) শব্দের সংমিশ্রণ বাংলা ভাষাকে ব্যাপকভাবে দূষিত করেছে কিংবা বিকৃত করেছে। বিভিন্ন গণমাধ্যমের বিজ্ঞাপন, নাটক, বা চলচিত্রের মিশ্রিত ভাষার প্রয়োগে বাংলা ভাষাকে দূষিত করেছে। বাংলা ভাষার ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে বলা যায়।

বাংলা ভাষার দৃষ্টি রোধে হাইকোর্টের নির্দেশনা রয়েছে। ২০১৪ সালে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করার আদেশ দেন। দেশে বাংলা ভাষা প্রচলন আইন-১৯৮৭ সহ অনেক সরকারি বিধিনিষেধ বিদ্যমান। এইসব আদেশ, নির্দেশ কিংবা বিধিনিষেধ শুধু নামমাত্র কিন্তু বাস্তবে মোটেও প্রচলিত নয়। বাংলা ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে। বাংলা ভাষার প্রতি আর যেন কোনো আঘাত না আসে সেই বিষয়ে সর্বোচ্চ সর্তক থাকতে হবে। এছাড়া আদালতে বাংলা ভাষার দৃষ্টি, বিকৃত উচ্চারণ, ভিন্ন সুরে বাংলা ভাষার কথন ইত্যাদি বিষয়গুলো পরিত্যাগ করতে হবে।

উল্লেখ্য, বাংলা ভাষাকে তার পূর্ণ মর্যাদা দিতে হবে। ভাষার অপব্যবহার রোধ করার জন্য দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রমিত বাংলা ভাষা চর্চা কেন্দ্র স্থাপন করা জরুরি। সকল শিক্ষালয়ে প্রমিত বাংলা নামে একটা কোর্স চালু করতে হবে। পাশাপাশি দেশের বেসরকারি

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রমিত বাংলা ভাষা নামে কোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে নানানভাবে ভাষাকে অসম্মান করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সম্মেলনে বাংলায় ভাষণ দিয়েছেন। এটা হচ্ছে বাংলা ভাষার প্রতি সম্মান আর ভালোবাসা।

তাই আসুন ভাষার উপর্যুক্ত ব্যবহার করি, শুন্দি উচ্চারণ করি, শুন্দি ভাষায় সকল কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ভাষাকে সম্মান করি। প্রিয় মাতৃভাষাকে ভালোবেসে ভাষা শহীদদেরপ্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। কেননা, তারা আমাদের গর্ব এবং অহংকার। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ভাষাকে সম্মানের পরিবর্তে অসম্মান করতেছি অধিক। সুতরাং আমাদেরকে বাংলা ভাষার প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা জাগ্রত করতে হবে।

শিক্ষার্থী, ঢাকা কলেজ।

প্রকাশ তথ্যঃ

পত্রিকাঃ দৈনিক ডেল্টা টাইমস

তারিখঃ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১



# হোয়াইট হাউসে বাইডেন/অপ্রতিরোধ্য পুতিন ও আগামী বিশ্ব

## মো.জামিন আহমেদ

অবশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের সবচেয়ে আলোচিত-সমালোচিত প্রেসিডেন্ট ডেনাল্ট ট্রাম্পের পতন হলো। ৪৬ তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন জো বাইডেন। এটা সবারই জানা যে, ট্রাম্প আমলে বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ছিলো অনেকটা লেজেগোবরে। তবে বাইডেনের পূর্ব রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দক্ষতা থাকায় মার্কিনিঠা এবার আশার আলো দেখতে পারে। বাইডেনের জয়ে আমেরিকানরা আনন্দের ভাসলেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দীদের কপালে ঠিকই চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। বিশেষ করে চিরবৈরী শক্তি রাশিয়ার জন্য এটা অশনিসংকেত। ট্রাম্পের দূর্বলতার সুযোগে বিশ্বে পুতিন যেভাবে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিলেন, তবে কি তা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লো? সুতরাং ট্রাম্প

পরবর্তী সময়ে বিশ্বে তথা মধ্যপ্রাচ্যের

রাজনীতির মেরুকরণ নিয়ে নতুন করে হিসাব মেলানোর সময় এসেছে।

বাইডেন ও পুতিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ইতিহাস তুলনা করলে দেখা যায়, হোয়াইট হাউস অধিপতি ক্রেমলিন অধিপতির চেয়ে এগিয়ে। জো বাইডেনের ১৯৭০ সালে সিনেটর হওয়ার মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে অভিষেক হয়। অন্যদিকে পুতিন ১৯৮৫ সালে রুশ গোয়েন্দা বিভাগে যোগ দেওয়া একজন কর্মকর্তা মাত্র। ১৯৯০ সালে সোভিয়েত পতন পরবর্তী সময়ে রাশিয়ায় গণতন্ত্র চালু হলে পুতিন ১৯৯৯ সালে বরিস ইয়েৎসেলিন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হবার সুযোগ পান। আবার জো বাইডেন ওবামা সরকারের দু মেয়াদে( ২০০৯-২০১৭ সাল) ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। তবুই নেতার পূর্ব রাজনৈতিক অতীত বিশ্লেষণ করে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এটিকেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আধিপত্যের লড়াই এর সাক্ষী হতে যাচ্ছে বিশ্ববাসী।

পুতিনের উত্থান অনেকটাই নাটকীয়। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণকালে তখনও অধিকাংশ রুশ জনগণের কাছে অচেনা ছিলেন তিনি। অনেকটা আচমকা ইয়েৎসেলিন পদত্যাগ করলে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পথ সুগম হয় পুতিনের। সম্ভবত এ সময় ক্ষমতায় বসেই নিজের গদি আয়ত্যু ধরে রাখতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সেরে ফেলেছিলেন দূরদৃশী পুতিন। পুতিন ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন, দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকতে হলে জনগণের আঙ্গ অর্জনের বিকল্প নেই। আর তাই সন্ত্রাসী কার্যক্রমের ধূয়ো তুলে চেচনিয়ার রাজধানী গ্রোজনিতে আক্ৰমণ চালান। তখনই রুশ জনগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, একমাত্র পুতিনই পারে তাদের সুরক্ষা দিতে। ২০০৮ সালে জর্জিয়া এবং ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া দখল করে আবারও বিপুল জনপ্রিয়তা নিজের বুলিতে যুক্ত করেন পুতিন। নিজের গদি পোক্ত হওয়ার পরপরই সোভিয়েত ইউনিয়নের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার ও রাশিয়াকে পুরাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বিশ্বরঙ্গ মধ্যের মাঠের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করেন।

পুতিনের সাম্প্রতিক তৎপরতায় আলোকপাতে এটা পরিষ্কার যে, তিনি রাশিয়াকে বিশ্বে সুপার পাওয়ারে অধিবীয় করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ কিংবা এশিয়া কোথায় নেই পুতিন! গত দু দশক ধরে বিশ্বমধ্য থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখার পর ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সিরিয়ায় রুশ সেনা পাঠান পুতিন। ধারণা করা হয়, ইরানের অনুরোধে সাড়া দিয়ে পুতিন এত বড় চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করেছিলেন। মূলত এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতিতে পূর্বে থেকেই ইরান আতঙ্কে ছিল। ইরান তড়িঘড়ি করে কাশেম সুলাইমানীকে (পরবর্তীতে ২০২০ সালের ৩ জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রূন হামলায় নিহত) পাঠিয়ে পুতিনকে রাজি করাতে সক্ষম হয়। তখন মধ্যপ্রাচ্যে রুশদের উপস্থিতিকে ইরানের পাশাপাশি স্বাগত জানিয়েছিলো ইরাক ও লেবাননের হিজুল্লাহও। সিরিয়ায় রাশিয়ার বিমান ও নৌ ঘাঁটি তৈরি করলে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযান হুমকির মুখে পড়ে। তবে একথা আসাদের মনে রাখতে হবে যে, প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের গদি ঠিক রাখা নয়, সিরিয়ায় অভ্যন্তরীণ হস্তক্ষেপে বজায় রাখাই ছিলো পুতিনের মূল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি পশ্চিমাদের রাশিয়ার শক্তিমত্তা প্রদর্শন করার বিষয়টি তো আছেই। এ অঞ্চলে আরব বসন্তের নামে পশ্চিমি ষড়যন্ত্রে কিছুটা হলো তখন জল ঢেলে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন পুতিন। আসাদের শাসন বজায় রাখলেন সেইসাথে সিরিয়ার মাটিতে পশ্চিমা সমর্থিত বিরোধীদের কেণ্ঠাসা করতে সক্ষম হলেন। এর মধ্য দিয়ে স্নায়ু যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে পুতিন আন্তর্জাতিক অঙ্গনের এক মেরুর রাজনীতির প্রতি অনেকটা চ্যালেঞ্জই ছুড়ে দিলেন। এদিকে আরব বসন্তে প্রায় সব একনায়ক সরকারের পতন হলো আসাদের গদি এখনো ঠিকই আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তখন একটি মজার বিষয় ঘটেছিল, সেটি হলো ঐ সময় সিরিয়ায় রুশ বাহিনীর সাথে আসাদের সেনাবাহিনীর একটি প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। দেখা যায়, প্যারেডে রুশ বাহিনীর সাথে আসাদের সেনাবাহিনী পা মেলাতে পারছিলো না! আসাদের সেনাবাহিনী যখন বিরোধীদের হাতে পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে তখন পুতিনের আগমন পরিস্থিতি পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছিল। বলাই বাহুল্য, পুতিন এগিয়ে না আসলে হাফিজ আল আসাদের পুত্র আসাদের ইতিহাস ভিন্নভাবে রচিত হতো। সর্বশেষ ২০২০ সালের ডিসেম্বরে, পুতিন আসাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিশ্বকে বুঝিয়ে দিলেন, মধ্যপ্রাচ্যে থেকে আপাতত বিদায় নিচ্ছেন না তিনি।

আমরা জানি, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ইউরোপের অবস্থান কৌশলগত ভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুইটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়ানক অভিজ্ঞতা আছে ইউরোপের। উল্লেখ্য, সে সময় পশ্চিমি দেশের রাজধানীর দিকে তাক করে মোতায়েন ছিল রুশ পরমাণু অস্ত্রবাহী ক্ষেপণাস্ত্র। প্রসঙ্গত কারণেই রাশিয়ার সাথে সীমান্ত থাকায় ইউরোপের দ্বন্দ্ব নিয়মিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন, ইউরোপের দেশ ইউক্রেনে ২০১৪ সালের ক্রেত্যান্বয়ী মাসে রুশপক্ষ প্রেসিডেন্ট ইয়ানকোভিচের পতনের এক সংগ্রহে সীমান্তে সেনা মোতায়েন করেন

পুতিন। এর পরের মাসেই অর্থাৎ মার্চে ক্রিমিয়া দখল করেন। সেই সাথে রূশপন্থি বিদ্রোহীদের সহায়তা করতে থাকেন পুতিন। ফলে ইউক্রেনে সরকার বনাম রূশপন্থি বিদ্রোহীদের মধ্যকার লড়াই দীর্ঘায়িত হয়। পরবর্তীতে ২০১৮ সালে ডিসেম্বরে আজেটিনার রাজধানী বুয়েন্স আয়ার্সে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে পুতিন বলেন, ইউক্রেনে পাশ্চাত্যপন্থি রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় থাকলে সমস্যার সমস্যা হবে না। এবিধে ইউরোপের আরেক প্রভাবশালী দেশ যুক্তরাজ্যের সাথেও বিরোধ হয় পুতিনের। বিরোধের সূত্রপাত্র হয় ২০১৮ সালের মার্চে সাবেক গোয়েন্দা রূশ গোয়েন্দা সেগেন্ট স্কীপালের উপর হামলাকে কেন্দ্র করে। তখন তেরেসা মের সরকার রাশিয়াকে সরাসরি দায়ী করেন উপরন্ত ২৩ জন কৃটনীতিককে বহিকার করেন। যুক্তরাজ্য রাশিয়াকে কতটুকু হৃষকিতে দেখে তা ব্রিটিশ সেনাপ্রধান মার্ক কার্ল্টনের একটি মন্তব্যে তা স্পষ্ট হয়। তিনি ঐ বছরের নভেম্বরে বলেন, রাশিয়া আইএসের চেয়ে বড় হৃষকি! এ অঞ্চলের আরেক উদীয়মান শক্তিশালী দেশ তুরস্কের সাথে ২০২০ সালের আগস্ট মাসে গ্রিসের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। দ্বন্দ্ব চলাকালীন সময়ে রাশিয়া তুরস্ককে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এস-৪০০ দিতে সম্মত হয়। অথবা ২০১৮ সালে সিরিয়া যুদ্ধে রূশ বিমান তুরস্ক ভূপাতিত করলেও পুতিন কৌশলগত সম্পর্ক রক্ষায় মূলত এ কাজটি করেন। তুরস্ক ও সাইপ্রাসের বিরোধ বহু পুরণো। এখানেও বিরোধ মেটাতে এগিয়ে আসেন পুতিন। এর ফলে সাইপ্রাসের সাথে দহরম মহরম সম্পর্ক স্থাপিত হয় রাশিয়ার। তার প্রমাণ মেলে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট আনাস্তাসিয়াদাসের রূশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ল্যাভেলভের হাতে গ্র্যান্ড ক্রস উপহার তুলে দেওয়ার মাধ্যমে। তুরস্ক ও সাইপ্রাস তথা এই দুদেশের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে মূলত শ্যাম এবং কূল দুই ই রাখলেন পুতিন। এবিধে আবার সাবেক সোভিয়েত ভুক্ত দেশ আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান সাথে যুদ্ধ শুরু হয় গত বছরের অক্টোবর মাসে। উল্লেখ্য, আর্মেনিয়ায় রাশিয়ার সামরিক ঘাঁটি আছে। পুতিন এখানেও দু পক্ষে শান্তি চুক্তির মাধ্যমে সমাবোতা করে দেন।

পুতিন সম্প্রতি এশিয়াতেও প্রভাব বিস্তারে উঠে পড়ে লেগেছেন। বলা হয়ে থাকে, যুক্তরাষ্ট্র ভারতের চশমা দিয়ে এশিয়াকে দেখে। এবার তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক মিত্র ও এশিয়ার অন্যতম পরাশক্তি ভারতের কাছে এস-৪০০ বিক্রির চুক্তি করে ফেললেন। আনন্দ বাজারের খবর অনুযায়ী, ভারত ২০২৫ সালের মধ্যেই এস-৪০০ পেতে যাচ্ছে। এ চুক্তিটি এমন সময় হলো যখন ট্রাম্পের বিদ্যায় ঘন্টা বেজে গেছে এবং বাইডেন নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্র বিষয়টি হালকা ভাবে নেয়ানি এবং দেরি না করে ভুশিয়ারি উচ্চারণ করে। দেখা যাচ্ছে, পুতিন এখানেও দাবার গুঁটি সুনিপুণ ভাবেই বসালেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, পুতিনের কার্যক্রমে সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার জারদের প্রভাব স্পষ্ট। পরাক্রমশালী রূশ জারদের যে *Warm Water Policy* স্টেটই তিনি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। বিশেষ করে ভূমধ্যসাগরে সেটা তিনি বেশ সফলভাবেই করছেন। তবে বাইডেন প্রেসিডেন্ট হওয়ায় পুতিনের জন্য কতটুকু চ্যালেঞ্জ তৈরি করলো সেটা সময়ই বলে দেবে। আবার আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, আমেরিকার ২০১৬ সালের নির্বাচনে পুতিন যা করেছেন, এরপর তার পক্ষে অসন্তুষ্ট বলে কিছু নেই, তাও প্রমাণিত হয়ে গেছে।

লেখকঃ

শিক্ষার্থী, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিজয়



# বাধের খাবার বনাম টিভির রিমোট

## মোমেনা আকত্তার

সন্ধ্যা নামলেই ঘরের নারী সদস্যরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন টিভির রিমোট নিয়ে। কারণ তখন চলে ভারতীয় টিভি সিরিয়াল। গৃহবধূ কিংবা ঘরের পরিচারিকা, ছোট-বড় সবাই এই ভয়াবহ নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে। সিরিয়ালের নেশায় সন্ধ্যা থেকে রাত অবধি বুদ্ধি হয়ে থাকেন তারা। যেন সিরিয়ালের সেই পরিবারের একজন হয়ে ওঠেন নিয়মিত দর্শক, যা তাদের প্রাত্যক্ষিক জীবনের ওপরও নানাভাবে প্রভাব ফেলছে। আর এ প্রভাবগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে বেশিরভাগই নেতৃত্বাচক প্রভাবে পরিণত হয়েছে। এ নেশায় বেশি জড়িয়ে পড়ছেন নারীরা। আর তাদের সাথে থাকা শিশুরাও অনেকক্ষেত্রে এসব সিরিয়ালের ভক্ত হয়ে উঠেছে। স্টার জলসা, স্টার প্লাস, জি বাংলা, জি টিভি, সনি- এসব চ্যানেল যেন এখন রমনীদের কাছে নিয়ন্ত্রণের কাজের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রান্না কিংবা খাওয়া হোক বা না হোক, এসব চ্যানেলে অনুষ্ঠিত নাটক তাদের দেখা চাই-ই চাই।

আজকের দিনগুলোতে এই নাটকগুলোর প্রভাব কেমন পড়েছে, তা আশপাশে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে যায়। কোন উৎসবকে সামনে রেখে চলে এসব সিরিয়ালের নায়িকা কিংবা আকর্ষণীয় কোন নারীর নাম অনুসারে পোশাক বিক্রির হিড়িক। প্রতিটা সিরিয়ালেরই বিষয়বস্তু হলো পরকীয়া, স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস, নারী-পুরুষের অবাধ মিলন, তুচ্ছ কারণে খুন, নির্যাতন, পরচর্চা ইত্যাদি। আর এসব দেখে দেখে আমাদের নারী ও পুরুষরাও অনুকরণ করছে। একটা সংসার কীভাবে নষ্ট করা যায় তার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব উপায়ই এই সব সিরিয়ালে দেয়া আছে। আর অনেক নারী-পুরুষ সেগুলো গোপ্তাসে গিলছে। অনেকে বলছেন, আমাদের মিডিয়া ভালো কিছু দিতে পারছে না বলে এইসব ভারতীয় সিরিয়াল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু মনে রাখা জরুরি যেকোন মন্দ জিনিসেই আসক্তি বা নেশা হয়। ভাল বিষয়ে হয় না। এদিকে, ভারতীয় এসব চ্যানেলের কারণে আজ ভূমকির মুখে বাংলাদেশি চ্যানেলগুলো। ভারতীয় চ্যানেলের ভিড়ে বাংলাদেশি চ্যানেলগুলো এখন হারিয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি আজ ভূমকির মুখে। বাঙালির অনেক উৎসবে নারীকে এখন আর দেখা যায় না চিরচেনা বাঙালির রূপে। দেখা যায় না সেই পোশাকে, না সেই সাজ-সজ্জায়। সবাই ভারতীয় অমুক সিরিয়ালের কায়দায় সাজবে, তাদের এই অনুষ্ঠান বা ওই অনুষ্ঠানের অনুকরণে আনুষ্ঠানিকতাও করবে। এমনকি এখন বিয়ের আয়োজনেও বর-কনের আগ্রহে কিংবা তাদের পরিবারের সদস্যদের আগ্রহে বিয়ের সাজ-সজ্জা থেকে শুরু করে সেট ডিজাইনও হয় ভারতীয় সংস্কৃতির আদলে। বিয়ের রীতিতেও আধুনিকতার নামে ঢুকে যাচ্ছে ভারতীয় রীতি।

দামি পোশাক সাধারণ পরিবারগুলো কিনতে না পারার কারণে তৈরি হচ্ছে অসহিষ্ণুতা আর ঘটছে নিত্য নতুন অপরাধ। আর সব মিলিয়ে বর্তমানের অস্ত্রিতার জন্যও দায়ি এসব সিরিয়াল। শুধু সংসার আর অপরাধের মধ্যেই এখন আর সীমাবদ্ধ নেই এসব সিরিয়াল। বাচ্চাদের পড়ার বইয়েও রয়েছে এসব সিরিয়ালের কাহিনি। লেখার খাতার উপরও রয়েছে এসব সিরিয়ালের নায়ক বা নায়িকাদের ছবি। পেপ্পিলেও থাকে ভারতীয় সব কার্টুন ছবির স্টিকার।

মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, যেহেতু বাংলাদেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত অনেক নারীই এখন মন্ত্রমুক্তের মতো টিভি সেটের সামনে রিমোট হাতে বসে ভারতীয় হিন্দী, বাংলা সিরিয়াল দেখতে থাকেন, তাই একই বিষয় বারবার দেখতে দেখতে তাদের মনোজগতে বিষয়গুলো এমনভাবে গেঁথে যায় যে, তারা নিজেদের অজান্তেই অর্থাৎ নারীদের অবচেতন মনেই বিষয়গুলো নিজ দায়িত্বে জায়গা করে নেয়। এবং তারা এগুলোকে যাপিত জীবনে ব্যবহার করে থাকে।

সংস্কৃতিসেবীরা এই বিষয়টিকে দেখছেন মহামারি আকারে। কারণ হিসেবে তারা বলছেন, ভারতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসন সমাজের রক্ষে রক্ষে এতই প্রকট আকার ধারণ করেছে যে, কোন প্রতিমেধকই এখন আর কাজ করছে না। অভিজ্ঞত শ্রেণী থেকে শুরু করে একেবারেই প্রতিত শ্রেণি সবাই আসক্ত হচ্ছে। আমাদের বাচ্চারা এখন মায়ের ভাষা বাংলা শিখার আগেই হিন্দিতে কথা বলা রঞ্জ করে ফেলছে। এখনকার নারীদের আড়া কিংবা বৈঠকের অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে অমুক চ্যানেলে অমুক সিরিয়ালের আলাপন। যেখানে সংসারের নানান অশান্তি, ভয়ংকর ঘড়িযন্ত্র, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঝগড়াসহ নানান বিষয়ের উপস্থিতি মেলে। এর আগে, ভারতীয় সিরিয়াল ‘বোঝে না সে বোঝে না’র নায়িকা পাখির নামকরণে, ‘পাখি থ্রি-পিস’ কিনে না দেওয়াতে আত্মহত্যা করে বাংলাদেশের এক কিশোরী। পাখি থ্রি-পিস কিনে না দেওয়ায় স্বামীকে তালাক দেওয়ার মত ঘটনাও ঘটেছিল বাংলাদেশে। শুধু যে মেয়েদের মাঝে এই প্রভাব পড়ছে তা নয়, প্রভাব পড়ে ছেলেদেরও ওপরেও। ৭ বছরের একটি ছেলেকে সিরিয়াল দেখার সুযোগ না দেওয়ায় বাবা-মায়ের ওপর অভিমান করে আত্মহত্যা করে সে। শুনতে অবাস্তব মনে হলেও ঘটনাগুলো সব বাংলাদেশেরই।

আগামতদৃষ্টিতে বিষয়টি নিছক বিনোদন মনে হলেও, ভারতীয় সিরিয়ালগুলোর বিষাক্ত প্রভাব ফেলছে বাংলাদেশী দর্শকদের মনে। সামাজিক সম্পর্কগুলোকে নষ্ট করছে সিরিয়ালগুলো। এসব দেখে তারাও ধাবিত হচ্ছে বাংলাদেশের সংস্কৃতির বিপরীত ধারায়।

বিশ্বায়নের এই যুগে নিজেকে গুটিয়ে রাখার সুযোগ যেমন নেই, তেমনি অন্যদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ারও সুযোগ নেই। তাই নিজের দেশ ও সংস্কৃতিকে ভালোবেসে, অন্যের ভালোটা নিয়ে যদি আমরা সম্মত হওয়ার চেষ্টা করি তাহলে হয়তো ভারতীয় সিরিয়ালগুলোকে আর দোষারোপ করতে হবে না। তাই নারীদের যার যার অবস্থান থেকে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিকর মানসিকতার ভারতীয় নাটক পরিহার করে দেশীয় সংস্কৃতির লালন ও বিকাশে এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

শিক্ষার্থী- শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

প্রকাশকাল - ০৫/০১/২০২১

‘দৈনিক স্বাধীন বাংলা’

## মধু মাসে বধু হাসে তাসনিম হাসান মজুমদার

চৈত্র মাস হচ্ছে মধুমাস। ... এভাবেই জৈষ্ঠ মাসের সঙ্গে মধুমাস বিশেষণটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। তারা বোঝাতে চান-জৈষ্ঠ মাসে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, তরমুজ, ডেউয়া, লটকন, গোলাপ জাম, বেতফল, গাব, জামরংল, আতাফল, কাউ, শরীফা প্রভৃতি ফল পাওয়া যায়। বিশিষ্ট লেখক গণ বলেন যে, চৈত্রই হচ্ছে মধুমাস। তবে এখন জৈষ্ঠমাস ই বেশি মধুমাস হিসেবে প্রসিদ্ধ। যদিও তা সঠিক নয়। আমরা বাঙালিরা তৌর গরমে বিভিন্ন ধরনের ফল ফলাদি খেতে পছন্দ করি। আবার অনেকে সারা বছর অপেক্ষমান থাকে যে, কখন মধুমাস আসবে? নানা ধরনের ফল ফলাদি খাবে। বিশেষ করে আমরা আম, জাম, তরমুজ, লিচু, কাঁঠাল, ডেউয়া ও গাব অপরিচিত পরিচিত ফল ফলাদি খাওয়ার জন্য অপেক্ষমান থাকি। তবে আমাদের বাঙালীদের মাঝে বিশেষ করে আমের জন্য একটা ফ্যান্টাসী কাজ করে। শিশু থেকে বৃদ্ধ, আবাল- বনিতা সবাই আম খেতে পছন্দ করি। বাংলাদেশের উভরবঙ্গের বিশেষ করে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে বেশি আম উৎপাদন হয় ও ফলন ভালো হয়। রাজশাহীর আম দেশের অভাব মিটিয়ে বিদেশেও রঞ্জনী করতে দেখা গেছে। আমরা দেশে নানা ধরনের আম গাছ দেখতে পাই বা নানা প্রকারের আমরা দেখতে পাই তার মধ্যে বারোমাসি কিছু আম গাছ আছে। প্রায়শই দেখতে পাই যে ইউরোপ অঞ্চল বারো মাসি কিছু গাছে আম ধরে। প্রায়ই দেখতে পাই ইউরোপীয় সেলিব্রেটিরা তারা বারোমাসি আম খাচ্ছে, বিশেষ করে একজনের নাম উল্লেখ করতে হয়। ওয়েষ্ট ইন্ডিজ দলের সাবেক ক্রিকেট অধিনায়ক দু-দুবার এর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ড্যারেন স্যামি কথা, উনাকে প্রায় বছরের অধিকাংশ সময় আম খেতে দেখা যায়। উনি আম খেতে খুব পছন্দ করেন। বিশেষ আমপ্রেমী বলা চলে ওনাকে। তিনি বিভিন্ন দেশ থেকে আম সংগ্রহ করেন তার ভৱ্তবের থেকে বা নিজে কিনে আম সংগ্রহ করে সারা বছর আম খেতে পছন্দ করেন। ড্যারেন স্যামি যখন আম খাওয়া শুরু করেন, একসাথে তিনি ১৪-১৫ টা খেয়ে ফেলেন। আমি লক্ষ করেছি তার ছেট ছেলে রিং ও খুব আম প্রেমি ও আম খেতে পছন্দ করে। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে খুব আম খেতে পছন্দ করি। বিশেষ করে আম্রপালি ও ফজলি আম আমার বেশ পছন্দ। বাংলাদেশ নানা প্রকারের নানা প্রজাতির আম পাওয়া যায়। আমি এখানে বেশিকিছু আমের জাতের নাম উল্লেখ করলামঃ বড় ভুলানি, বৃন্দাবনি, গোলাপবাস, টিক্কাফারাশ, মতিচুর, দুধিয়া, দাদভোগ, গোডভোগ, ফুনিয়া, দিলশাদ, কাঞ্চন খোসাল, সিন্দুরি, খুদি ক্ষিরসাপাত, গোলাপ খাস, দুধিয়া, দেওভোগ, দুধস্বরসহ এমনি প্রায় দেশীয় আমের উল্লেখযোগ্য জাতগুলো হলো ল্যাংড়া, ক্ষিরসাপাত, গোপালভোগ, ফজলি, আশ্বিনা, বোম্বাই, অগ্নি, অমৃত ভোগ, আলফাজ বোম্বাই, আতাউল আতা, আরিয়াজল, আরাজনমা, আলম শাহী, কাঁচামিঠা, ক্ষিরমন, ক্ষির টাটটি, ক্ষির বোম্বাই, বেলতা, হাড়িভাঙ্গা, বৈশাখী, গোড় মতি, হক্কা, লাড়ুয়ালী, ডালভাঙ্গা, মঞ্জ, মিছরী দমদম, নীলামৰী, মধুচুষকি, মধুমামি, নকলা, মোহিনিসিন্দুরী, ভুজাহাড়ি, সন্ধ্যাভারতি, পদ্মমধু, অমৃতভোগ, লতারাজ, বৃন্দাবনি ইত্যাদি। আমাদের সকলেরই ছেটবেলায় আম কুড়ানোর বিশেষ স্মৃতি রয়েছে। যেমন আমি আমার নিজের ছেটবেলার অভিজ্ঞতার কথা বলি, ভোরের আলো যখন পথিকীতে পড়তো, তখন চূপিসারে ঘরের দরজা খুলে বের হয়ে পরতাম আম কুড়াতে। আম কুড়ানোর মাঝে বিশেষ একটি আনন্দ ছিল, প্রতিযোগিতা ছিল। কে কার আগে সুম থেকে উঠে আম কুড়াতে যাবে। কে সবচেয়ে বেশি আম কুড়াবে। কার কতগুলো আম হবে। এগুলোর মধ্যে বিশেষ আনন্দ - সুখ বিদ্যমান ছিল। আপনার শৈশবে আপনি যদি কারো আম গাছে ডিল না মারেন বা কাউকে না জানিয়ে কারো আম আপনি নিয়ে না আসেন তাহলে আপনার শৈশব খুব একটা আনন্দের কাটোনি। যদিও আমি কারো গাছে ডিল মেরেছি কিনা আমার মনে পড়েছে না। কিন্তু, আমি ভোর বেলায় ও বৃষ্টির সময় আম কুড়াতাম। আম কুড়ানোর মাঝে বিশেষ প্রতিযোগিতা, বলা চলে একে অপরের সাথে স্নায় যন্ম চলতো। বিভিন্ন সময়ে আম কুড়াতাম। ফজরের পর, দুপুরে-সন্ধ্যায় কিংবা রাতেও। আমাদের মসজিদে পাশে একটা আম গাছ আছে, ছেটবেলায় আম পরার শব্দ পেলে বন্ধুরা নামাজ ছেড়ে দিয়ে আম কুড়ানোর জন্য দোড় দিতাম। এসব আনন্দ মধুমাসকে কেন্দ্র করেই। নতুন জামাই মধুমাসে বিয়ে করার পর বাজার থেকে কিংবা নিজের গাছের আম নিয়ে বেড়াতে যান শুশুর বাড়িতে। এই নতুন আম-মিষ্টি আম দেখে নতুন বধুর মুখে হাসি ফুঁটে। এত আমের সুন্দর স্মৃতি মিষ্টি মধুর খুনসুটি আছে সবার জীবনে। এর মাঝেও আমরা মাঝেমধ্যে বিষাক্ত আম খাই। অসাধু ব্যবসায়ীরা আমের মধ্যে নানা ধরনের মেডিসিন ফরমালিন মিথিয়ে বাজারে বিক্রি করে অধিক মুনাফার জন্য। বাজার তদারকিতে থাকা ম্যাজিস্ট্রেটদের কিংবা অন্যান্য সংস্থার যারা নিরাপদ খাদ্য মানুষের জন্য নিশ্চিত করেন তাদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ থাকবে যে, কোনো প্রকার বিষাক্ত আম অসাধু ব্যবসায়ীরা যাতে বিক্রি করতে না পারে সেদিকে তৎপর থাকার জন্য।

শিক্ষার্থী, ইংরেজি বিভাগ, চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম  
ও সদস্য, কেন্দ্রীয় সম্পাদকীয় পর্ষদ।

# উদাসীনতা আৰ অনিয়মেৰ শেষ কোথায়?

## সাদিয়া কারিমুন

আজ আমৱা সত্যিই গৰ্বিত বাঙালি। স্বাধীনতাৰ ৪৮ বছৰে আমাদেৱ উন্নয়নেৰ ধাৰাবাহিকতা চলমান। অৰ্থনীতিৰ সূচকগুলোৱ অবস্থানও অনেকটাই চোখে পড়াৱ মতোই। বাড়ছে বিদেশি বিনিয়োগ, সৱকাৱেৱ নানান তৎপৰতা এবং সেইসঙ্গে জনগণেৰ আশা-আকাঙ্ক্ষা। অবশ্যই তা সৱকাৱি বিভিন্ন আয়োজনকে ঘিৱে। এৱ পাশাপাশি সামাজিক নিৱাপত্তাৰ অবস্থান এবং পৱিত্ৰিতা সঠিকভাৱে বিশ্লেষণেৰ সময় এখনই। এখন প্ৰশ্ন এটা দাঁড়াছে যে, এত উন্নয়নেৰ মাঝে সামাজিক নিৱাপত্তা কতটুকু নিশ্চিত হচ্ছে? অৰ্থাৎ আমৱা সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনে কতটুকু নিৱাপদ বোধ কৱছি! এটাৱ সৱকাৱেৱ প্ৰতি জনগণেৰ বিশ্বাস জন্মানোৱ ক্ষেত্ৰে গুৱৰ্ত্তপূৰ্ণ বিষয়গুলোৱ মধ্যে অন্যতম একটি।

বাংলাদেশ ২০১৯ সালে বিশ্বেৰ ৪১ তম বৃহত্তম অৰ্থনীতিৰ দেশে উন্নীত হয়েছে। ২০৩৩ সালেৰ মধ্যে বাংলাদেশেৰ ২৪ তম স্থান দখল কৱে বিশ্বেৰ শীৰ্ষ ২৫ টি বৃহত্তম অৰ্থনীতিৰ দেশেৰ তালিকায় প্ৰবেশ কৱবে বলে আশা কৱা যাচ্ছে। উন্নয়নেৰ একটি গ্ৰহণযোগ্য সংজ্ঞাতে বলা আছে, অৰ্থনীতিক উন্নয়নেৰ পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নকে অবশ্যই পৱিত্ৰিতা এবং বাস্তবায়নেৰ আওতায় রাখতে হবে। যদি গেল মাসেৰ সাৰ্বিক পৱিত্ৰিতা আমৱা শুধু সড়ক দুৰ্ঘটনা ও অপ্রত্যাশিত অগ্ৰিকাণ্ডেৰ ঘটনাগুলোকে বিবেচনায় রেখে বিচাৱ কৱতে যাই, তাহলেও দেশ আজ মাৰাত্মক বিপৰ্যয়েৰ সম্মুখীন। ভুলগুলো কিন্তু আজকেৱ কৱা নয়, হঠাত্ খেকে এসব দুৰ্যোগ শুৱত্বও হয়নি। এখন যা হচ্ছে সেগুলো পূৰ্বৰূপ অসচেতনতা ও ভুলেৱ মাশুল। **[[উদাসীনতা]]** আৱ **[[অনিয়ম]]**, শৰ্দ দুটি আমাদেৱ দেশেৰ বাঙালিৰ তথা অধিকাৎশ মানুষেৰ মধ্যে জেঁকে বসেছে। সৱকাৱি, গণমাধ্যম আৱ জনগণ যেটুকু কৱছে তাৱ অনেকটাই এৱ তয়ক্ষণ থাবায় আসল উন্নয়নকে ব্যাহত কৱছে। কোনো দুৰ্ঘটনা ঘটলে সারাদেশে কয়েকটি বিষয় মাথায় রেখে বিশ্লেষণ হয়। যেমন- পূৰ্বে কি কৱা উচিত ছিল, কৰ্তৃপক্ষেৰ দ্বাৰা কি কৱা হয়েছে এবং প্ৰেক্ষাপটকে ঘিৱে কি কৱা উচিত? এই বিশ্লেষণ কতটা ফলপ্ৰসূ হচ্ছে তা প্ৰমাণসাপেক্ষ। তাই উন্নয়ন প্ৰশ্নবিদ্ব হওয়াটা স্বাভাৱিক। সঠিক চিত্ৰ তুলে ধৰাৱ জন্য জনগণেৰ মধ্যে একটি গবেষণা চালানো যেতে পাৱে যে, তাৱ মানসিকভাৱে কতটুকু নিৱাপদ বোধ কৱেন? তবে তাৱে উন্নৰতি যে সৱাসিৱ হ্যাঁ হবে না তা বোৰাই যাচ্ছে। যথাযথ নিৱাপত্তাৰ বোধ দ্বিধাহীন সন্তুষ্ট আনে আৱ যা একই সঙ্গে দেশেৰ উৎপাদনশীলতা এবং সন্তাৱনাকে তুৱান্বিত কৱে। জনৈক তত্ত্ববিদেৱ **[[প্ৰয়োজন বা চাহিদাৰ পদসোপান]]** এৱ একটি গুৱৰ্ত্ববহু ধাপ হচ্ছে **[[নিৱাপত্তা]]**। তত্ত্ব পুৱনো হলেও এটি বৰ্তমানে উপলব্ধি বটে। আজ বাংলাদেশ যতটা সমৃদ্ধ তা রক্ষা কৱাটা অনেকটাই নিৰ্ভৱ কৱছে জনগণেৰ নিৱাপদ বোধ কৱাৱ ওপৱ। অন্যথায় উন্নয়ন স্বয়ংস্মৃত হবে না বলেই বিজ্ঞজনেৱা মনে কৱেন। যে ভুলগুলোৱ কাৱণে আজ কোটি কোটি টাকাৱ ক্ষতি হচ্ছে, আবেধ দখলদাৰিত্ব সৱানোতে ঘৱ-বাড়িচুয়ত হতে হচ্ছে, সে ভুলগুলোৱ যেন আৱ পুনৰাবৃত্তি না হয় সেদিকে যথাযথ নজৰদাৰি এখন সময়েৰ দাবি। সচেতন জাতি হিসেবে নিজেদেৱ প্ৰমাণ কৱাৱ এখনই সময়। সৱকাৱি কৰ্তৃপক্ষেৰ সবাই যদি তাৱে বিবেচনায় স্বচ্ছ হন তাতে অনেক কাজই কঠিন হয়ে উঠবে। তবে তাতে উদ্যোগী হওয়াটা বন্ধ কৱা যাবে না। তালো থাকতে চাই আমৱা সবাই আৱ দিনশেষে এটাই সৰ্বোচ্চ সত্য। তাই আমাদেৱ চিত্তা, পৱিত্ৰিতা এবং কৱণীয় সেই অনুযায়ী হোক। সংবিধানে বলা আছে, **[[জনগণই সকল ক্ষমতাৰ উৎস]]** আৱ কথাটিৰ তাৎপৰ্য অনেক। আমৱা নিজ নিজ জায়গা থেকে সচেতন আৱ সচেষ্ট হলে তা প্ৰকৃত উন্নয়নকে ধাৰাবাহিক কৱতে আৱ অৰ্থনীতিক উন্নয়নেৰ পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নকে তুৱান্বিত কৱতে দৃশ্যমান পৱিবৰ্তন আনবে।

প্ৰাক্তন শিক্ষার্থী, লোক প্ৰশাসন বিভাগ, বৱিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

প্ৰকাশেৱ তাৱিখ

৯ এপ্ৰিল ২০১৯

৬। পত্ৰিকাৰ নাম

দৈনিক ইন্ডেফাক